কামিয়াবির পথ

মূল
মওলানা তারিক জামিল

ভাষান্তর
মওলানা হেলালুদ্দিন আহমাদ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.almodina.com

সূচীপত্র

মাকামে মুস্তফা (সা.)

দুনিয়া এক অস্থায়ী জগৎ! ৭
পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৮
সাফল্য শুধু নবী (স.)-এর পথেই ১০
মুহম্মদী আদর্শ অর্জনের মেহনত ১২
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর
প্রিয় হবার পথ ১৩
ঐশী-ভাষ্যে সীরাতে মুস্তফা ১৩
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
খেদমতে এক ফরিয়াদী উট ১৪
নবীজী (স.)-এর সঙ্গে এক
নিষ্প্রাণ খুঁটির ভালবাসা ১৫
তাবলীগ ঃ সুন্নতে নববী (স.)-এর
একটি মেহনত ১৬
নবীজী (স.)-এর কুরবানী ১৭
নবীজী (স.)-এর চুলের বরকত ১৭
নবীজী (স.)-এর গোটা সীরাত ১৮
কামিয়াবীর পথ ২২

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ

আল্লাহ্ পাকই একমাত্র স্রষ্টা ২৫
জগত একান্ত আল্লাহ্ পাকের
ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে ২৬
আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য নেয়ামত ২৭
আল্লাহ্ পাকের কুদরত ২৮
প্রকৃত মালিক ২৯
আল্লাহ্ পাকের কোন শরীক নেই ২৯
আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন ৩১
নামাযে অমনোযোগিতা ৩৪
নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.) ৩৫
হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও
আল্লাহ্ পাকের কুদরত ৩৬
আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর গোলামী ৩৭
বিচার দিবস ৪০
হাশরের ভয়াবহ দৃশ্য ৪০
হাশরে মানুষের দু'টি দল ৪৩
সরল পথের পথিক ৪৫
প্রতিটি কাজ যথার্থরূপে অর্জনের জন্য
প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ৪৫
আসবাব গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান ৪৬
তরবিয়তের প্রতিক্রিয়া ৪৭
শিক্ষা গ্রহণের প্রধান বিষয় ৪৮
হযরত ইউসুফ (আ.) ও নবীজী (দ.)-এর
সৌন্দর্য ৫০
নবীজী (সা.)-এর উসীলায় ৫০
নবীজী (সা.)-এর মু'জেযা ৫১
রাহ্মাতুল্লিল আলামীন ৫২
নবীজী (স.)-এর দশটি নাম ৫৩
নবীজী (দ.)-এর এক আশিক ৫৪
নবীজীর 'ফাতিহ' ও 'খাতিম' তথা সর্বপ্রথম
ও সর্বশেষ হওয়ার রহস্য ৫৫
ইত্তেবায়ে রাসূলের বরকত ৫৫
মহব্বত আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে ৫৬
হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর আযমত ৫৭
হযরত ফাতেমা (রাযি.)-কে প্রদত্ত
পাঁচটি দু'আ ৫৯
হযরত আলী (রাযি.)-এর পরীক্ষা ৬০
তবলীগ একটি তরবিয়তী মেহনত ৬১
আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত ৬১
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও এক বৃদ্ধ
দায়ী'-র মর্যাদা ৬২

কামিয়াবীর পথ

কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ৬৪
প্রকৃত রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ৬৯
মৃত্যুর পর পুণর্জন্ম ৬৯
দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা ৭২
সতর্ক হোন ৭৪
উম্মতের জন্য বেদনা-বিধুর নবী (স.) ৭৫
পুণ্যের প্রতিদান ৭৬
জান্নাতের ফল ৭৭
কামিয়াবী ৭৯
দশটি গুণের অধিকারী নারী ৮০
আল্লাহ্ পাকের দীদার ৮১
কামিয়াবীর সফর ৮৩
পরিশুদ্ধ তওবার প্রয়োজনীয়তা ৮৬
মুহাম্মদী হওয়ার জন্য তরবিয়ত আবশ্যক ৮৯
সফল পথ ৯০

www.almodina.com

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ ওসিয়ত ৯১
নামাযীদের প্রকার ৯২
নবী করীম (সা.)-এর ক্ষমাগুণ ৯৪
আখলাকে হাসানা বা সুন্দর স্বভাবের গুরুত্ব ৯৫
প্রতিটি কাজে ইখলাস প্রয়োজন ৯৭
চারটি গুণ ১০০
একটি আয়াতের ভুল অর্থ ১০১
দুই হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান ১০৫
এক কথার তিন অর্থ ১০৫
তাবলীগ করা ফরয ১০৬
যাকাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান ১০৯
এক জমিদারের ঘটনা ১১১
সুদের অভিশাপ
সুদের অভিশাপ ১১৩
হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-এর আল্লাহ্ভীতি ১১৫
ইয্যত ও যিল্লতির মাপকাঠি ১১৫
হাশর ও মিযান ১১৬
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকত ১১৮
রাব্বুল আলামীনের নেয়ামত ১১৯
আখেরাতের নেয়ামত ১২১
হযরত আলী (রাযি.)-এর নসীহত ১২২
আখেরাতের মুসাফির ১২৩
দুই পয়গম্বরের ঘটনা ১২৪
কামিয়াবী লাভের জন্য পরীক্ষা আবশ্যক ১২৪
ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাযি.)-এর ফযীলত ১২৫
চরম ধৃষ্টতা ১২৭
শেষ বিচারের দিন ১২৭
ইমাম হোসাইন (রাযি.)-এর শাহাদতের পূর্বাভাস ১২৮
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অল্পে-তুষ্টি ১২৯
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গোস্তাখী ১৩১
নবীজী (স.)-এর গঠন-প্রকৃতি ১৩৩
দাওয়াতী মেহনত খতমে নবুওয়াতেরই জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা ১৩৫
তবলীগের মেহনত তওবার মেহনত ১৩৮
তাবলীগের মেহনতের ফসল ১৩৮
ইবাদত ও মুয়ামালাতের তওবা ১৪০
সুদের অভিশাপ ১৪১
মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী
উপকারীর কাছে অবনত হওয়া স্বভাবের দাবী ১৪৪
মানুষের প্রতি রাব্বুল আলামীনের ইহ্সান ১৪৪
ফিরআউনের দরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর জননী ১৪৬
হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অভিনব বিচার ১৪৬
আল্লাহ্র কাছে অবনত হও ১৪৭
সবচেয়ে বড় সম্পদ ১৫০
দাওয়াত ও তবলীগের আছর ১৫২
তাবলীগের 'দাওয়াতী আমল'
সকলের দায়িত্ব ১৫৪
সূরা ফাতেহা কোরআনের সারসংক্ষেপ ১৫৪
মাহ্বুবে খোদার আযমত ১৫৮
তওবার বরকত ১৫৯
আল্লাহ্র সাক্ষী
আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ ১৬২
জান্নাতের ঘর ১৬৩
সকল উম্মতের সেরা উম্মত ১৬৫
আখেরী উম্মতের সম্মান ১৬৭
শুভ্রকেশ-বৃদ্ধদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন ১৭১
উম্মতের সাক্ষীর ভূমিকা ১৭২
আল্লাহ্র উকিল ও শয়তানের উকিল ১৭৫
আল্লাহ্র রাসূল (দঃ)-এর সাক্ষ্য ১৭৭
প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ১৮০
এক বৃক্ষের সাক্ষ্য প্রদান ১৮৪
গোসাপের সাক্ষ্য প্রদান ১৮৫
সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য ১৮৭
সাক্ষী সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক ১৯১
হযরত নূহ (আ.)-এর সাক্ষী ১৯১
খোদাভীরুদের পুরস্কার ১৯৪
নবী নামের মাহাত্ম্য
আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি ১৯৭
নবীজী (সা.)-এর অনাহার ১৯৮
দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন ২০০

www.almodina.com

রাব্বুল আলামীনের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ ২০১
জীবনের উদ্দেশ্য ২০৩
ঈমানের দৌলত ২০৫
উম্মতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ২১৩
আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ২১৫
'তাবলীগ' মুসলমানদের জন্য এক
অপরিহার্য দায়িত্ব ২১৮
'সফীর' বা প্রতিনিধির দায়িত্ব ২১৯
নবীজী (সা.)-এর জীবন-আদর্শ ২২১
শানে মোস্তফা (সা.) ২২২
আল্লাহ্ পাকের দীদার ২২৪
দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য
আমাদের করণীয় ২২৮

জীবন ও মৃত্যু

রাখে আল্লাহ্ মারে কে? ২৩১
আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ্ ২৩৪
মানুষের অবহেলা ২৩৫
আল্লাহ্ গোনাহ্‌গার বান্দাদের তওবার
অপেক্ষা করেন ২৩৬
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সুন্নতই মুক্তির পথ ২৪০
প্রতিটি মুসলমানকে 'কালিমাওয়ালা'
হতে হবে ২৪১
দ্বীনই সফলতার একমাত্র পথ ২৪১
দ্বীনের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করা মারাত্মক
অপরাধ ২৪৩
দ্বীন শিখার নিয়ত করুন ২৪৪

কবরের আলো

মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ ২৪৬
জীবন এক অবিশ্বস্ত সঙ্গী ২৪৮
কেয়ামতের দিন মৃত্যুরও মৃত্যু হবে ২৫০
মুক্তি শুধু নবীওয়ালা পথে ২৫১
বাতিল শক্তির ইচ্ছা ২৫২
তাবলীগ জমাতের কর্মতৎপরতা ২৫৩
তাবলীগ মানব সমাজের প্রতি
এক অনন্য ইহ্সান ২৫৩
চেঙ্গিস খানের দূতের প্রতি অন্যায় আচরণ
ও তার পরিণাম ২৫৪
তাবলীগের বরকত ২৫৫
প্রকৃত বিপ্লব ২৫৭
তইমুরের ইসলাম গ্রহণ ২৫৮
একটি ভুল চিন্তা ২৬০
হিদায়ত আল্লাহ্‌র হাতে ২৬১
হযরত বেলাল (রাযি.)-এর শোকর ২৬২
মানুষের চরম মূর্খতা ২৬৩
আল্লাহ্ পাকের সুন্নত ২৬৪
নবী করীম (সা.)-এর একান্ত ইচ্ছা ২৬৬
আমলের উপর মেহনত করার
প্রয়োজনীয়তা ২৬৭

নামায ঃ এক অপরিহার্য ইবাদত

ফিরআউন ও হযরত মূসা (আ.) ২৭১
নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.) ২৭২
মানুষের সুখ-দুঃখ আমলের উপর
নির্ভরশীল ২৭৪
হযরত নূহ (আ.)-এর যুগের
মহা প্লাবনের ভয়াবহ ঘটনা ২৭৫
'আদ জাতির ধ্বংসযজ্ঞ ২৭৬
'কওমে সামূদ'-এর নাফরমানী
ও আল্লাহ্‌র আযাব ২৭৮
কওমে শো'আইব (আ.)-এর ধৃষ্টতা ২৭৯
হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয
(রহ.)-এর মৃত্যুমুহূর্ত ২৮০
আল্লাহ্ পাকের তিন আযাব ২৮২
হালাল হারাম বিচার করে চলা উচিত ২৮৩
উম্মতের চিন্তা ২৮৪
শাহজী (রহ.) এবং কোরআন ২৮৪
নামাযই মুক্তির উপায় ২৮৫
আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ২৮৭
অসাধুতার সাজা ২৯০
সম্মানের অধিকারী কারা? ২৯১
হযরত ওসমান গণী (রাযি.)-এর দান ২৯৩
জর্ডানে দাওয়াতী সফর ২৯৪

www.almodina.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাকামে মুস্তফা (সা.)

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم الا فعلموا انتم من الله على حضر . واعلموا انكم معروضون على اعمالكم . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره . او كما قال النبى صلى الله عليه وسلم .

দুনিয়া এক অস্থায়ী জগৎ!

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়াতে মানুষের জীবন অস্থায়ী। কিছু মানুষ আমাদের পূর্বে দুনিয়াতে ছিলেন। আজ তারা নেই। তাদের স্থানে আমরা এসেছি। শ্যামল পৃথিবীর বুকে আমাদেরকে স্থান করে দিয়ে তারা চলে গিয়েছেন মাটির নীচের অন্ধকার জগতে। তারপর প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম রক্ষা করতে আরেক দল লোক এগিয়ে আসছে আমাদের স্থান দখল করতে। আর আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি শেষ ঠিকানার দিকে। জীবন-মৃত্যু আর আসা-যাওয়ার এক চিরন্তন খেলা চলছে মহান স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্যকে ঘিরে।

আমাদের বিশ্বাস—মৃত্যুর পর এক অনন্ত জীবন রয়েছে। আমরা এক

www.almodina.com

অন্তহীন জীবনের মুসাফির। মৃত্যুর পূর্বের এ জীবনও আমাদেরকে যেমন নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে যাপন করতে হবে, তেমনি মৃত্যুর পরের জীবনের বিভিন্ন ঘাটিগুলো—কবর, হাশর, পুলসিরাত পার হয়ে যেন নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছাতে পারি সে চেষ্টাও করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এমন এক পরিবেশে আমাদের জীবনের উন্মেষ ঘটেছে, যেখানে শুধু মৃত্যুর পূর্বের জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে তোলা হচ্ছে। শুধু এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনকেই বড় করে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

অথচ মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কালামে যখনই দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখনই এ জীবনকে অতি তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ও ধোঁকার জীবন বলে উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, এই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ জীবনের পিছনে তোমরা ছুটে চলেছ!

কোথাও তিনি বলেছেন— وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ এ-জীবন ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। কোথাও বলেছেন—এ দুনিয়া অতি তুচ্ছ। কোথাও বলেছেন—মাত্র দিন কয়েকের ব্যাপার। কোথাও বলেছেন—এখানকার আনন্দ বা বেদনা কোনটাই স্থায়ী নয়। কাজেই, আমরা আমাদের এই অনন্ত জীবনের সীমাহীন সফরের এই ক্ষুদ্র অংশটিও যেমন নিরাপত্তা ও নিরুদ্বেগের সাথে অতিবাহিত করতে চাই, তেমনি মৃত্যুর পরের অন্তহীন যাত্রায়ও আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে বেঁচে চির সুখের জান্নাত লাভ করতে চাওয়া উচিত।

পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি

কম-বেশ আজকের গোটা মুসলিম সমাজই পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মৃত্যুর পরের জীবনের যেমন কোন ছায়া নেই, তেমনি পশ্চিমা শিক্ষাও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরব। আখেরাত সম্পর্কে পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থান একেবারে নিকষ অন্ধকারে। আসলে পূর্ব-পশ্চিম আর উত্তর-দক্ষিণ যাই বলি না কেন, মানুষের ইল্‌ম ও জ্ঞান আখেরাত সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা দিতে অক্ষম। এ সম্পর্কে মানব-মস্তিষ্ক নিঃশৃত জ্ঞান কিছু বলে না, বলতে পারেও না।

বিগত দু'শ বছর থেকে আমরা যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির রাহুগ্রস্ত হয়ে আছি, এবং আমাদের বিবেক-বিবেচনার চোখে ঠুলি এঁটে নিতান্ত অন্ধের মত যাদের অনুকরণ করে চলেছি, তাদের সংস্কৃতি ও জীবন যাপনের পদ্ধতিতে আখেরাত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত। তারা কেবল দুনিয়ার জীবনকে জৌলুশপূর্ণ করে তোলার পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করে থাকে। আল্লাহ্ পাকের

লাখো শোকর যে, আমরা আখেরাতকে অস্বীকার করি না। কিন্তু, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব আমাদেরকে আখেরাত এতটাই ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের জীবন যাপনে তার ন্যুনতম ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। এই যে 'লাহোর' শহরকে তিলোত্তমা নগর হিসাবে গড়ে তোলার ঘোষণা—এটা তো আমাদেরকে শুধু এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, হয়ত নগরের চারিদিকে সবুজের ছড়াছড়ি থাকবে। পাহাড় ও উপত্যকার শ্যামল গা বেয়ে আঁকাবাঁকা ঝরণা ও নদী-নালার কলকল-ছলছল ধারা প্রবাহিত হবে। সড়কগুলো হবে মসৃণ ও প্রশস্ত। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন থাকবে। স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল তথা যাবতীয় নাগরিক সুবিধাদি সুলভ্য করে তোলা হবে।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে বলেছেন—তিলোত্তমা নগরের নির্মাতা পৃথিবীতে তোমরাই একমাত্র নও। তোমাদের পূর্বেও এমন কওম অতিবাহিত হয়েছে, যারা শৈল্পে ও নান্দনিকতায় তোমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও দৃষ্টিনন্দন নগর নির্মাণ করেছিল। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী আরম্ভ করল, তখন فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ আল্লাহ্ পাক তাদের উপর আযাবের এমন চাবুক মারলেন যে, গোটা জাতি তছনছ হয়ে গেল। একটু তাকিয়ে দেখ, সেই সুসজ্জিত বাগিচা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাগিচার ফল ভক্ষণকারীরা কোথায় হারিয়ে গেছে। কুলকুল রবে নির্ঝরণী বয়ে চলেছে এখনো, কিন্তু সেই দৃশ্য অবলোকন করে আনন্দলাভকারীদের আজ কোন অস্তিত্ব নেই। সুদৃশ্য পার্ক, পাঁচ তরকা হোটেল, নৃত্যশালা ও নাট্যশালা এবং আনন্দ-উল্লাশের যাবতীয় উপকরণ পড়ে আছে নিরবে। শুধু সেগুলো ভোগ করার জন্য কেউ আজ আর বেঁচে নেই। এই সুদৃশ্য মহলে এক সময় তারা নেশায় চুড় হয়ে নর্তকীকে বাহুডোরে আবদ্ধ করে পড়ে থাকতো। فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ আমি তাদের সকলকে উঠিয়ে সমুদ্রের প্রবল-প্রচণ্ড ঢেউয়ের কাছে অর্পণ করে দিলাম। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى তোমাদের হৃদয়ে যদি আমার সামান্য ভয়ও থেকে থাকে, তাহলে ভয় করতে থাকো। অন্যথায় পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

দুনিয়া ও আখেরাত, এই উভয় জীবনের সুখের জন্য আমরা জীবন যাপনের একটি মনগড়া প্রণালী প্রস্তুত করে নিয়েছি। যেহেতু সেই প্রণালী পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতিপুষ্ট, তাই সে জীবন-প্রণালীতে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য যাবতীয় আয়োজন থাকলেও আখেরাতের কোন স্থান নেই। সন্ধ্যায় পশ্চিমে সূর্য ডুবে গিয়ে যেমন পৃথিবীকে নিকস অন্ধকার উপহার দিয়ে

যায়, পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতিও তেমনি আমাদেরকে কিছু অন্ধকার ছাড়া কোন আলো উপহার দিতে পারে না। তাতে আলো খুঁজতে যাওয়াও বোকামী।

সাফল্য শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথেই

আমরা নিজেদেরকে সেই মহান পথ প্রদর্শকের অনুসারী বলে দাবী করি, যার নূরের কাছে সূর্যও ম্লান হয়ে যায়। যার হৃদয়-প্রদীপ এমন আলোয় বিভাসিত, যে আলোর কাছে মহান আরশের আলোও আলোহীন হয়ে পড়ে। যার জ্ঞান ও দৃষ্টি-ক্ষমতা এমনই প্রখর যে, মসজিদে নববীতে বসেই জান্নাত জাহান্নাম দেখতে পান। আরশ পর্যন্ত যার স্বচ্ছ-দৃষ্টির অবাধ যাতায়াত। আমাদের মত যার দৃষ্টিশক্তি একমুখী নয়, যিনি সামনে পিছনে সমান দেখতে পান। আমরা নিজেদেরকে সেই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী বলে দাবী করি। কিন্তু নিজেদের জীবন-চলার জন্য এমন একটি পথ নির্মাণ করে নিয়েছি, যা তাঁর আদর্শের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা মনে করি—অর্থ-সম্পদ উপার্জন, বিপুল অস্থাবর সম্পদের উপর অধিকার অর্জন, এবং নিত্যনতুন ও উন্নত টেকনোলজি অর্জন—এই বিষয়গুলোই মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা বিধান করে। যদি তাই হবে, তাহলে উন্নত অর্থনীতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অধিকারী জাপানবাসীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মাঝে এমন ব্যাপক হারে আত্মহননের প্রবনতা কেন ? কোন্ দুঃখে, তাদের ভাষায়, এই আরাম-আয়েশের জীবন ও মায়াময় পৃথিবী ত্যাগ করে তারা চলে যেতে চায় ? ইউরোপবাসীদের কাছে গিয়ে দেখুন, তাদের চাকচিক্যময় জীবনের আড়ালে কী করুন হতাশা আর গ্লানী লুকিয়ে আছে!

আল্লাহ্‌কে হারিয়ে কেউ কি কখনো সঠিক গন্তব্যের সন্ধান পেয়েছে, না পেতে পারে ? আর মহান রাব্বুল আলামীনের করুণা অর্জন করার পর কারো জীবনে কোন অপ্রাপ্তি রয়েছে বলেও তো কোন নজীর নেই। আসলে আল্লাহ্‌কে যে পায় নি, তার জীবনেই প্রাপ্তির ঘরটি শুধুই শূন্য।

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে এক এক করে প্রতিটি লাইন পড়ে দেখুন। দেখুন তো এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কি না, আল্লাহ্ পাকের করুণা লাভ করার পরও যিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কিংবা আল্লাহ্‌কে না পেয়েও যিনি জীবনে সফল হয়েছেন ? আসলে সঠিক পথের দীশা পাবার জন্য প্রথমে সঠিক জ্ঞান অর্জন করুন। তারপর অনুসরণের জন্য সঠিক পথপ্রদর্শক নির্বাচন করুন। এ জীবন-পথে চলার জন্য আমাদের সামনে রয়েছে দু'টি পথ। একটি পথের নির্মাতা হল দুনিয়ামুখী মানুষ। আরেকটি পথ অতুলনীয় দিশারী, ফখরে দু'

'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপহার। সে চলার পথে মানুষের নির্বিঘ্ন চলার গতিকে রোধ করার জন্য কখনো রাতের আঁধার নেমে আসে না। সে পথে শুধু আলোই আলো। তিনি বলেন— جئتكم بخير الدنيا والاخرة হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের পার্থিব জীবনকেও সুন্দর করে দিব, তোমাদের আখেরাতের জীবনকেও সুন্দর করার উপায় বাতলে দিব। শুধু তোমরা আমাকে অনুসরণ করে চল।

গোটা মানব জাতির সমস্ত সমস্যার সমাধান আল্লাহ্ পাকের হাতে। আর আল্লাহ্ পাক সে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বানিয়েছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সাফল্য লাভের একমাত্র মাধ্যম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মানুষ দুনিয়ার কামিয়াবী কামনা করুক চাই আখেরাতের কামিয়াবী কামনা করুক, তাকে মুহম্মদী পথেই আসতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিম তথা তাঁর আদর্শকে এড়িয়ে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। যাবতীয় সাফল্যের একমাত্র চাবি তিনিই। তিনি এমন এক মহান ব্যক্তি যে, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আর কারো পক্ষেই তাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তিনি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কারো জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে না। তাঁর উসিলায় উম্মতে মুহাম্মদীও এত সম্মানিত যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আর কোন উম্মতের জন্য জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি হবে না। তাসনীম, সালসাবীল, যান্জাবীল, রহীক—জান্নাতী এসকল সরবত যতক্ষণ না নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আর কারো জন্যই পানের অনুমতি হবে না। এই সরবত উম্মতে মুহম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ না পান করবে, ততক্ষণ আর কোন উম্মতই পান করতে পাবে না।

সমস্ত ইয্যত-সম্মানের খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।
সমস্ত কামিয়াবীর খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।
বরকতের খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।
সরদারির খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।
জান্নাতের খাজানা আল্লাহ্ পাকের হাতে।

মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের খাযানা আল্লাহ্ পাকের হাতে। তার সেই খাযানা লাভ করার জন্য আল্লাহ্ পাক একটি উপায় নির্ধারণ করেছেন। সে উপায়টি হল. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

আদর্শের অনুসরণ। সেই আদর্শের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেকে 'মুহম্মদী' রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন, তাহলে আপনাদেরকে আল্লাহ্ পাক এমনই সম্মান দান করবেন যে, আপনাদের জন্য তাঁর অফুরন্ত সম্মানের খাযানা খুলে দিবেন। কামিয়াবীর খাযানা করায়ত্ব করতে চাইলে আল্লাহ্ পাক তাও আপনাদের জন্য সহজলভ্য করে দিবেন। আপনাদের জন্য বরকতের দরজা খুলে যাবে। জান্নাতের দরজা থেকে আপনাদেরকে আহ্বান করা হতে থাকবে। সেখানে আপনাদের এস্তেকবালের জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ পাক উপস্থিত থাকবেন। তবে শর্ত একটাই—নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে জীবনে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। এই একটি মাত্র উপায় ছাড়া আত্মীয়তার দোহাই বা খান্দানী মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যাবে না। সেখানে সৈয়দ বা কোরায়শী মুদ্রা অচল। একমাত্র মুহম্মদী মুদ্রা ছাড়া সেখানে আর কিছুই চলে না। আবু লাহাব কুরায়শী ও হাশেমী ছিল। শুধু তাই নয়, আত্মীয়তার সম্পর্কে খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাও ছিল। তা সত্ত্বেও কোরআন তার সম্পর্কে ঘোষণা করেছে— تبت يدا ابى لهب وتب আবু লাহাব ধ্বংস হয়েছে। আবু লাহাব নিজে হাশেমী, আর তার স্ত্রী ছিল বনু উমাইয়্যা খান্দানের। ইয্যত-সম্মানে হাশেমীদের পরেই যাদের অবস্থান। স্বামী-স্ত্রীর আকাশ-ছোঁয়া বংশীয় মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করলেন—وامرأته حمالة الحطب তার স্ত্রীও জাহান্নামী। কে কার আত্মীয়, আর কে বংশ মর্যাদায় কত উচ্চ, আল্লাহ্ পাকের নিকট এসব কিছুই বিবেচ্য নয়। তিনি শুধু দেখেন, তাঁর কোন বান্দা তাঁর পেয়ারা নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম, আর কে নয়। কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে, আর কে অবাধ্য হয়েছে। যে আনুগত্য স্বীকার করেছে, সে কামিয়াব। আর যে অবাধ্যচারণ করেছে, সে নাকাম ও ব্যর্থ।

মুহম্মদী আদর্শ অর্জনের মেহনত

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! যেহেতু আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক যিন্দেগী শিখি নি, সে অনুযায়ী আমরা নিজেদেরকে পরিচালিত করি নি, এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী হিসাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর দ্বীন ও আদর্শকে প্রচারের কাজে অংশ গ্রহণ করি নি, তাই আমাদের জীবন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত একটি জীবন। এ ব্যর্থতার অন্ধকার থেকে আমাদেরকে আলোর জগতে বের করে আনার জন্যই তাবলীগের মেহনত। তাবলীগ প্রথাগত কোন দল বা আন্দোলন নয়। আমাদের

কোন সদস্য নেই, কোন মেম্বার নেই, কোন সদর, সেক্রেটারি বা কোশাদক্ষও নেই। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, প্রতিটি মুসলমান যেন মুহম্মদী আদর্শে আদর্শবান হয়ে ওঠে। এ দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের। এটা 'তাবলীগ জমাত' নামে কোন বিশেষ দলের নিজস্ব কার্যক্রম নয়।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় হবার পথ

এ কথাটিই হযরত আলী (রাযি.) অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—যে ব্যক্তি খান্দানী আভিজাত্য ছাড়া সম্মানী হতে চায়, অর্থবিত্ত ছাড়া ধনী হতে চায় এবং ক্ষমতা ছাড়া প্রতিপত্তি চায়, তার কী করণীয় ?

ইয্যত-সম্মান সকলেই চায়। আমিও চাই। এ চাওয়ায় দোষের কিছু নেই। ধনী হবার আকাঙ্ক্ষাও প্রায় সকল মানুষই পোষণ করে থাকে। নিজ পরিমণ্ডলে মানুষ প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের আশাও করে। কিন্তু সেই আশা পুরণ হবার উপায় কি ?

এ উদ্দেশ্যে শয়তান একটি পথ তৈরী করেছে—মারামারি, হানাহানি, অবৈধ অর্থের ছড়াছড়ি আর নোংরা রাজনীতি—ইত্যাদির সমন্বয়ে এক হুলুস্থুল পথ।

আর একই উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রাযি.)-এর যবানে মহান রাব্বুল আলামীনের পয়গাম শুনুন। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ اَرَادَ عِزًّا بِلَا عَشِيْرَةٍ وَ غِنًى بِلَا مَالٍ وَ جَاهَةً بِلَا اِخْوَانٍ فَلْيَخْرُجْ مِنْ ظِلِّ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِلٰى عِزِّ طَاعَةِ اللّٰهِ.

সম্মান, ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি চাও ? তাহলে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতা ছেড়ে ফরমাবরদারীর আলোকিত পথে চলতে আরম্ভ কর। তাহলেই লাভ করতে পারবে ইয্যত-সম্মান, ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি। এই দুনিয়া তোমার পদপ্রান্তে এসে নতজানু হবে এবং জান্নাতের চাবিও তোমার হাতে তুলে দেয়া হবে।

ঐশী-ভাষ্যে সীরাতে মুস্তফা

মানুষ আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হতে পারবে ? আল্লাহ্কে তো দেখা যায় না। তাঁর পয়গামও মানুষ শোনতে পায় না। তাহলে এর উপায় কি ? এ সমস্যার সমাধানকল্পে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দা ও তাঁর মাঝে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে উপস্থিত করলেন।

আসমান থেকে ওহী আসল। মানুষ জানতে পারল আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের কথা। আল্লাহ্ পাক পেয়ারা নবীর নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করলেন—

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۞

আপনি গোটা জগদ্বাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। আপনি কোন বিশেষ ভূখণ্ড বা জনগোষ্ঠির নবী নন। আপনার নবুওয়াত মানব-দানবসহ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞

আপনার অস্তিত্ব গোটা সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত স্বরূপ। আপনি দয়ার আঁধার। আপনাকে এমন কিতাব দান করেছি, যা আর কাউকে প্রদত্ত হয় নি। আপনাকে এমন দ্বীন দান করেছি, ইতিপূর্বে যা আর কোন নবীকে দেই নি। আপনার দ্বীনই শ্রেষ্ঠ দ্বীন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আপনার নবুওয়াতের মাধ্যমেই নবুওয়াতের ক্রমধারা পূর্ণতা লাভ করল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই দয়ালু ছিলেন যে, তাঁর দয়া দ্বারা দুনিয়ার মানব-দানবসহ গোটা মাখলুকাত যেমন উপকৃত হয়েছে, তেমনি আসমানের ফেরেশতারা পর্যন্ত উপকার লাভ করেছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ফরিয়াদী উট

একবার একটি উট ছুটতে ছুটতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে উপস্থিত হল। সেখানে এসেই উটটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকে মাথা রেখে দিয়ে কাঁদতে লাগল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, উটটি কি বলছে তোমরা কি তা বুঝতে পারছো ? সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বাকহীন প্রাণীর ভাষা আমরা কেমন করে বুঝবো ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, উটটি বলছে, যৌবনে যখন আমার দেহ শক্ত-সমর্থ ছিল, তখন আমার মনিব আমাকে দিয়ে কাজ আদায় করেছে। আজ আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। দেহে আগের সেই পরিশ্রম করার সামর্থ নেই। তাই মনিব আমাকে জবাই করতে চাচ্ছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার জীবন রক্ষা করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের মালিককে বললেন, উট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। সাহাবী জবাবে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য

আমি প্রস্তুত রয়েছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উটটিকে মুক্ত করে দাও। ফলে সাহাবী উটটি ছেড়ে দিলেন। এক নির্বাক প্রাণীও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের করুণা লাভে ধন্য হল এবং আনন্দ ভরা হৃদয় নিয়ে ফিরে গেল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক নিষ্প্রাণ খুঁটির ভালবাসা

মসজিদে নববীতে মিম্বর নির্মিত হয়েছে পঞ্চম হিজরীতে। মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বৃক্ষের একটি শুষ্ক খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরে মিম্বর নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিলে সে খুঁটির পাশেই তা নির্মাণ করা হল। মিম্বর নির্মিত হওয়ার পর প্রথম জুম'আয় খুৎবা দেবার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুষ্ক খেজুর কাণ্ডটি অতিক্রম করে মিম্বরের প্রথম ধাপে কদম রাখলেন, তখন সেই নিষ্প্রাণ কাণ্ডটি বুঝতে পারলো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এই বিরহ তাকে অসহনীয় বেদনায় রোদন-কাতর করে তুললো। গর্ভবতী উটনী যন্ত্রণায় যেভাবে চিৎকার দিয়ে ওঠে, নিষ্প্রাণ খেজুর কাণ্ডটি ঠিক সেভাবেই চিৎকার করে ওঠলো। দয়াল নবী ফিরে আসলেন। তার গায়ে স্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। কানে কানে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার একটা রফা হয়ে যাক—আজ তুমি আমাকে যেতে দাও। তোমাকে জান্নাতের বৃক্ষরূপে পুণর্জীবন লাভের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ফলে বৃক্ষ-কাণ্ডটির কান্নার দমক ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল।

তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই বৃক্ষ-কাণ্ডটি বের করে নিয়ে দাফন করে দাও। এটি জান্নাতের বৃক্ষরূপে পুণর্জন্ম লাভ করবে এবং অনন্তকাল ধরে জান্নাতবাসীরা তার ফল ভক্ষণ করতে থাকবে। তিনি আরো বললেন—

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ اَحْتَزِنْهُ لَمْ يَزَلْ بَاكِيًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এই বৃক্ষ-কাণ্ডটিকে স্নেহে আলিঙ্গনে শান্ত্বনা না দিতাম, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আমার বিচ্ছেদে এইভাবে চিৎকার করে সে কাঁদতে থাকতো।

আফসুস! যেখানে একটি খেজুর বৃক্ষের নিষ্প্রাণ কাণ্ড নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে ওঠে, সেখানে আমরা মানুষ হয়েও তাঁর তরীকাকে বিসর্জন দিয়ে চলেছি। শুধু নাম 'গোলাম রাসূল' দিয়ে গোলাম হওয়া যায় না। গোলামী একটি জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি আদর্শের যথার্থ অনুসরণ।

তাবলীগ ঃ সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি মেহনত

তাবলীগ মূলত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গঠন ও সে আদর্শের বাণী গোটা জগতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মেহনত। এটা শুধু বলার দ্বারা হয় না ; বরং প্রথমে হৃদয়ে নবী-প্রেমের আবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তারপর আনুগত্য এবং নবীর বাণীকে দুনিয়ায় প্রচারের মেহনতে অংশ নিতে হয়। এই দায়িত্ব আমরা নবীর কাছ থেকে মিরাসী সূত্রে লাভ করেছি। আল্লাহ্‌র নবী আমাদেরকে মিরাস স্বরূপ দান করেছেন দ্বীন, আর আল্লাহ্ পাক দান করেছেন আসমানী কিতাব। আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও আল্লাহ্‌র নবীর দ্বীনের ওয়ারেস। আমরা আখেরী নবীর নায়েব। তাঁর নবুওয়াত শুধু মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয় ; বরং তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণও যেমন আবশ্যক তেমনি তাঁর আদর্শকে গোটা জগতে পৌঁছে দেয়াও অপরিহার্য কর্তব্য। এরই নাম তাবলীগ।

নামাযীদেরকে 'নামাযী জামাত' বলা যেমন ভুল, তেমনি তাবলীগকে 'তাবলীগ জামাত' নামে আখ্যা দেয়াও ভুল। 'তাবলীগ জামাত' এই নামটি আমাদের দেয়া নয়। লোকেরা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বলতে শুরু করেছি। তাবলীগ মূলতঃ সকল মুসলমানেরই কাজ। প্রতিটি মুসলমানের উপর নামায-রোযা যেমন ফরয, তাবলীগের কাজও তেমনি ফরয। মানুষ সেটা পালন করুক চাই না করুক, তাদের সে দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে তাদের অব্যাহতি নেই। তাবলীগের এই দায়িত্ব স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .

আমার পয়গাম গোটা উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়া আমার উম্মতেরই দায়িত্ব। কাজেই এই দায়িত্ব আমরা কোনভাবেই এড়াতে পারি না। গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষও যদি এ দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করতে থাকে, তাতেও যেমন এ দায়িত্ব থেকে আমাদের অব্যাহতি নেই, তেমনি সকল মানুষ যদি এ দায়িত্বের প্রতি

নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে, তাতেও আমাদের অব্যাহতি নেই। নামাযের মত তাবলীগের যে দায়িত্ব আমাদের কাঁধে রয়েছে, তা আমাদেরকেই আঞ্জাম দিতে হবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানী

যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার জন্য একশত উটের বহর নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হলেন। সেই বহর থেকে একেকবারে পাঁচটি করে উট পৃথক করে নিয়ে যাওয়া হত। সেখান থেকে একটি একটি করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হত আর তিনি তা জবাই করতেন। সেই পাঁচটি উট থেকে যখন একটিকে জবাই করার জন্য নিয়ে যাওয়া হত, তখন অন্য চারটি অগ্রসর হয়ে বলত, আমাকে আগে জবাই করুন, এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে এ নিয়ে কামড়াকামড়ি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিত। এই যমীন, আকাশের সূর্য এবং আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য মাখলুক সাক্ষী আছে, সেদিন উটগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কুরবানী হওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে আসতে চাইছিল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুলের বরকত

কুরবানী শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আম্মার বিন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাযি.)-কে ডাকলেন এবং তার সামনে মাথা পেতে বসলেন চুল কাটার জন্য। তারপর বললেন, মু'আম্মার! চুল কাটার জন্য রাসূল তোমার সামনে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমার হাতে ক্ষুর। হযরত মু'আম্মার (রাযি.) বললেন, আয় আল্লাহ্র রাসূল! এটা একান্তই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইহ্সান। এতে আমার কামালাত কিছুই নেই। যাই হোক, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে মাথা মুণ্ডন করালেন। পাশেই হযরত আবু তালহা (রাযি.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত চুল তার হাতে অর্পণ করে দিলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযি.) তার হাত থেকে থাবা দিয়ে কপালের কিছু চুল ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন এবং সেই বরকতময় চুল তিনি নিজের টুপির মধ্যে সযত্নে রেখে দিলেন। এঘটনার পর কোন যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে প্রথমে তিনি সেই টুপিটি মাথায় পড়তেন, তারপর লোহার শিরস্ত্রাণ দিয়ে তা ঢেকে দিতেন।

আলেমগণ বলেন, শত্রুপক্ষের বড় বড় বীরদের সঙ্গে হযরত খালেদ (রাযি.) লড়াই করে তাদেরকে কচুকাটা করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র চুলের বরকতে।

ইয়ারমুকের লড়াইয়ে রোমানদের আক্রমণ যখন একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়ল, হযরত খালেদ (রাযি.) সেই কঠিন মুহূর্তেও অস্ত্র ধারণের প্রতি মনোযোগী না হয়ে তাঁর টুপিটি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু পাওয়া গেল না। সঙ্গী সর্দাররা বলতে লাগলেন, শত্রু ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, আর ওনার কিনা এখন টুপি খোঁজার সময় হল! তারা বললেন, টুপি পরে খুঁজে দেখা যাবে। আগে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করুন। শত্রু অগ্রসর হয়ে একেবারে তাদের খীমার উপর এসে পড়লো। ছুটাছুটি আর দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে হঠাৎই তার সেই পুরাতন ও ময়লা টুপিটি পাওয়া গেল। তা দেখে সকলেই বলতে লাগল, এই সামান্য একটি টুপির জন্য তুমি প্রাণের উপর এত বড় ঝুঁকি নিলে ? জবাবে তিনি বললেন, আরে আল্লাহ্‌র বান্দারা! জান কি এ টুপির মধ্যে কী রয়েছে ? এই টুপির মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক রয়েছে। এই টুপি মাথায় ধারণ করা ছাড়া আমি কখনো শত্রুর মোকাবেলায় যাই না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা সীরাত

তাবলীগের এই মহান কাজ নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব হবার সুবাদেই আমরা লাভ করেছি। গোটা পৃথিবী একজন রাহ্‌বারের অধীর অপেক্ষায় আছে। পার্থিব ব্যস্ততার কারণে আমরা দ্বীনের কাজের জন্য অবসর পাই না। কিন্তু ব্যস্ততা যতই জটিল হোক, অবসর বের করে নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নিয়ে আমাদেরকে গোটা দুনিয়ার মানুষের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে।

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের প্রতিটি সুন্নতকে কিতাবের পাতায় ও মানুষের অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। প্রায় চৌদ্দশ তেইশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আজ পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কিছুই কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে নি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর অল্প কিছু কথাই মানুষ জানে। হযরত মূসা (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমায়ীল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) ও অন্যান্য নবীদের সামান্য কথাই ইতিহাসের পাতায় রক্ষিত আছে।

কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্ব থেকে নিয়ে শেষ বিদায় পর্যন্ত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি অংশের বিবরণই সংরক্ষিত

রয়েছে। সেই সংরক্ষিত ইতিহাস আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই উটনীতে আরোহণ করতেন, সেই উটনীগুলোর নাম পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। কবে কখন কোন উটনীর উপর আরোহণ করতেন তাও কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে—নবম ও দশম তারিখে তিনি কাসওয়া নামক উটনীর উপর আরোহণ করে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম সমাধা করেছেন। তওয়াফ করতে যাবার সময় জাদ'আ নামক উটনী ছিল তার বাহন। আর এগার তারিখে আয্‌বা বা জাদ'আ নামক উটনীর উপর আরোহণরত অবস্থায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, বরং সেসময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর লাগাম কার হাতে ছিল, ইতিহাস তাও সংরক্ষণ করে রেখেছে। প্রথম দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে ছিল তাঁর উটনীর লাগাম। আর সেই সভাস্থলে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন হযরত রাবি'আ ইবনে উমাইয়্যা (রাযি.)। আমাদের ইজতেমায় যেমন বলা হয়, 'খামুশ হয়ে যাই, চৌকান্না হয়ে যাই', হযরত রাবি'আ (রাযি.) তেমনি সব ঘোষণা দিয়ে মানুষকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণের প্রতি মনোযোগী করেছেন। নবী-জীবনের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোও কালের ব্যবধান আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে গমন করেন, সেদিন 'আযবা নামক উটনীটি তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় খুবই কাতর হয়ে পড়ে। এমনকি পানাহার পর্যন্ত ত্যাগ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিহনে শূন্য পৃথিবীতে উটনীর জীবন অসহনীয় হয়ে পড়ে। অবশেষে দীর্ঘ অনাহারে কাতর হয়ে একদিন উটনীটি মারা যায়।

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ!

আমাদের কাছ থেকে কোরআন ছিনিয়ে নেবার সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই বাতেল শক্তি করেছে। কিন্তু একটি হরফ বা অক্ষরও ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের অনেক পরে হাদীসসমূহ কিতাব আকারে সন্নিবেশীত হয়েছে। সেই হাদীসের সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে আমাদের মাঝে দ্বিধা সৃষ্টির অনেক চেষ্টাই বাতেল শক্তি করেছে। তাতেও তারা সফল হয় নি। মেহেরবান আল্লাহ্ আমাদের কাছে হক প্রকাশ করে দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গত হয়েছেন চৌদ্দশ তেইশ বছর অতিবাহিত হতে চলল, অথচ আজ আমি তাঁর জীবনী সম্পর্কে

আপনাদের সামনে এমন স্পষ্ট আলোচনা করছি, যেন এই মাত্র তিনি আমাদের কাছ থেকে ওঠে গিয়েছেন। যেহেতু উম্মতে মুহম্মদিয়ার দায়িত্ব হল নবীজীর সমস্ত বাণী আগত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া, তাই তাঁর কোন বিষয়ই হাদীসের বিবরণ থেকে বাদ পড়ে নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার ভঙ্গি ছিল বিনীত। তিনি কখনো পা ঘষটে চলতেন না বরং পা উঁচিয়ে কাঁধ ঝুঁকিয়ে কোমল ভঙ্গিতে হাঁটতেন। মানুষ যতই বুক চিতিয়ে আর নাক উচিয়ে চলুক না কেন, পাঁচ ছ' ফিটের চেয়ে বেশী উঁচু হয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর চলার ভঙ্গি যদি বিনীত হয়, তাহলে পাঁচ হাজার ফিট ওপরে ওঠাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। দম্ভ মানুষকে অপদস্ত করে, আর বিনয় দান করে মর্যাদা।

হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা চাইতেন এবং দু'আ করে বলতেন—

وَاغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

আয় আল্লাহ্! কেয়ামতের দিন আমার ভুলত্রুটি মাফ করে দিন। অপরপক্ষে আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ *

আল্লাহ্ পাক আপনার পূর্বাপর সকল ভুলত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অপরাধ করেছেন, আর আল্লাহ্ পাক তা মাফ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সৃষ্টিগতভাবেই ছিলেন নিষ্পাপ ও পুত চরিত্রের অধিকারী। আয়াতের উদ্দেশ্য হল, নবীজীর মনে কখনো যদি কোন পাপ-চিন্তার আভাসও আসত, এবং সে সম্ভাবনা যদিও নেই, আল্লাহ্ পাক অগ্রিম তাও মাফ করে রেখেছেন।

এক নবী আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা লাভের জন্য আকুতি জানিয়ে দু'আ করেছেন, আর এক নবীকে আল্লাহ্ পাক বলছেন, আমি আপনাকে মাফ করে দিয়েছি। এক নবী দু'আ করেছেন— وجعلنى من ورثة جنة النعيم আয় আল্লাহ্! আমাকে জান্নাত দান করুন। আরেক নবীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ পাক বলেছেন—انا اعطينك الكوثر আমি আপনাকে জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিয়েছি। একথা বলেন নি যে, আপনাকে জান্নাত দান করা হবে। আয়াতের তরজমায় সাধারণত যা বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ, 'আমি আপনাকে হাউজে

কাউসার দান করেছি'—আসলে উদ্দেশ্য তা নয়। বরং এখানে উদ্দেশ্য হল, 'আমি আপনাকে জান্নাত দান করেছি।' আর তাতে হাউজে কাউসার নামে অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তুও রয়েছে। মূলতঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান এতই সুউচ্চ যে, তাঁকে ছাড়া কারো পক্ষেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। সেই সম্মানি নবী যখন তাঁর সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে চলতেন, কখনো আগে আগে চলতেন না, তিনি থাকতেন পিছনের দিকে। এতই ছিল তাঁর বিনয়।

এত সম্মান যে নবীর, তিনি কেন সাহাবাদের পিছনে থাকতেন? এর কারণ, যদিও তাঁর মহান চরিত্রে অহংকারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবুও অহংকারের সম্ভাব্য সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত সম্মান করেন যে, গোটা কুরআন মজীদে কোথাও একবারের জন্যও তাকে নাম নিয়ে ডাকা হয় নি। অথচ অন্যান্য নবীদেরকে তিনি নাম নিয়েই ডাকতেন। যথা—

ইয়া দাউদ!
ইয়া মূসা!
ইয়া ঈসা!
ইয়া আদম!
ইয়া ইয়াহ্ইয়া!
ইয়া যাকারিয়্যা!
ইয়া ইবরাহীম!
ইয়া নূহ্!

কোরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আট নবীর সঙ্গে কথা বলার বিবরণ দিয়েছেন এবং সকলকেই তিনি নাম নিয়ে ডেকেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি যতবারই আহ্বান করেছেন, একবারও তাকে ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাকেন নি। বরং নবীজীকে আহ্বানের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা ছিল—

ইয়া আইয়্যুহার রাসূল!
ইয়া আইয়্যুহান্ নবী!
ইয়া আইয়্যুহাল্ মুয্যাম্মিল!
ইয়া আইয়্যুহাল্ মুদ্দাস্সির!

শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর রাসূলকে সসম্মান-

www.almodina.com

সম্বোধনের তাকীদ করে বলেছেন—

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ❊

তোমরা যেমন পরস্পরকে নাম নিয়ে ডেকে থাক—ইয়া আবূ বকর, ইয়া ওমর, ইয়া উসমান, ইয়া আলী, আমার নবীকে তেমনিভাবে 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে ডেকো না। এভাবে বলা অশিষ্টাচার ও বেআদবী। তাকে ডাকবে 'ইয়া আইয়্যুহার্ রাসূল', 'ইয়া আইয়্যুহাল্ মুদ্দাস্সির' বলে। মুদ্দাস্সির শব্দের প্রচলিত অর্থের বাইরে আমি অন্য একটি অর্থ বলছি, শুনুন। শব্দটির উৎপত্তি دثر থেকে। একই শব্দমূল থেকে تدثير শব্দের উদ্দেশ্য হল—ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব খড়কুটোর বাসা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে অসহায় পাখিটিকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দিয়ে গেল। শোকার্ত পাখি উড়ে গিয়ে আবার চঞ্চুর ফাঁকে একটি একটি করে খড় এনে ভাঙ্গা ঘর মেরামত করল। আবার ফুটে ওঠলো তার কণ্ঠে সুরেলা গান। পাখীর সেই বাসা পুনঃনির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'তাদসীর'।

হযরত ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পর ছয়শ দশ বছর পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন হলো না। নবীহীন অভিভাবক শূন্য গোটা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ্ পাক সেই লণ্ডভণ্ড পাখীর বাসার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, জগৎ জুড়ে প্রচণ্ড শয়তানী ঝড় উঠেছিলো, কুফর ও যুলমতের প্রচণ্ড তাণ্ডবে হযরত ঈসা (আ.) ও এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের সযত্ন-নির্মিত বাসাটি লন্ডভন্ড হয়ে গোটা মানবতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। অতঃপর আখেরী নবী সেই লন্ডভন্ড বাসাটি পুনঃনির্মাণ করলেন। তাই তাকে বলা হল—يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ হে মানবতার পুনঃনির্মাণকারী! আসুন, উঠুন, দাঁড়ান। আপনার রবের বড়ত্বের কথা বলুন। আপনার বরকতে বিপর্যস্ত মানবতার ঘর পুনঃনির্মিত হবে। আবার আলোয় ঝলমল করে হেসে উঠবে। এভাবেই আল্লাহ্ পাক আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানের উচ্চাসন দান করেছেন।

কামিয়াবীর পথ

আমরা আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। আমাদের এই উত্তরাধিকার অর্ধ-সম্পদ বা স্বর্ণ-রৌপ্যের নয়। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারী। নবীর সেই আদর্শ নিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার দায়িত্ব মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে দান করেছেন। আমি যে আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারছি,

আল্লাহ্ পাক তাঁর জীবনী সংরক্ষণ করার ফলেই তা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।। যেহেতু তার জীবন ও জীবনাদর্শ কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাক তার জীবনাদর্শ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে মজলিশে উপবেশন করতেন, কিভাবে লোক সমাজে কথা বলতেন, কিভাবে মানুষের দিকে ইশারা করতেন, কথা বলার সময় কিভাবে হাত নাড়তেন, তাঁর আনন্দ বা ক্রোধের সময় তার চেহারায় কি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠতো, হাদীসের কিতাবে সব কিছুই সংরক্ষিত আছে। এটা আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি আচরণ আমাদের জন্য সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যার ফলে শত শত বছর ধরে তা মানুষের মাঝে প্রচার হয়ে আসছে। আমরাও আল্লাহ্র ফযলে তা আপনাদের সামনে বলতে পারছি এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের জীবন গঠন করাও সহজ হয়ে গিয়েছে। এটাই আমাদের কাজ। এটা কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর কাজ নয়, সকল মুসলমানের দায়িত্ব। আমরা 'তাবলীগ জামাত' নামে কোন বিশেষ দল নই। আমরাও মুসলমান, আপনারাও মুসলমান। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি সে দায়িত্ব আপনাদেরও। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সে কর্তব্য আপনাদেরও। এখানে কোন দল বা জামাতের প্রশ্ন আসে কেন! আমাদেরকে একটা ভিন্ন দল বা ফেরকা হিসাবে আপনারা কোন যুক্তিতে সাব্যস্ত করছেন ?

আমি তো আপনাদের সামনে শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই বলছি। মানুষ কিভাবে সফল হতে পারবে ? প্রকৃত সাফল্য মানুষের জীবনে কোন্ পথে আসবে ? এটাই আমার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নমুনা রেখে গিয়েছেন। তাঁর অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্তা ও আচার-আচরণ-সহ জীবনের প্রতিটি বিষয়ই সংরক্ষিত আছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেবাস-পোশাকে দারিদ্রতার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে পোশাক কখনো অপরিচ্ছন্ন ছিল না। শতছিন্ন তালিযুক্ত পোশাক তাঁর অঙ্গে শোভা পেত সত্য, কিন্তু সে পোশাক কখনো মলিন থাকতো না। কাজেই টুপি-পাগরী তেল চিটচিটে ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা কোনভাবেই বুযুর্গী নয়। এটা হিন্দুয়ানী প্রথা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তাই পরিচ্ছন্নতা ঈমানের

অঙ্গ। দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হওয়ার অর্থ অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা নয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা ছিল উজ্জ্বল। সৌন্দর্যে তাঁর দেহের প্রতিটি অংশই ছিল অতুলনীয়। তাঁর দিকে যতই দেখা হত, ততই যেন তাঁর সৌন্দর্য আরো অধিক মাত্রায় প্রতিভাত হত। সৌন্দর্যের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য শুধু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ছিল।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মুবারক আদর্শ নিয়ে আমাদেরকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের জীবনের অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ্র কসম! আপনাদেরকে তাবলীগী জামাতের সদস্য করার জন্য আমি এখানে আসি নি। তাদের কাছ থেকে আমি না কোন বেতন পাই, না কোন আর্থিক সহযোগিতা পাই। কিংবা নতুন কোন মতবাদ বা আদর্শ প্রচার করার জন্যও এখানে আমার আগমন হয় নি। আমি তো কেবল আপনাদের সামনে আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর আদর্শের বিবরণ দিয়েছি। আমরা যাতে তাঁর আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হয়ে যাই এবং সেই আদর্শের বাণী নিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ি—এই ছিল আমার বক্তব্য। এই দায়িত্ব আমাদের নারী-পুরুষ সকলেরই।

এই মেহনতের বদৌলতে বিগত ষাট-সত্তর বছরে গোটা দুনিয়ায় এমন ব্যাপকভাবে দ্বীনের আওয়াজ পৌঁছে গিয়েছে যা সত্যই বিস্ময়কর। ছয়টি মহাদেশেই আমি সফর করেছি। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ পাক ছয় মহাদেশেই এ মেহনতের যে নূর ও আছর প্রকাশ করেছেন, তা দেখে অবাক হতে হয়। ভারতের এক নিভৃত পল্লীতে যে মেহনতের শুরু, এখন তা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত গোটা দুনিয়ায় বিস্তৃত।

কাজেই মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা হিম্মত করুন এবং নিজের জীবনকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করুন। তাবলীগ জামাতের জন্য নয়, বরং দ্বীন শিখা ও প্রচারের জন্য জীবন থেকে এক চিল্লা বা চার মাস সময় বের করুন। আল্লাহ্ পাক সকলকে তওফীক দান করুন। আমীন।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم انكم لتموتون كما تنامون و تحيون كما تبعثون ثم انها الجنة ابدا او النار ابدا . او كما قال صلى الله عليه وسلم .

আল্লাহ্ পাকই একমাত্র স্রষ্টা

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! জগতে আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, যার সঠিক সংখ্যা শুধু মাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। সেই অগণিত ও অসংখ্য সৃষ্টির প্রতিটিরই একটি নিজস্ব আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এবং প্রতিটি সৃষ্টিরই স্থায়িত্বকাল হিসাবে একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মহান যাত ছাড়া যেখানে যত বস্তু রয়েছে, সবকিছুই সৃষ্টি। শুধু আল্লাহ্ পাকই স্রষ্টা আর সবকিছুই সৃষ্টি। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আর সকলেই তাঁর করুণার মুখাপেক্ষী। তিনিই একমাত্র মালিক, আর সকলে তাঁর অধীনস্থ। তিনিই একমাত্র দয়ালু, আর সকলে তাঁর দয়ার ভিখারী।

দুনিয়ায় আমরা যে মানুষরূপে জন্ম লাভ করেছি, তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায়। লৌহ পদার্থ যে কঠিন হয়েছে, তাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায়। আসমান যে উপরে স্থাপিত হয়েছে, সেক্ষেত্রেও আসমানের নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। والسماء رفعها আল্লাহ্ পাকই তাকে সেভাবে স্থাপন করেছেন। যমীন যে আমাদের পায়ের নীচে এমন সুন্দর ও সমতলরূপে স্থাপিত হয়েছে, যমীন নিজের ইচ্ছায় তা হতে পারে নি। والارض فرشنها আল্লাহ্ পাকই তাকে স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই যে মনোরম ও সুউচ্চ পর্বত-শ্রেণী,

এগুলোও তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় স্থাপিত হতে পারে নি। والجبال ارسها আল্লাহ্ পাকই এই পর্বতশ্রেণীকে স্থাপন করেছেন। واخرجنا منها ماءها মাটির নীচে এই সুপেয় পানির ধারা, পর্বতশ্রেণী থেকে কল্লোলিত হয়ে বয়ে চলা নির্ঝরণী। তাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি। মাটির গভীর থেকে এই পানির ধারা আল্লাহ্ পাকই প্রবাহিত করছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যমীনের উপর পানিকে স্থীতি দান করেছি। পানি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি।' বৃষ্টি না দিয়ে আল্লাহ্ পাক অন্য উপায়েও পানি বর্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু পৃথিবীকে আল্লাহ্ পাক একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালনা করছেন। তাই وانا صببنا الماء صبا বৃষ্টি হয়। যমীনের ফাঁব ফোকর গলে সেই পানি যমীনের অভ্যন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়। তারপর আল্লাহ্ পাক বলছেন—

وَإِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۞

আমি ইচ্ছা করলেই যমীনের এই পানির ধারা বন্ধ করে দিতে পারি। এক ফোঁটা পানির জন্য তখন তোমরা হাহাকার করে মরবে। আমাকে বল তো, যদি আমি এই পানির ধারা একেবারে নিঃশেষ করে দেই, فمن يأتيكم بماء معين তাহলে কে আছে তোমাদেরকে পানি দেবার মত ?

জগত একান্ত আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের সামনে এই যে দৃশ্য-অদৃশ্য মহা জগত, তা আল্লাহ্ পাক একমাত্র নিজ ইচ্ছাতেই সৃষ্টি করেছেন। এর আকৃতি-প্রকৃতিও আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে যেমন এর আকৃতিকে স্ব-অবস্থায় রেখে জগতের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিতে পারেন, তেমনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে এর আকৃতি-প্রকৃতি সবই মিটিয়ে দিতে পারেন। আমরা বর্তমানে যে আকারে ও অবস্থায় আছি, এটাও আল্লাহ্ পাকের একটি কুদরতের প্রকাশ। আবার তাঁর অপর একটি কুদরতের কথা তিনি এভাবে প্রকাশ করছেন—

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِهٖ ۞

তোমাদের চোখ, কান, বুদ্ধি-বিবেচনা যদি আল্লাহ্ পাক নষ্ট করে দেন, তাহলে একমাত্র তিনি ছাড়া এই ক্ষমতাগুলো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবার মত আর কে আছে ? অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে, আমাদেরকে বর্তমান অবস্থা

থেকে ভিন্ন একটি অবস্থায়ও পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

আল্লাহ্ পাক তাঁর আরো একটি কুদরতের কথা এভাবে প্রকাশ করেছেন—

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ *

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন এক জাতি সৃষ্টি করবো। অন্যত্র আমাদেরকে ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমাদের আকৃতিই আমি পরিবর্তন করে দিব। মানব-আকৃতি থেকে পরিবর্তন করে আমাদেরকে আল্লাহ্ পাক অন্য কোন প্রাণীর আকৃতি দান করতেও সক্ষম। মোটকথা আল্লাহ্ পাকের নিকট অসম্ভব বা দুঃসাধ্য বলে কিছু নেই। যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা, অতি অনায়াসে তা তিনি সমাধা করতে পারেন।

আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য নেয়ামত

এই যে মহা বিশ্ব, বিশ্বের অসংখ্য বস্তু, তাদের আকৃতি, গুণাগুণ, স্থিতি বিনাশ, কোন কিছুতেই সামান্য শরিষার দানা পরিমাণ দখলও তাদের নিজেদের নেই। সবকিছুকে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রকৃত ও একমাত্র স্রষ্টা।

এই মহাবিশ্বে লৌহ পদার্থের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ্ পাক এই লোহার বিশাল বিশাল খনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বাতাস ছিল না। আল্লাহ্ পাক পাঁচশত মাইল পুরো বাতাসের এক চাদর দিয়ে পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছেন। আমাদের পায়ের নীচের এই যে আদিগন্ত বিস্তৃত মাটি, একসময় তার একটি বালুকণাও ছিল না। আল্লাহ্ পাক এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। কোথাও এক ফোঁটা পানির অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্ পাক সাত সমুদ্র সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না, আল্লাহ্ পাক আকাশকে মেঘে মেঘে ঢেকে দিয়েছেন। সুদূর আকাশে এই যে, মিটিমিটি তাঁরা, এদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্ পাক অসংখ্য-অগণিত তারকা দিয়ে আকাশকে সাজিয়ে দিয়েছেন। আগুণ ছিল না। আল্লাহ্ পাক তাও সৃষ্টি করেছেন। পশু-পাখী, গাছ-পালা, তরুলতা ; কিছুই ছিল না। অনস্তিত্ব থেকে আল্লাহ্ পাক সবকিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। ক্ষমতার এই অনন্যতা আল্লাহ্ পাকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ পাক একটি মাত্র আদেশেই ফিরিশতাদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে এমন বিশালাকায় অনেক ফিরিশতাও রয়েছেন যে, তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠে গোটা সাত সমুদ্রের পানি অনায়াসে এঁটে যাবে। এমন কি সেখান থেকে এক ফোঁটা পানিও গড়িয়ে নীচে পড়বে না। যে আল্লাহ্ একটি

মাত্র নির্দেশে এমন বিশালাকায় ফিরিশতা সৃষ্টি করতে পারেন, সেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব যে কত বিশাল ও ব্যাপক হতে পারে, ভেবে তার কুল-কিনারা পাবার সাধ্য মানুষের কোথায়!

আল্লাহ্ পাক একবার হযরত মূসা (আ.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, এই আসমান ও যমীন যদি আমার নির্দেশের অনুগত না হত, তাহলে আমি এমন একটি প্রাণী ছেড়ে দিতাম, যে প্রাণী এই আসমান ও যমীন উভয়টিকে গিলে ফেলত। আর এই উভয়টি হত তার একটি লোকমার সমপরিমাণ। আপনারা গোটা পৃথিবীর আকৃতি এবং এই সুবিশাল আকাশের আয়তন সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন। তারপর এই আসমান ও যমীনকে যে প্রাণী মাত্র একটি লোকমা হিসাবে গিলে ফেলতে পারে সেই প্রাণীটির মুখ কত বড় হতে পারে, প্রাণীটিই বা কত বড় হতে পারে, এবং সর্বোপরি প্রাণীটি যেই চারণভূমিতে চড়ে বেড়ায় তাই বা কত বড়, সে সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন। এ সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের গায়েবী নেযাম। এই মহা বিশ্বের একটি অতি ক্ষুদ্র বস্তু থেকে নিয়ে মহান আরশ পর্যন্ত সব কিছু এক আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি। যেই আল্লাহ্ পাক এত বড় স্রষ্টা, তাঁর বিশালতা ও কুদরত যে কত সর্বব্যাপী তা মানুষের চিন্তা-ক্ষমতারও অতীত।

আল্লাহ্ পাকের কুদরত

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে সৃষ্টি জগতে, সবকিছুই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের অধীন। কিছুই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। কাজেই যখন ইচ্ছা তিনি যে কারো ও যে কোন বস্তুর আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতে পারেন। হযরত মূসা (আ.)-এর হাত থেকে যখনই লাঠি পড়ে গেল, فاذا هى حية تسعى সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ফনা তুলে ফোঁস ফোঁস করে ছুটতে লাগলো। আল্লাহ্ পাক মুহূর্তের মধ্যে তার একটি সৃষ্টির আকৃতি ও প্রকৃতি সবই পরিবর্তন করে দিলেন। অপর একটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক বস্তুর আকৃতি তার স্বঅবস্থায় বহাল রেখে শুধু প্রকৃতি পরিবর্তন করেও দেখিয়ে দিয়েছেন— قلنا يا نار كونى بردا و سلاما ওহে অগ্নিকুণ্ড! তুমি আরামপ্রদ শীতল হয়ে যাও। আগুন আগুনের নিজ রূপেই লেলিহান হয়ে রইল। শুধু তার চরিত্র পরিবর্তন হয়ে শীতল হয়ে গেল। হযরত ইউনুস (আ.)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক মৃত্যুর সকল উপকরণ সৃষ্টি করে সেগুলো থেকে মারণ-শক্তি দূর করে দিয়ে তার মধ্যেই হযরত ইউনুস (আ.)-কে জীবিত রাখলেন। উত্তাল সমুদ্রবক্ষে এক বৃহদাকৃতির মাছ তাঁকে গিলে ফেললো। মৃত্যুর সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। কিন্তু আল্লাহ্ পাক সেই আলো-বায়ুহীন মৎসগর্ভেই তাঁর জীবন সচল রেখেছেন।

প্রকৃত মালিক

উপরোক্ত ঘটনাবলী দ্বারা আল্লাহ্ পাক এই বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করতে চেয়েছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতের প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিক হলেন আল্লাহ্ পাক। তাঁর ইচ্ছাতেই গোটা সৃষ্টি জগত চলছে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো পক্ষেই এ বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن আল্লাহ্ পাকের যা ইচ্ছা তাই হয়, আর যা ইচ্ছা নয়, তা কিছুতেই হয় না। তার যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন—কাউকে কন্যা দান করেন। কাউকে পুত্র দান করেন। কাউকে পুত্র-কন্যা উর্ভয়ই দান করেন। আর কাউকে একেবারে নিঃসন্তানই রেখে দেন। এটা একান্তই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা।

মোটকথা, এই মহা বিশ্বের প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। গোটা বিশ্বের কোন একটি বস্তুও এমন নেই, যা আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং এই বিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বস্তুর একমাত্র মালিকও আল্লাহ্ পাক। সকল বস্তুকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। বস্তুসমূহের এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে, নিজে নিজে নয়।

পানির কলকল-ছলছল প্রবাহ,
পাহাড়ের অনড় স্থিতি,
বাতাসের কোমলতা,
সূর্যের প্রখরতা,
চাঁদের স্নিগ্ধিতা,
তারকার মিটিমিটি জ্বলে থাকা,
রাতের আঁধার, আর
দিনের উজ্জ্বলতা,
শস্যক্ষেতের শ্যামলতা,

ফুলের সুবাস ও ফলের স্বাদ, বুলবুলির কণ্ঠে অনাবিল সুর-মুর্ছনা, আর মানুষের মাঝে অসংখ্য গুণের সমাবেশ—এর কিছুই নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি। এর পিছনে রয়েছে এক মহা শক্তির কুদরতী হাত। এক কুশলী স্রষ্টার অতুলনীয় শিল্প। মোটকথা, এ জগতে যা হয়, তার সবই রাব্বুল আলামীনের ইশারায় হয়।

আল্লাহ্ পাকের কোন শরীক নেই

এ নিখিল বিশ্বের একক স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের কোন অংশীদার বা শরীক নেই। এ বিষয়ে কালামে পাকে বর্ণিত কিছু আয়াত আমি আপনাদের

সামনে উপস্থাপন করছি—

وا لهكم اله واحد . لا اله الا هو الرحمن الرحيم . الله لا اله الا هو . رب المشرق والمغرب لا اله الا هو . فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو .

তোমাদের মাবুদ একজন। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি পূর্ব-পশ্চিম তথা গোটা নিখিল বিশ্বের রব। তিনি একা। তারা যদি আপনাকে ত্যাগ করে যায়, আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই। কোন উযীর নেই, পরামর্শদাতা নেই। স্ত্রী-সন্তান নেই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি কোন রবও নেই। বরং وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله আসমান ও যমীনে তাঁর একাধিপত্ব ও একক রাজত্ব। পূর্ব-পশ্চিম তথা গোটা আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সকল বস্তুই আল্লাহ্ পাকের— له ما فى السموات وما فى الارض وما بين هما। গোটা সৃষ্টি জগতে নিজের রাজত্ব ও মালিকানা প্রমাণের পর তা পরিচালনা-পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে বলেছেন—

وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى .

তোমরা জোড়ে বা আস্তে যেভাবেই বল না কেন, আল্লাহ্ পাক সবই শোনতে পান। —*সূরা ত্ব-হা - ৭*

'আস্তে' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মনে মনে চিন্তা করা। আমি যে 'ইয়া আল্লাহ্!' বলছি, যত আস্তেই তা উচ্চারণ করি, আল্লাহ্ পাক তা শোনতে পাচ্ছেন। এখন মুখ বন্ধ করে, ঠোট বন্ধ করে মনে মনেও যে 'ইয়া আল্লাহ্' বললাম, আমি নিজেও তা শোনতে পাই নি। কিন্তু আল্লাহ্ পাক বলছেন, আমি তাও স্পষ্ট শোনতে পেয়েছি। যিনি এমন গুণের অধিকারী তিনিই কেবল হতে পারেন গোটা সৃষ্টি জগতের একক মালিক—

الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى , اننى انا الله لا اله الا انا, هو الله الذى لا اله الا هو , عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم , هو الله الذى لا اله الا هو , قل هو الله احد .

www.almodina.com

উপরোক্ত আয়াতগুলোর সারমর্ম হল, গোটা সৃষ্টি জগতে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর। কোন কাজ করার জন্য তাঁকে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় না। তাঁর ইচ্ছার কোন অংশীদার নেই। তাঁর চেয়ে বড়, তাঁর চেয়ে প্রবল ও প্রচণ্ড কেউ নেই। একমাত্র তিনিই শক্তিশালী, আর সকলে শক্তিহীন। তিনিই রাজাধিরাজ, আর সকলে তাঁর প্রজা। তিনিই সকলকে সাহায্য করেন, আর কারো সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তিনি সকলকে রক্ষা করেন, আর কারো রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। তিনি সকলকে প্রতিপালন করেন, আর সকলে প্রতিপালিত। এই প্রতিপালনের জন্য তাঁকে কারো নিকট সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না। বরং انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون শুধু 'কুন্' বলাতেই সব হয়ে যায়। 'কুন্ বলা' দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, আল্লাহ্ পাক দিন রাত শুধু 'কুন্ কুন্' বলে চলেছেন। এটা শুধু আমাদেরকে বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল—আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছাই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করে থাকে।

আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাক নিজের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর এমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই যাকে পরওয়া করতে হবে বা তার কাছে কিছুর আশা করতে হবে। তাঁর ইচ্ছার পথে এমন কোন বাঁধা দানকারীও নেই, যাকে ঘুস দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হবে বা তার কাছে কারো সুপারিশ নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। বরং وهو معكم اين ما كنتم তিনি এমন সর্বব্যাপী সত্ত্বা যে, তোমরা যেখানেই থাক, এবং যে অবস্থাতেই থাক, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। চাই রাতের অন্ধকারেই চল বা দিনের আলোতেই চল। চাই সমুদ্র-পিঠে বা সমতলের বুকে চল। পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় বা সুবিশাল আকাশের যে প্রান্তে গিয়েই লুকিয়ে থাক না কেন, আল্লাহ্ পাক সর্বক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আছেন। انها ان تك مثقال حبة من خردل সরিষা পরিমাণ পাপ বা পূণ্য যাই করো না কেন, তা যদি কোন অন্ধকার গুহায় বা সুবিশাল আকাশের কোন এক সুদূর প্রান্তে অথবা যীমনের গভীরেও লুকিয়ে থাকে, আল্লাহ্ পাক সেখান থেকে তা বের করে এনে তোমাকে দেখাবেন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

আল্লাহ্ পাক তাঁর ইচ্ছার ক্ষেত্রে কোন ফিরিশ্তা, মানব-দানব, নবী-রসূল বা আগুন-পানি-মাটি, কিছুরই মুহ্তাজ নন। নিজের রাজত্ব পরিচালনার জন্যও আরশ-ফরশ বা আসমান-যমীনের মুখাপেক্ষী নন। নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য

তাঁর ফিরিশ্‌তাকুল বা মানবজাতিরও প্রয়োজন নেই। নিজের কুদরত প্রকাশের জন্য রাত্র-দিনের এই সুশৃংখল পালাবদলের আবশ্যক নেই। আমাদের সজদা আর ফিরিশ্‌তাদের ইবাদত না হলেও তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি এমন মহান এক অস্তিত্ব ....

যাঁর কোন শুরু নেই, শেষও নেই।
যাঁর কোন আরম্ভও নেই, অন্তও নেই।
যিনি সকলকে আকৃতি দান করেছেন, কিন্তু নিজে নিরাকার।
সকলকে রঙে-বর্ণে বর্ণিল করে তোলেছেন, কিন্তু তিনি বর্ণহীন।
সকলের আহার্যের যোগান দেন, কিন্তু তাঁর আহারের প্রয়োজন নেই।
সকলকে নিদ্রা দান করেন, কিন্তু তাঁর নিদ্রা নেই।
সকলকে মৃত্যু দান করেন, কিন্তু নিজে মৃত্যু থেকে পবিত্র।
সব কিছু বিনাশ করেন, কিন্তু নিজে অবিনাশী।
আল্লাহ্ পাক পবিত্র কালামে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন—

ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين.

আমার বান্দারা! তোমরা কি আমার পরিচয় জান ? আমি তোমাদের রব। আমি মাত্র ছয় দিনে গোটা আসমান-যমীনকে স্থাপন করেছি। তারপর আরশের উপর নিজে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছি। রাত দিনের নেযাম চালু করে একটিকে অন্যটির অনুগামী করেছি। এই চন্দ্র-সূর্য ও তারাকারাজিকে নিজের গোলাম বানিয়েছি। মন দিয়ে শোন ...

সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই এবং হুকুমতও একমাত্র তাঁর।
একথাটিই আল্লাহ্‌র নবী নিজের ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন—

الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده ....

রাতও আল্লাহ্‌র, দিনও আল্লাহ্‌র। রাত-দিনের সমস্ত মাখলুকও আল্লাহ্‌র। সৃষ্টি আল্লাহ্‌র, হুকুমতও আল্লাহ্‌র। এই রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই। এ

বিষয়ে তাঁর কোন শরীক নেই। অর্থাৎ, এই হুকুমত ও রাজত্বের ক্ষেত্রে তিনি কারো সঙ্গে পার্টনারশীপ করছেন না। দুই ভাই যেমন পিতার সম্পদে পরস্পরের শরীক, আল্লাহ্ পাকের তেমন কোন শরীক নেই। সে ঘোষণা দিয়েই তিনি বলেন— لم يلد তাঁর কোন পূর্বসুরি নেই। ফলে বাপ-দাদা ও ভাই-বেরাদরের বন্ধন থেকে তিনি পবিত্র। لم يولد তাঁর কোন উত্তরসূরিও নেই। ফলে ছেলে-সন্তান থেকেও তিনি পবিত্র। পূর্ব থেকে চলে আসা অংশিদার হল শরীক। আর 'মুশারিক' বলা হয়—প্রথমে একাই ছিল। পরে বিষয়-সম্পদ ও ব্যবসা-বানিজ্যের প্রশার হওয়ায় যখন সবকিছু একা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ তার কোন বিশ্বস্ত ভাই, বন্ধু ও নিকটস্থীয় কাউকে ব্যবসা-বানিজ্য ও বিষয়-সম্পদ সামাল দিবার কাজে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করে। মোটকথা, পৈত্রিক বিষয়-সম্পদের অংশিদারকে বলা হয় শরীক। আর যাকে কাজে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সে হল মুশারেক।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন—আমার এমন কোন মুশারিকও নেই যে, আমি আমার কার্য পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছি, এই আসমান ও যমীন রক্ষণাবেক্ষণ আমার একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, ফলে কোন সহযোগী গ্রহণ করেছি। আর না এমন কোন শরীক আছে, যে শুরু থেকেই আমার রাজত্বের অংশীদার হিসাবে রয়েছে। বরং আমার অস্তিত্ব, আমার গুনাবলী ও আমার ইচ্ছার ক্ষেত্রে আমি একক। যাহোক, আল্লাহ্ পাক বলেছেন—

ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن .

আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়, তিনি যা চান না, তা কিছুতেই হয় না। কিন্তু আজ আমাদের চেতনার এমন বিপর্যয় ঘটেছে যে, আমরা ভাবছি টাকা দিয়েই সবকিছু হয়। আজ মানুষ পাথরের মূর্তি পূঁজা করে না ঠিক, সজদা করতে কবরের কাছেও যায় না তাও অনেকাংশে সত্য। মানুষ যেন একেবারে খাঁটি ঈমানদার হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ মু'মিনের শান এমনই হওয়াই উচিত ছিল যে, তার কপাল আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে সজদায় অবনত হবে না। কিন্তু দুঃখজনক হলো পাথরের মূর্তির স্থানে আজ অন্য এক মূর্তি মানুষের মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সেই মূর্তিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হয়ত সজদা করে না, কিন্তু অন্তর তার সামনে এক বিরামহীন সজদায় নত হয়ে আছে। সেই মূর্তিটি হল অর্থ-সম্পদ। আজ আমাদের বিশ্বাস হল, টাকা দিয়েই সব কিছু হয়। টাকা নেই তো কিছুই নেই। টাকা থাকলে সম্মান আছে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সব আছে। টাকা না থাকলে কেউ জিজ্ঞাসা করতেও আসে না। আত্মীয়তা, বন্ধু-ভালবাসা

www.almodina.com

কিছুই থাকে না। টাকাই হল আজকের এক অদৃশ্য মূর্তি। যে মূর্তির সজদায় আমাদের হৃদয় সতত নত হয়ে আছে।

টাকা আজ আমাদের গোটা হৃদয় আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কালামে নানাভাবে আমাদেরকে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাকই সব কিছুর উৎস। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার পথে কোন রাজার রাজত্ব, অর্থের সঙ্কট বা অন্য কোন বিষয়ই বাঁধা হতে পারে না। একথা সত্য যে, দুনিয়া 'দারুল আস্‌বাব'। বাহ্যত দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ই বস্তুনির্ভর। চর্মচোখে দেখা যায় যে, টাকা দিয়ে কার্য উদ্ধার হয়। ঔষধ দিয়ে রোগ ভাল হয়। বেঁচে থাকার জন্য আহার্যের প্রয়োজন হয়। ব্যবসা ও চাষবাসের প্রয়োজন হয়। তবে, মনের বিশ্বাসও বস্তুনির্ভর হয়ে পড়া, বস্তুর সহযোগিতা ছাড়া কিছু না হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়তা লাভ করা এমন একটি ভুল, যাতে শিরকের জীবানু লুকিয়ে রয়েছে।

মানুষের দেহে টি.বি.-জীবানুর অস্তিত্ব যেমন তাকে যে কোন মুহূর্তে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়, তেমনি 'টাকা ছাড়া কিছু হয় না' —মনের এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে শিরকের জীবানু লালন করারই নামান্তর। এই জীবানু সক্রিয় হয়ে ওঠলেই গোটা অস্তিত্বকে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলবে, সন্দেহ নেই। মোটকথা, আজ মানুষের মনের কেবলা আর আল্লাহ্ পাকের মহান যাত নয়। সে স্থানটি এখন দখল করে নিয়েছে অর্থ-সম্পদ ও ব্যবসা-বানিজ্য।

নামাযের অমনোযোগিতা

আজকাল আমাদের অবস্থা হল, মসজিদে গিয়ে 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে নামাযে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরই দেখা যায়, মন আর নামাযে নেই। এতে বুঝা যায় যে, আমাদের মনের কেবলা আল্লাহ্ পাক নয়। অথচ বান্দা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে, তখন আরশের সমস্ত দরজা খুলে যায়। যখন সে الحمد لله رب العالمين বলে, তখন আল্লাহ্ পাক বান্দার প্রতি মনোযোগী হয়ে তার সঙ্গে বাক্যালাপ আরম্ভ করেন। অথচ বান্দা তখন তার দোকান-মকান আর ব্যবসা-বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার অস্তিত্বের মূল অংশ আত্মাকে দোকান-মকানে পাঠিয়ে দিয়ে শুধু পেশাব-পায়খানায় পূর্ণ তার দেহটি কিছু নাপাকির বোঝা নিয়ে মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে প্রমাণ হয় যে, তার অন্তর আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও অপরিচিত। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে মানুষের অন্তরের এই অপরিচয়ের কারণ হল, অর্থ-নির্ভর মানসিকতা। দুনিয়ার ইয্যত-

সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছু টাকায় অর্জিত হয়—এই চেতনায় মনের আচ্ছন্নতা।

অপরদিকে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন—হে আমার বান্দারা! আল্লাহ্ই সব কিছু। তিনি কোন 'সবব' বা উপকরণের মোহ্তাজ নন। সেই ঘটনাটি কি তোমাদের জানা নেই ?—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ইবরাহীম (আ.)-কে তাতে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়েছে। একদিকে পানির ফিরিশ্তা দাঁড়িয়ে আছেন, একদিকে হযরত জিবরায়ীল (আ.) দাঁড়িয়ে আছেন। মাঝখানে হযরত খলীলুল্লাহ্ আগুনের কুণ্ডলির মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন। পানির ফিরিশ্তা অস্থির হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য প্রার্থনার অপেক্ষা করছেন। তিনি সাহায্য চাইলেই পানি ছিটিয়ে গোটা আগুনের কুণ্ডলি নিভিয়ে দিবেন। হযরত জিবরায়ীল (আ.)-ও তার সাহায্য প্রার্থনার অপেক্ষা করছেন। সাহায্য চাইলেই তিনি তাকে উঠিয়ে আগুন থেকে সরিয়ে দিবেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) ঈমানের এমন এক স্তরে ছিলেন, যেখান থেকে হযরত জিবরায়ীল (আ.)-এর বিশাল অস্তিত্বকেও নিতান্ত একজন মাখলুক ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল যে, একজন মাখলুক দ্বারা কিছুই হতে পারে না। যা করার একমাত্র আল্লাহ্ পাকই করেন। তাই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়ার মুহূর্তেও তিনি হযরত জিবরায়ীল (আ.)-এর নিকট সাহায্যের কোন আবেদন জানালেন না। বরং তিনি বললেন, حسبى الله ونعم الوكيل। আল্লাহ্ পাকই আমার জন্য যথেষ্ট। ফলে আল্লাহ্ পাক এই 'আসবাবের দুনিয়ায়' এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন এবং সেই ঘটনাটি কোরআন মজীদে উল্লেখ করে আমাদেরকে বললেন—হে আমার বান্দারা! তোমরা অর্থ-সম্পদ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের গোলামী থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহ্র গোলামী গ্রহণ কর। তোমরা এমন 'তাওহীদ' অর্জন কর যে, যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের হৃদয়ে যেন আমি ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব না থাকে। যদি নামাযে তোমাদের হৃদয়ে আমি ছাড়া আর কারো উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে, তাহলে মনে করবে, সে তাওহীদ নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল নয়। এ তাওহীদ তোমাদেরকে চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেবার সামর্থ্য রাখে না।

নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.)

নামাযের মধ্যেই যে ব্যক্তির আল্লাহ্ পাকের কথা মনে থাকে না, সে ব্যক্তি দোকানে বসে আল্লাহ্র স্মরণে বিভোর হয়ে থাকবে, একথা কি বিশ্বাস করা যায় ? আর যে ব্যক্তি নামাযই পড়ে না, তার সম্পর্কে কী বলা যায় ?

যা হোক, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বললেন حسبى الله ونعم الوكيل আমার জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট, তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর গায়েবী নেযাম চালু করে দিলেন। আগুন যথারীতি জ্বলতে থাকলো এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও অগ্নিকুণ্ড থেকে বের করে আনা হল না। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলেই এক ধাক্কায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনের ওপারে নিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু সে ধরনের কিছুই করা হল না। বরং তাঁকে যখন আগুনের উপর ছুড়ে দেয়া হল, আল্লাহ্ পাক তাঁকে অগ্নিকুণ্ডের ঠিক মাঝখানেই ফেললেন। তবে, সঙ্গে সঙ্গে আগুনকে একথাও বলে দিলেন—يا نار كونى بردا و سلاما ইবরাহীমের জন্য আরামদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও। আল্লাহ্ পাক যখন بردا বললেন, আগুন এমন শীতল ওয়ে উঠলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক বললেন, سلاما আরামপ্রদ। মা যেমন তার শীতকাতর সন্তানকে গরম পোশাকে আবৃত করে দেয়, আগুন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তেমনি আরামপ্রদভাবে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর নিয়ে বসিয়ে দিল। দূর থেকে অপেক্ষমান লোকজন দেখতে পেল, বস্ত্রহীন হযরত ইবরাহীম (আ.) সুন্দর বস্ত্রে আবৃত হয়ে বেশ খোশ মেজাজেই বসে আছেন।

কাণ্ড দেখে দর্শকদের একজন বলে ওঠলো—

نعم الرب ربك يا ابراهيم.

ইবরাহীম! তোমার রব তো ভারী জবরদস্ত!

ঈমান না এনেও লোকটি আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতার অকুণ্ঠ স্বীকার করলো।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও আল্লাহ্ পাকের কুদরত

হযরত মারইয়াম (আ.) গোসল করার জন্য একদিন কুপের পারে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর হঠাৎ তাঁর সামনে এক ফিরিশ্‌তা এসে উদয় হলেন। হযরত মারইয়াম (আ.) চমকিত হয়ে বলে ওঠলেন— اعوذ بالرحمن আল্লাহ্ রক্ষা করুন! তুমি কে? ফিরিশ্‌তা বললেন, ঘাবরাবার কিছু নেই। انما انا رسول ربك আমি একজন ফিরিশ্‌তা। হযরত মারইয়াম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে কি জন্য এসেছো ? জবাবে ফিরিশ্‌তা বললেন— لاهب لك غلاما ذكيا আল্লাহ্ পাক আপনাকে একজন সন্তান দেবার ইচ্ছা করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই আমার আগমন। হযরত মারইয়াম (আ.) আরো অধিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– - كيف يكون لى غلام আমি একজন অবিবাহিতা কুমারী নারী। আমার সন্তান হবে কিভাবে?

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ ঘটনা শোনাবার রহস্য কি? তিনি কি কোন গল্পকার ? শুধু গল্প শোনাবার উদ্দেশ্যেই কি তিনি ঘটনা বলেন? অবশ্যই নয়। কোরআনে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই একটি অতীব সত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে। একটি বাস্তবতার বিশ্বাস আল্লাহ্ পাক মানুষের মনে দৃঢ়মূল করে দিতে চান। আর তা হল—আল্লাহ্ পাক বলতে চান—আমার বান্দারা! তোমরা আমার বস্তুর গোলাম হয়ে যেয়ো না, বরং আমার গোলামী গ্রহণ কর। কোন বস্তুই আমার ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে পারে না। আমার যখন যেমন ইচ্ছা, বস্তুকে আমি তখন তেমন করি। কাজেই বস্তু ও আমার হুকুম কখনো বিপরীত অবস্থানে দাঁড়ালে বস্তু ত্যাগ করে আমার হুকুমকেই গ্রহণ করবে। আমার হুকুম পালন করতে গিয়ে যদি জীবনও দিতে হয়, তাতেও দ্বিধা করবে না। কোরআনে উদ্ধৃত ঘটনাবলী দিয়ে আল্লাহ্ পাক মানুষকে এ শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন। একারণেই একই ঘটনাকে একাধিকবার তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন।

যাহোক, হযরত মারইয়াম (আ.) ফিরিশ্তার কথার জবাবে বললেন, সন্তান হবার যে বৈধ উপায় রয়েছে, কারো সঙ্গে সেই বৈবাহিক সম্পর্কই তো আমার হয় নি। ولم اك بغيا তাছাড়া আমি চরিত্রহীনাও নই যে, অবৈধ উপায়ে আমার সন্তান হবে। কাজেই আমার সন্তান হওয়া কিভাবে সম্ভব ? ফিরিশ্তা বললেন, এমনিতেই হয়ে যাবে। আল্লাহ্ পাকের জন্য এটা মোটেও কঠিন কিছু নয়। ফিরিশ্তা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর দিকে অগ্রসর হলে তিনি আরো সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠলেন। তারপর আগুয়ান ফিরিশতা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে তাঁর আস্তিনটি ধরে তাতে ফুঁক দিলেন। তার এক ফুৎকারেই হযরত মারইয়াম (আ.) নয় মাসের গর্ভবতী হয়ে পড়লেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ذلكم الله ربكم الحق এই হলেন তোমাদের সত্য রব। তিনি যা চান তাই করে দেখান। আর তিনি যা করবেন না বলে স্থির করেন, তা কারো পক্ষেই করা সম্ভব হবে না। তিনি যা বন্ধ রাখবেন, তা কারো পক্ষেই সচল করা সম্ভব নয়। তিনি যা দিবেন, তাও কেউ রুখতে পারবে না। আর যা তিনি ছিনিয়ে নেন, কেউ তা দিতেও পারবে না। তিনি সবার উপরে ও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর গোলামী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

www.almodina.com

الا وان الكتاب والسلطان ليفترقان فلا تفارق الكتاب .

শোনে রাখ! এমন একটি সময় আসবে, যখন রাজত্ব ও আমার দ্বীন দুটি ভিন্ন পথে চলবে। খবরদার! রাজত্বের চক্রে পড়ে তোমরা আমার দ্বীন ত্যাগ করো না। পার্থিব স্থূল বস্তুর অনুগামী হয়ে আখেরাতকে বরবাদ করো না। দুনিয়ার গোলাম হয়ে যেয়ো না। বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামীকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করো। তোমাদের উপর এমন শাসক আসবে যে, তার অনুগমন করলে সে তোমাদেরকে গোমরাহ্ করে দিবে। আর তার অনুগমন থেকে বিরত থাকলে তোমাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো ? নবীজী বললেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর ঐ সঙ্গীদের মত ধৈর্য ধারণ করবে, যাদেরকে শুলিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল। ঐ রবের কসম যার হাতে মোহাম্মদের জীবন!...

لميتة فى اطاعت الله خير من حيات فى معصية الخالق *

আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদারী করে মরে যাওয়া, তাঁর নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক উত্তম।

কাজেই বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র চাহিদা হল, মানুষ যেন তাঁদের গোলাম ও অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে, এবং দুনিয়ার স্থূল বস্তু, সহায়-সম্পদ, ক্ষমতা ও রাজত্ব, আত্মীয়-স্বজন এবং নফ্স-শয়তানের আনুগত্য করে নিজের এই অমূল্য জীবনকে যেন বরবাদ না করে। আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। মানুষের সকল কর্মই তাঁর নখদর্পনে। মানুষের যাবতীয় কর্মের হিসাব গ্রহণ করার জন্য তিনি একটি দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন—

ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا *

و فتحت السماء فكانت ابوابا *

নিশ্চয় বিচার-দিবস নির্ধারিত রয়েছে। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে। —*সূরা নাবা - ১৭-১৯*

www.almodina.com

পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি মোটেও উদ্দেশ্যহীন নয়। যার যেমন ইচ্ছা তেমনই জীবন যাপন করবে, আল্লাহ্ পাক এ উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন নি। বরং মানব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে মহান রাব্বুল আলামীনের গভীর এক উদ্দেশ্য। মানুষের দ্বারা সে উদ্দেশ্য যথার্থরূপে পুরণ হলো কি না, সে হিসাব গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ পাক একটি দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে দিনটি শুরু হবে এ যমীন ও আসমানকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে। اذا زلزلت الارض زلزالها (যমীন যেদিন ভীষণরূপে প্রকম্পিত হবে), এটা হবে পৃথিবীর মৃত্যু। اذا السماء انفطرت (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে), এটা হবে আকাশের মৃত্যু। اذا الكواكب انتثرت (যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে), এটা হবে তারকাপুঞ্জের মৃত্যু। اذا الشمس كورت (যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে), এটা হবে সূর্যের মৃত্যু। واذا الجبال سيرت (যখন পবর্তমালা অপসারিত হবে), এটা হবে পাহাড়ের মৃত্যু। اذا البحار سجرت (যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে), এটা হবে সমুদ্রের মৃত্যু (এ মাটি منها خلقنكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخرى থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং এ থেকেই তোমাদেরকে আমি পুনঃর্বার সেদিন উত্থিত করবো), এটা হল গোটা মানব সমাজের মৃত্যু। মোটকথা, গোটা সৃষ্টি জগতই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

এ দিনটির বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ পাক কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন— 'সেদিন গোটা পৃথিবী ও পর্বমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।' (সূরা হাক্কাহ্-১৪) যেদিন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (সূরা ফাজর-২১) বস্তুতঃ এটা হবে এক বিকট শব্দ। (সূরা ইয়াসীন-২১) যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে কঠিন দিন। কাফেরদের জন্য এটা সহজ নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির-৮-১০)। সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফিরিশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে। (সূরা ফোরকান-২৯)। সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফিরিশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফিরিশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (সূরা হাক্কাহ্-১৫-১৮)।

আল্লাহ্ পাক এভাবে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে কেয়ামত দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। দুনিয়াতে তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন— যার যেমন ইচ্ছা করুন, এখানে কারো কোন কর্ম সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে না। কখনো কখনো হয়তো সামান্য ঝাঁকি দিয়ে সতর্ক করে দেন, কিন্তু আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন না কিছুই। জিজ্ঞাসা করার জন্য তিনি একটি দিন

নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সেদিনটি অবশ্যম্ভাবীরূপেই একদিন এসে উপস্থিত হবে। সেদিনটি কবে কখন এসে উপস্থিত হবে ? এ সম্পর্কে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

فيم أنت من ذكراها, إلى ربك منتهاها, إنما أنت منذر من يخشاها,

كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها .

হে আমার মাহ্‌বুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কেয়ামত দিবসের বিবরণ দেয়া তো আপনার কাজ নয়। এ সম্পর্কিত জ্ঞান শুধুমাত্র আপনার রবের কাছেই রয়েছে। আপনি শুধু মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে যান। যেদিন তারা সেই দিবসটি দেখতে পাবে, সেদিন বলবে, আমরা তো পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করেছি। —*সূরা নাযি'আত - ৪৩-৪৬*

বিচার দিবস

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের বিচারের জন্য আল্লাহ্ পাক একটি দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেদিন গোটা সৃষ্টিজগতকে আল্লাহ্ পাক ধ্বংস করে দিবেন। তারপর পুনরায় তা সৃষ্টি করবেন এবং মানুষকে পুনরোত্থিত করে তাদের ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান দিবেন। وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه, প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাদের ঘাড়ের উপর ঝুলে থাকবে। সেদিন এক দল জান্নাতে যাবে আর এক দল যাবে জাহান্নামে। কবর থেকে বেরিয়ে আসার সময় কিছু লোক বলবে—হায়! কবর থেকে আমাদেরকে কে উঠালো? তাদের উত্তরে আরেক দল বলবে—এটা সেই দিন, যার কথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। কিছু লোক সেদিন কবর থেকে বেরিয়ে এসে মাথার উপর ভর করে হাশরের ময়দানের দিকে চলতে থাকবে।

হাশরের ভয়াবহ দৃশ্য

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আরয করলেন, মাথার উপর ভর করে মানুষ কিভাবে চলবে ? জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে রব পায়ের উপর ভর করে চলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তাকে মাথার উপর ভর করে চলার শক্তি জোগাবেন। সেদিন মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানের উদ্দেশ্যে চলতে থাকবে। এক দল চলবে সওয়ারীতে

আরোহন করে। এক দল চলবে পায়ে হেঁটে। আর এক দল চলবে মাথার উপর ভর করে।

সেদিন কবর থেকে বেরিয়ে আসা কিছু লোকের চেহারা থাকবে হাস্যোজ্জ্বল, ঝলমলে—وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (সূরা গাশিয়া)। আর কিছু মুখমণ্ডল আপনি দেখতে পাবেন خاشعة عاملة ناصبة লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত। (সূরা গাশিয়া)। تعرف في وجوههم نضرة النعيم কিছু মুখমণ্ডলে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (সূরা তাতফীফ)। ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলোয় ধূসরিত ও কালিমাচ্ছন্ন। চোখ নিস্প্রভ, বিবর্ণ দেহবর্ণ। তাদের শরীর থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বের হতে থাকবে। (সূরা আবাসা)।

কিছু মানুষকে দলবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন—

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا * ونسوق المجرمين إلى

جهنم وردا *

সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করা হবে। আর অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।—*সূরা মারইয়াম ৮৫-৮৬*

গ্রীস্মকালে কুকুর যেমন জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, তেমনি কিছু লোকের জিহ্বা বেড়িয়ে নাভী পর্যন্ত ঝুলে থাকবে এবং তারা প্রচণ্ড পিপাসায় হাঁপাতে থাকবে। এই ভয়াবহ অবস্থায় তাদেরকে কবর থেকে ওঠানো হবে।

কেউ বাঁ হাতে আমলনামা পাবে। তখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বুকফাঁটা আর্তনাদ করে বলতে থাকবে— يليتنى لم اوت كتابية হায়! যদি এই আমলনামা আমার হাতে না আসত। ولم ادرى ما حسابية আমি তো জানতামই না যে, একদিন আমাকে এমন ভয়াবহ হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। এই মৃত্যুই যদি আমাকে শেষ করে দিত। কেন পুনরায় আমার উত্থান হলো! আমার ধন-সম্পদ আজ আমার কোন কাজে আসলো না! আমার রাজত্বও আমার কোন কাজে আসল না!

আর কিছু লোক তাদের আমলনামা পাবে ডান হাতে। তারা আনন্দে চিৎকার করে বলতে থাকবে— هاؤمقرؤ كتابية ওহে! তোমরা সকলে এসে

আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমার সাফল্যের সনদ দেখে যাও। এই হিসাব-দিনের বিশ্বাস আমার ছিল, এবং সেজন্য আমি প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে— ، فهو في عيشة راضية في جنة عالية আমার এই বান্দারা সুউচ্চ জান্নাতে সুখী জীবন যাপন করতে থাকবে। সে জান্নাতে গাছে গাছে পরিপক্ক ফলফলাদি ঝুলে থাকবে, এবং আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণই সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। বিগত দিনে আমাকে রাজি-খুশী করার জন্য তোমরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছ, তার প্রতিদানে আজ তোমরা যত ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তৃপ্তি মিটিয়ে পানাহার ও আনন্দ করতে থাক। আল্লাহ্ পাক বলেন— يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا তাদেরকে স্বর্ণের অলংকার ও সবুজ রেশমের পোশাক আল্লাহ্ পাক নিজ হাতে পড়িয়ে দিবেন, এবং تعرف في وجوههم نضرة النعيم আল্লাহ্ পাক তাদের চেহারায় নিজের নূরের ঔজ্জ্বল্য মেখে এমন চমকদার করে দিবেন যে, আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদের চুলগুলো সুবিন্যস্ত করে দিবেন। আর নারীদের সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ সৌন্দর্য্যের অপার বিন্যাসে সাজিয়ে দিবেন। তাদের সেই কেশগুচ্ছ হতে কয়েক গাছি চুল এনে যদি দুনিয়ায় রাখা হয়, তাহলে গোটা দুনিয়া আলোয় আলোয় ভরে ওঠবে ও সুগন্ধে মৌ মৌ করতে থাকবে।

তারপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে শত জোড়া জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন। মাথায় পড়িয়ে দিবেন নূরের মুকট। তারপর বলবেন, যাও, তোমাদের পরিবারের লোকজনদের কাছে গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠো। ফলে তারা আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে কামিয়াবীর সনদ নিয়ে আনন্দচিত্তে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে। তখন সকলেরই দৈহিক উচ্চতা হবে হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায় ১২৫ ফিট। সৌন্দর্য হবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায়। হৃদয়ের প্রশারতা হবে হযরত আউয়ূব (আ.)-এর ন্যায়। কণ্ঠের মধুরতা হবে হযরত দাউদ (আ.)-এর ন্যায়। বয়সে থাকবে হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় ৩৩ বছরের উদ্দামতা। সর্বোপরি চরিত্র-মাধুর্যে সকলেই হবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় অনাবিল। এরা হল জান্নাতের অভিযাত্রী। আর এক দল হবে জাহান্নামী।

যারা জাহান্নামে যাবে তারা পরস্পরকে গালাগালি করতে থাকবে। আর জান্নাতগামীরা একে অন্যকে 'সালাম, সালাম' বলতে বলতে চলতে থাকবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন বাহনের ব্যবস্থা থাকবে। জাহান্নামীরা জাহান্নামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পর দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর রক্ষী

ফিরিশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে—

الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و
ينذرونكم لقاء يومكم هذا *

তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসে নি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে ? তারা বলবে, হাঁ, এসে তো ছিলেন ঠিক। কিন্তু আমরা তাদের কথা মানি নি। তাদেরকে অস্বীকার করে আমরা শয়তানের অনুসরণ করেছি।

জাহান্নাম এমন এক কঠিন শাস্তির স্থান যেখানে একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে আর বের হয়ে আসার কোন উপায় নেই। তবে তাতে এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে গুনাহ্গার মুসলমানরা তাদের নিজ নিজ অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পর সেখান থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেয়ে বের হয়ে আসবে। জাহান্নামীদের জন্য সেখানে আগুনের বড় বড় খাঁচা তৈরী করা হবে। সেই খাঁচায় তাদেরকে বন্দী করে দেয়া হবে। জাহান্নামীদের দৈহিক আকৃতি এমন বিশাল করে দেয়া হবে যে, তাদের একেকটি দাঁতের আকার হবে ওহোদ পাহাড়ের সমান বৃহৎ। মদীনার ওহোদ পাহাড়টি প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ। সেই খাঁচার সঙ্গে জাহান্নামীদের দেহের প্রতিটি রগ ফিরিশতারা আগুনের পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়ে খাঁচার ফাঁকফোকরগুলো আগুনের কয়লা দিয়ে ভরে দিবেন। তারপর সেই খাঁচা বন্ধ করে দিয়ে তাতে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের গহীন গভীরে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। এ বিষয়টিই কোরআন এভাবে প্রকাশ করেছে—

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل .

তাদের জন্য উপর ও নীচ থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে।

হাশরে মানুষের দু'টি দল

মোটকথা, হাশর মানুষকে দু'টি দলে বিভক্ত করে দিবে। এক দল জান্নাতে যাবে। তাদের চেহারা থাকবে হাস্যোজ্জল, ঝলমলে। তারা জান্নাতের দরজায় উপস্থিত হওয়ার পর ফিরিশতাগণ তাদেরকে ইস্তেকবাল জানিয়ে বলবেন—

سلام عليكم طبتم فادخلوها خلدين .

www.almodina.com

তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। দলে দলে ফিরিশতারা এসে তাদেরকে সালাম জানাবে। এই আনন্দ-উচ্ছাস শেষ না হতেই হঠাৎ আল্লাহ্ পাকের আরশের দরজা খুলে যাবে এবং স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলবেন—

سلام قولا من رب الرحيم

হে আমার বান্দারা! তোমাদের রব স্বয়ং তোমাদেরকে সালাম বলছেন, তোমরা সালাম গ্রহণ করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের সকলের সঙ্গে আল্লাহ্ পাক সরাসরি কথা বলবেন। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সেই আনন্দঘন মুহূর্তটি কতই না সুখকর হবে!

হযরত আইয়ুব (আ.) ক্রমাগত আঠার বছর পর্যন্ত কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। এমন কঠিন ব্যাধি আর কারো হয়েছে কি না সন্দেহ। অবশ্য হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ব্যাধি সম্পর্কে অনেকে একটু বাড়াবাড়ি করে বলেছে যে, তাঁর দেহে কীড়া হয়ে গিয়েছিলো। দেহে কীড়া হওয়ার মত নিকৃষ্ট অবস্থায় কোন নবীকে অবশ্য আল্লাহ্ পাক পতিত করেন না। তবে ব্যাধি খুব কঠিন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গোটা দেহ ব্যাথায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। একসময় আল্লাহ্ পাক তাঁকে সুস্থতা দান করেন। সুস্থতা লাভের পর একদিন কোন এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি অসুস্থতার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে ? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, অসুস্থতার দিনগুলো আজকের এই সুস্থতা থেকে অনেক ভাল ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, সে কেমন ? তিনি বললেন, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তখন আল্লাহ্ পাক প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে আইয়ুব (আ.)! আপনি কেমন আছেন? আল্লাহ্ পাকের সেই আওয়াজ যখন আমার কানে পৌঁছাত, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যেত। সেই আওয়াজ আমার গোটা সত্ত্বায় সারাদিন অনুরণিত হতে থাকতো। সেই আবেশ কাটতে না কাটতেই আবার আওয়াজ আসতো—হে আইয়ুব (আ.)! আপনার কি অবস্থা?

এবার ভেবে দেখুন, যখন আরশের দরজা খুলে যাবে এবং মানুষ নিজ চোখে আল্লাহ্ পাককে দেখতে থাকবে। তাছাড়া তখন কারো কোন অসুস্থতা বা রোগ-ব্যাধিও থাকবে না, বরং সেখানে যৌবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকবে পরিপূর্ণ মাত্রায়—সে অবস্থায় যখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, কেমন আছো ? সেই জিজ্ঞাসার আনন্দ যে কত গভীর ও ব্যাপক হবে, তা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়!

www.almodina.com

সরল পথের পথিক

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আখেরাতের সুখ ও দুঃখের এ দু'টি জীবন সম্পূর্ণই দুনিয়ার জীবনের উপর নির্ভরশীল। ইসলাম জীবনের ঐ পথ যে পথ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে গোটা পৃথিবীর সকল মানুষকেই হেদায়ত দান করতে পারতেন। ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها আমি ইচ্ছা করলে সকলকে সঠিক পথের দিশা দিতাম।—*সূরা সজদা-১২ /* কিন্তু তিনি এভাবে সকলকে হিদায়ত দান করেন নি। শুধু হেদায়ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। فا لهمها فجورها وتقواها মানুষকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।—*সূরা আশ্ শাম্স-৮ /* وهديناه النجدين আমি মানুষকে দু'টি পথের সন্ধান দিয়েছি।—*সূরা বালাদ-১০ /* فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, আর যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক।—*সূরা কাহাফ-২৯ /* সুতরাং মানুষের সঠিক বা মন্দ পথে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রতিটি কাজ যথার্থরূপে অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

হেদায়তের এই পথ অবলম্বন করার জন্য এমন কোন ফর্মুলা নেই, যে সে ফর্মুলা কার্যকর করার ফলে সকলে অনায়াসে ইসলাম ও জান্নাতের পথে চলতে আরম্ভ করবে। যদি থাকত, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কষ্ট স্বীকার করে মানুষে দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতেন না এবং তাদের হাতে-পায়ে ধরে এত অনুরোধ-উপরোধও করতেন না। আসলে ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষকে শিখে অর্জন করতে হয়। ডাক্তারির কথা বলুন, ব্যবসা-বানিজ্যের কথা বলুন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়া যেমন এগুলো আয়ত্ব করা সম্ভব নয়, ইসলামও ঠিক তেমনি শিখেই অর্জন করতে হয়।

আপনারা যদি আমাকে বলেন যে, মৌলুবী সাহেব! আপনি একজন ব্যবসায়ী হয়ে যান। তাহলে শুধু আপনাদের এই বলার দ্বারাই আমি ব্যবসায়ী হয়ে যাব—এটা অসম্ভব। কারণ গোটা জীবন যেখানে তবলীগের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি, ব্যবসার সঙ্গে যার ক্ষীণতম সম্পর্ক নেই, তার পক্ষে শুধু আপনাদের বলা দ্বারা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আমার সামনে এই যে যুবকরা বসে আছে, আমি যদি তাদেরকে বলি যে, আগামি কাল তোমরা সকলে ডাক্তার হয়ে যাবে, নাহলে শক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। অথবা যদি বলি, এক কোটি টাকা দেব, আগামি কাল ডাক্তার হয়ে যেও। কিংবা তাদের হাতে-পায়ে ধরে আগামি

কাল ডাক্তার হবার জন্য যতই মিনতি করি না কেন, তাদের পক্ষে কোনভাবেই আগামি কাল ডাক্তার হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ, এটা এমন একটি বিষয়, যার সম্পর্ক প্রশিক্ষণের সঙ্গে। তা কোনভাবেই জোড়-জবরদস্তি, প্রলোভন বা অনুরোধ-উপরোধ দিয়ে হয় না।

কেউ যদি আম বাগানে চাড়া গাছ রোপন করে পরদিনই গাছের কাছে গিয়ে বলে, আমের বাজার বেশ চড়া, আমাকে চট করে কিছু ফল দিয়ে দাও। আপনারাই বলুন, তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি ? আমের সেই চাড়াটিকে যতই হুমকি-ধমকি দেয়া হোক না কেন, তাতে আম ফলবে না কোনক্রমেই। বরং সেই চাড়া থেকে আম পেতে হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত তাকে যত্ন করতে হবে। তারপর বলার প্রয়োজন হবে না, তখন বেড়ে ওঠা বৃক্ষ আপনিই ফল দিবে।

আমি কোন ছেলেকে ডাক্তার হয়ে যেতে বললেই সে ডাক্তার হয়ে যেতে পারবে না। এর জন্য তাকে পড়াশোনা করতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তবেই যেয়ে তাকে আমরা ডাক্তার হিসাবে দেখতে পাবো। পাঁচ-ছয় বছর দোকানের পরিবেশে থাকার পরই একটা মানুষ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠতে পারে। দু'-চার বছর চাষবাসের কাজে লেগে না থাকলে কারো পক্ষে কৃষিকর্মে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠা অসম্ভব।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের নীতি হল—তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যতিরেকে এখানে কারো পক্ষেই কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামের মত একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শুধু মৌখিক ঘোষণা করে দিলেই মানুষ তা গ্রহণ করে নিবে এবং সে অনুযায়ী নিজের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবন পরিচালিত করবে—এমনটি ভাবা অনুচিত। এজন্য বরং পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আসবাব গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

দুনিয়া 'দারুল আস্‌বাব'। এখানে বিভিন্ন উপায়-উপকরণের সাহায্যেই মানুষের জীবন নির্বাহিত হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে সংঘটিত বিভিন্ন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও 'আস্‌বাব'-এর সহযোগিতায় কার্য-সম্পাদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের সময় তাঁকে বাইতুল্লাহ্ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য সওয়ারী প্রেরণ করা হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে যখন আসমানের দিকে যাত্রা করেন। তখন হযরত জিবরায়ীল (আ.)

তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছেন, এবং সাত আসমান অতিক্রম করে তাঁকে 'সিদরাতুল মুন্তাহায়' পৌঁছে দিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে এত লম্বা পাড়ি যিনি দিতে পারলেন, তার পক্ষে নবীজীকে বায়তুল্লাহ্ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে দেয়া কি সম্ভব ছিল না ? অবশ্যই ছিল। কিন্তু আসবাবের দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক সাধারণত উপায়-উপকরণের সাহায্যেই কার্য সম্পাদন করে থাকেন। কাজেই এখানে তিনি নবীজীর জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছেন।

আর আখেরাত যেহেতু আসবাবের জগত নয়, বরং সেখানে সব কিছুই চলে আল্লাহ্ পাকের কুদরতে। তাই সেখানে সওয়ারী বিহনে তাঁর সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিরাজ শেষে তিনি যখন দুনিয়ায় ফিরে আসলেন, তাঁকে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করানো হয়। বুরাক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় সেখানে অবস্থান করছিলো। তিনি বুরাকের পিঠে আরোহণ করে মক্কায় ফিরে আসেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনাটিও নিতান্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য-বর্জিত একজন সাধারণ মানুষের মতই হয়েছিল। রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি এক জন-বিরল পথে মদীনার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। শত্রুর ভয়ে পর্বত-কন্দরে আত্মগোপন করেছেন। অথচ আল্লাহ্ পাক চাইলেই হযরত জিবরায়ীল (আ.) এসে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে মদীনায় রেখে আসতে পারতেন। কিন্তু তা করা হয় নি। আসবাবের দুনিয়ায় আল্লাহ্ পাক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিটি পদক্ষেপে আসবাবের সহযোগিতাতেই চালিয়েছেন।

তরবিয়তের প্রতিক্রিয়া

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! এসকল ঘটনা দিয়ে আল্লাহ্ পাক গোটা মানব জাতিকে এ শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে, দ্বীন একটি জীবনপদ্ধতি। ইসলাম জীবনের একটি পরিপূর্ণ তরীকা। এটা শুধু নির্দেশ দিয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এটা শিখে অর্জন করতে হয়। দ্বীন অর্জন করার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

হযরত হাবীব ইবনে ওমায়ের (রহ.) রোমানদের হাতে বন্দী হওয়ার পর রোম সর্দার তাকে বললেন, তুমি যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নাও তাহলে তোমাকে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব দান করবো। তিনি বললেন, যদি পূর্ণ রাজত্বও দান করো, তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না। ফলে রোম সর্দার হযরত হাবীব

ইবনে ওমায়ের (রহ.)-কে একটি গৃহে বন্দী করে তাঁকে বিপথগামী করার জন্য নিজের কন্যাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত রাজকন্যা নিজের রূপ-যৌবন দিয়ে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে গেল। কিন্তু এই তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত হযরত হাবীবের চোখের পাতা ঊর্ধ্বমুখী হলো না। চোখ তুলে এক বারের জন্যও তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন না।

তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা কোথায় পেলেন তিনি ? এটা দ্বীন শিখার ফল। যেহেতু আমাদের তরবিয়ত হয় নি, দৃষ্টিকে নিম্নমুখী রাখার শিক্ষা আমরা পাই নি, তাই আমাদের দৃষ্টি অবাধ্য হয়ে বার বার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। আপনারাই বলুন, একদিকে রোমের আগুনঝরা সৌন্দর্য, অন্যদিকে আরব-মরুর উদ্যাম যৌবন। এই দু'জনের নির্জনতার মাঝে তৃতীয় কোন বাঁধাও নেই। তারপরও কোন্ শক্তিবলে তিনি দ্যুতিময় চরিত্রের অধিকারী হয়ে রইলেন ?

একবার জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নযোগে শয়তানের সাক্ষাত পেয়ে তাকে বললেন, তোমার কোন গোপন বিষয়ে আমাকে অবহিত কর। জবাবে শয়তান বলল, কখনোই কোন বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে বসবেন না। নারী যদি রাবেয়া বসরীর মতও হয়, আর পুরুষ যদি জুনায়েদ বুগদাদী (রহ.)-এর মতও হয়, যদি তারা নির্জনে একত্রিত হয়, তাহলে তাদেরকে গোমরাহ্ করার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে যাই।

অথচ এদিকে তিনদিন তিনরাত অতিবাহিত হয়ে গেল, গোমরাহ করবে তো দূরের কথা হযরত হাবীবের চোখ দু'টি একবারের জন্য উপরের দিকে উঠাতেও সক্ষম হলো না। অবশেষে রাজকুমারী ক্লান্ত হয়ে বলতে লাগলো, তুমি পাথর না লোহার তৈরী বলতো ? আমার কোন কৌশলই যে তোমাকে কাবু করতে পারলো না! আমার প্রতি আশক্তি প্রকাশে কে তোমায় বাঁধা দিয়ে রেখেছে ? জবাবে তিনি বললেন, আমার রবই আমাকে বাঁধা দিয়ে রেখেছেন। তিনি আমাকে দেখছেন। সে লজ্জা-ই আমাকে অপকর্ম থেকে বিরত রেখেছে।

শিক্ষা গ্রহণের প্রধান বিষয়

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! তাবলীগ উপরোক্ত তরবিয়তেরই মেহনত। এটা কোন ভিন্ন দল বা মতবাদ নয়। কোন ফেরকা বা আন্দোলনও নয়। এ তরবিয়ত গ্রহণ করার পূর্বে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের উপর ওঠে আসা সম্ভব হয় না। এ মেহনতের মাধ্যমে যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মর্মবাণী মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করবে,

তখন আল্লাহ্‌র মহান যাত থেকে সব কিছু হওয়া ও কোন মাখলুক থেকে কিছু না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও আখেরাতের স্থায়িত্বের বিষয়টিও প্রকাশ হয়ে পড়বে। একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মহান যাতই যে সমস্ত কুদরতের মালিক, আর আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছাড়া সমস্ত মাখলুকই যে শক্তিহীন, এই বিশ্বাসের নূর গোটা হৃদয়কে আলোকিত করে তুলবে। তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমেই কালিমার এই বাণী মানুষের হৃদয়ে দৃঢ়তা লাভ করবে এবং মানুষের হৃদয়কে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করে তুলবে।

আমাদের হাতকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে।

যবানকে মিথ্যা থেকে হেফাযত করবে।

হারাম থেকে আমাদের চক্ষুকে অবনমিত রাখবে।

হারাম কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে আমাদের পদযুগল বেঁধে রাখবে।

হারাম খাদ্য গ্রহণ করা থেকে আমাদের পেটকে রক্ষা করবে।

তাবলীগ সেই তরবিয়তেরই মেহনত। মানুষের ঈমান যাতে এমন একটা স্তরে উপনীত হয়, যেখান থেকে শুধু মহান রাব্বুল আলামীনের আযমত, হাইবত, জালাল ও জাবারুত ; তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই নজরে আসতে থাকে— এটাই তাবলীগের মেহনত। এই মেহনত ছাড়া কালিমা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করলেও সেখানে দৃঢ়তা লাভ করতে সক্ষম হয় না।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ পাক আমাদের কাছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর আদর্শপুষ্ট একটা জীবন কামনা করেন। অর্থাৎ, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর ঈমান গ্রহণ করার পর আমাদের প্রধান কর্তব্য হল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা। সেটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ্ পাক বলছেন, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপর ওঠে আস। তাঁর পবিত্র সীরাতকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ কর। আল্লাহ্ পাকের নিকট মানুষের ধন ও দারিদ্র্যতা, বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি মোটেও বিবেচ্য বিষয় নয়। তাঁর নিকট একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হল 'তরীকায়ে মুহাম্মদী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যাঁকে আল্লাহ্ পাক মানবিক সকল গুণাবলীর ক্ষেত্রে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সব চেয়ে পরিপূর্ণ ও সব চেয়ে সম্মানি করেছেন—তাঁর আদর্শের অনুসরণ করা।

মোটকথা, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, হে আমার বান্দারা! সব কিছুরই উৎস একমাত্র আমি। তাই আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চল। আমি দিলেই তোমরা পাবে। আর যা দেব না, কোনভাবেই তা তোমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। তোমাদের যা প্রয়োজন আমার কাছ থেকেই নিতে

www.almodina.com

হবে। কাজেই, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকাকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে নাও। এ তরীকাই জলে-স্থলে সর্বত্র তোমাদের কামিয়াবীর একমাত্র উপায়। এ পথই দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের কামিয়াবীর রাস্তা। কালো-সাদা, ধনি-দরিদ্র সকলের জন্য সফলতা লাভের একমাত্র উপায়।

আমার কাছে একমাত্র 'তরীকায়ে মুহাম্মদী'-ই গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় আর কোন মত ও পথই আমার নিকট গ্রহনযোগ্য নয়।

একারণেই আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যে, সমস্ত আরবী অভিধানের যাবতীয় শব্দ-ভান্ডার প্রয়োগ করেও তাঁর গুণরাশীর যথার্থ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) ও নবীজী (দ.)-এর সৌন্দর্য

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে মিশরের নারীরা আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেদের হাতে ছুরি চালিয়ে দিয়েছিলো। আর আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলে একেবারে নিজেদের বুকেই ছুরি চালিয়ে দিত।

হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, আকাশে চোদ্দ তারিখের উজ্জ্বল চাঁদ দিপ্যমান ছিল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাল-পাড় চাদর গায়ে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমি একবার আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে দেখছিলাম, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখপানে চেয়ে দেখছিলাম। সত্যি বলতে কি, আকাশের চাঁদের চেয়ে নবীজীর পবিত্র মুখের আলোই অধিক উজ্জ্বল ছিল।

মোটকথা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান প্রকাশের যথার্থ কোন শব্দই নেই। কিন্তু যেহেতু শব্দই ভাব প্রকাশের মাধ্যম, তাই পূর্ণাঙ্গ না হলেও, যতদূর সম্ভব শব্দ দিয়েই তা প্রকাশ করতে হয়। মানুষের মধ্যে যখন আল্লাহ্ পাকের আযমতের অনুভুতি সৃষ্টি হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযমতের অনুভুতি দিয়ে তার হৃদয় ভরে ওঠবে, তখন হৃদয়ের তাগিদেই সে নবীজীর সুন্নত অনুসরণ করে চলবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলায়

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাত্র দশ বছরের বালক। আবু তালেব তাঁকে সঙ্গে করে সিরিয়া অভিমুখে চলেছেন বানিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাদের

যাত্রা পথে ছিল বুহায়রা নামক এক পাদ্রির আস্তানা। পাদ্রি কাফেলাটি দেখতে পেয়ে আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করল, এ কাফেলার সরদার কে? আবু তালেব বললেন, আমি। পাদ্রি বললেন, আগামীকাল আপনাদের সকলের দাওয়াত। আবু তালেব অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপার কি? ইতিপূর্বে তো কখনো আপনি এমনটি করেন নি!

যাহোক, পরদিন গোটা কাফেলা দাওয়াতে এসে উপস্থিত হল। সবাই এসে গাছের ছায়ায় বসলো। পাদ্রী একে একে সকলকে পর্যবেক্ষণ করলেন, কিন্তু যাঁকে তিনি খুঁজছেন, উপস্থিত লোকদের মাঝে তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সকলেই কি উপস্থিত হয়েছেন, না কেউ বাকী আছে? তারা বললেন, এক বালক রয়ে গেছে। সে উট চড়াতে গিয়েছে। পাদ্রী বললেন, সে বালকের বরকতেই তো আপনাদেরকে দাওয়াত করেছি। না হলে আপনাদের সঙ্গে দাওয়াত করার মত এমন কি পরিচয় আমার রয়েছে?

বালক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনতে এক লোক ছুটে গেল। নবীজী যখন এসে উপস্থিত হলেন, গাছের ছায়ায় তখন আর কোন জায়গা অবশিষ্ট ছিল না। ছায়া দখল করে সকলে বসে আছে। ফলে নবীজী রৌদ্রের মধ্যেই বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের একটি শাখা ঝুঁকে এসে নবীজীকে ছায়া দান করতে লাগল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো মাত্র দশ বছরের বালক। কিন্তু ঐ অবুঝ বৃক্ষ নবীজীকে চিনতে পেরেছিল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা

শীতের রাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। দেখতে পেলেন, হযরত আলী (রাযি.) বাহিরে পেরেশান অবস্থায় পায়চারি করছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আলী! কি হয়েছে তোমার ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় আর বসে থাকা যাচ্ছে না। তখন নবীজীও বললেন, আমারও সেই একই অবস্থা। ক্ষুধার তীব্রতার কারণে ঘরে বসে থাকতে পারছি না। তাই বের হয়ে এলাম। তারা উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন, কয়েকজন সাহাবা বসে আছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ? তোমরা বসে আছ কেন ? জবাবে তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ক্ষুধার যাতনায় ঘরে বসে থাকা যাচ্ছিল না। তাই আমরা ভাবলাম, বাইরে গিয়ে গল্প-গুজবে রাতটা কাটিয়ে দেই। তাদের কথা শোনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, যাও আলী, ঐ খেজুর বৃক্ষের নিকট গিয়ে বল, আল্লাহ্‌র রাসূল খেজুর দিতে বলেছেন। খেজুরের মউসুম হলো গ্রীষ্মকাল। অথচ তখন ছিল শীত কাল। হযরত আলী (রাযি.) সেসব কিছুই ভাবলেন না, জিজ্ঞাসাও করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কীভাবে সম্ভব ? তিনি দৌড়ে চলে গেলেন। বৃক্ষের কাছে গিয়ে বললেন, ايها النخلة ওহে খর্জুর বৃক্ষ! আল্লাহ্‌র নবী তাজা খেজুর দিতে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে, বৃক্ষ থেকে টপাটপ করে তাজা খেজুর ঝড়ে পড়তে লাগলো।

যার নবুওয়াতকে নিষ্প্রাণ বৃক্ষ আর নির্বোধ পশুপাখী বিশ্বাস করতো, যার নবুওয়াত সম্পর্কে হিংস্র-নিরিহ, সাপ-বিচ্ছু সকলেরই জানা ছিল, তাঁর আদর্শকে বর্জন করে মানুষ কিভাবে ইয্যত-সম্মানের আশা করতে পারে ? বিশেষত যখন সকল ইয্যত-সম্মান মহান রাব্বুল আলামীনের হাতে, আর সেই ইয্যত-সম্মান লাভের একমাত্র উপায় হল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। সমস্ত বরকত আল্লাহ্ পাকের হাতে, আর তা লাভ করার রাস্তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। সকল কৌলিন্য আল্লাহ্ পাকের হাতে, আর তা লাভ করার রাস্তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। শুধু তাই নয়, বরং জান্নাতের চাবিটিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবজায়। নবীজী বলেন, مفاتيح الجنة بيدى জান্নাতের চাবির গোছা আমার হাতে। জাহান্নাম থেকে বাঁচার, জান্নাত লাভ করার, অপমান থেকে বাঁচার, সম্মান লাভ করার, দরিদ্রতা থেকে বাঁচার ও ধন লাভ করার একমাত্র পথ হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক আদর্শ।

রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন,

ওহোদ যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু-নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে আহত হওয়ার পর সঙ্গীদের অনেকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের জন্য বদ-দু'আ করুন'। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, بعثت رحمة ولم ابعث لعنة আমি উম্মতের জন্য রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছি, বদ-দু'আ করার জন্য নয়। শত্রু-নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাত খেয়েও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বদ-দু'আ করার পরিবর্তে বললেন, اللهم اهدى قومى فانهم لايعلمون আয় আল্লাহ্! আমার কওম অবুঝ। তাদেরকে মাফ করে দিন এবং হেদায়ত দান করুন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সেই মহান নবীর

আদব শিক্ষা দিয়ে বলেছেন—لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তোমরা জোড়ে কথা বলো না। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন— لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমরা নাম নিয়ে ডেকো না। কাজেই মনে রাখবেন, 'ইয়া মুহাম্মদ' বললে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেআদবী করা হয়।

নবীজী (স.)-এর দশটি নাম

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশটি নাম রেখেছেন। এত নাম কেন ? কাউকে ডাকার জন্য একটি নামই তো যথেষ্ট। না হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আহমাদ নামটিও চলত। দশটি নামের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল না। দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে ইমাম আবু নায়ীম ইসফাহানী (রহ.) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—ان لى عند ربى عشرة اسماء আমার রব আমার দশটি নাম রেখেছেন। 'মুহাম্মদ, আহ্মদ, হামী, হাশির, 'আকিব, ফাতিহ্, খাতিম, আবুল কাসিম, ত্বহা ও ইয়াসীন'। এই দশটি নাম রাখার রহস্য কী ? যার সঙ্গে ভালবাসা যত গভীর, মানুষ তাকে তত অধিক নামে ডেকে থাকে। ঘরে ঘরে মায়েরা তাদের ছোট্ট শিশুকে আদর করে কতনা নামে ডেকে থাকে। আমার বেলাল, আমার চাঁদ, আমার সুরুজ, আমার কলিজা, আমার প্রাণ, আমার চোখের মনি, আমার লাড্ডু, আমার বরফী—নামের শেষ নেই। এর কারণ—মার হৃদয়ে তার আদরের সন্তানের জন্য ভালবাসার এমন প্রবল প্রবাহ থাকে যে, শুধু একটি নাম দিয়ে সেই প্রবাহের তীব্রতাকে প্রতিহত করা যায় না। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝুন—কারো মাথায় যখন রাগ চড়ে যায়, তখন মাত্র একটি গালি দিয়ে সে থেমে যায় না ; বরং সে 'গালির তসবীহ' পড়তে থাকে। এটা কেন হয় ? কারণ, তার রাগের তীব্রতা মাত্র একটি গালিতে হজম হয় না। ফলে গালির প্রবাহ চলতে থাকে এবং গালাগালি করতে করতে একসময় ধীরে ধীরে রাগ কমে আসে। ঠিক এভাবেই ভালবাসার তীব্রতার প্রকাশ শুধু আব্দুর রহমান, আকরাম, আসলাম আর আজমল দিয়ে পুরণ হয় না। যার ফলে মার কাছে সন্তান কখনো লাড্ডু, কখনো বরফী কখনো জিলাপী, কখনো চন্দ্র কখনো সূর্য হতে থাকে।

তেমনি আল্লাহ্ পাকের যে মহব্বত রয়েছে তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, তা শুধু একটি নাম দিয়ে প্রকাশ হয় না। ফলে তিনি—

কখনো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
কখনো আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
কখনো হামী।
কখনো হাশির।
কখনো 'আকিব।
কখনো ফাতিহ্।
কখনো খাতিম।
কখনো আবুল কাসিম।
কখনো ত্বহা।
কখনো ইয়াসীন।

মহান রাব্বুল আলামীন যাঁকে এত ভালবাসেন, আমরা যদি তাঁকে ভাল না বাসি, তাহলে ইয্যত কীভাবে আশা করতে পারি ? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, কোন বিষয়ে দাবী করলে সে বিষয়ে প্রমাণও পেশ করতে হয়। প্রমাণ ছাড়া আদালতও আপনার কোন দাবী মেনে নিবে না। কাজেই মহব্বতের দাবীর পক্ষেও প্রমাণ প্রয়োজন। সে প্রমাণ হল 'ইতা'আত বা আনুগত্য। দাবী করা হবে মহব্বতের আর কাজ করা হবে নাফরমানীর, এটা হতেই পারে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের দাবী তখনই যথার্থ হবে, যখন ইত্তেবায়ে সুন্নতও যথাযথভাবে হবে। দাবী করা হবে মহব্বতের আর ব্যবসা-বানিজ্য ও বিয়ে-শাদি হবে তাঁর আদর্শ-বহির্ভূত তরীকায়, এটা কীভাবে সম্ভব ? সমাজ রক্ষা ও লোকজনকে খুশী করতে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নারাজ করবেন, এটা তো কোনভাবেই মহব্বতের পরিচয় হল না।

নবীজী (দ.)-এর এক আশিক

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রাযি.) ক্ষেতে কাজ করছিলেন। তাঁর ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললেন, আব্বাজান! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন। এই মর্মান্তিক সংবাদটি শোনে তাঁর মাথায় যেন গোটা আকাশটাই ভেঙ্গে পড়ল। হাতের বস্তুটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, আয় আল্লাহ্! আপনি আমার এই চোখ দু'টি দিয়েছিলেন আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য। আজ তাঁকে যখন আপনি নিয়েই গেলেন, তখন আমার এই চোখ দু'টি নিস্প্রয়োজন। আমি আর কাউকে দেখতে চাই না। আমাকে অন্ধ করে দিন। ফলে সেখানেই তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন।

নবীজীর 'ফাতিহ' ও 'খাতিম' তথা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ হওয়ার রহস্য

আল্লাহ্ পাক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ফাতিহ'ও বলেছেন, আবার 'খাতিম'ও বলেছেন। অর্থাৎ, তিনি সর্বপ্রথমও এবং সর্বশেষও। কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রথম যেমন কখনো শেষ হতে পারে না, তেমনি শেষও কখনো প্রথম হতে পারে না। তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম ও শেষ বলার রহস্য কি ? তিরমিযী শরীফের একটি রেওয়ায়েত দ্বারা এই রহস্যের কিনারা হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কবে নবুওয়াত লাভ করেছেন ? এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, নবুওয়াত লাভ করার সময় আপনার বয়স কত ছিল ? প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর তো ছিল—আমার বয়স তখন চল্লিশ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গারে হিরায় অবস্থান করছিলাম। দিনটি ছিল রমযান মাসের সতেরো তারিখ। হঠাৎ আমার কাছে একজন ফিরিশতা এসে বললেন, اقراء। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিকে না গিয়ে বললেন, كنت نبيا و آدم بين الروح والجسد আদম (আ.) অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই আমি নবুওয়াত লাভ করেছি। কাজেই তাঁর 'ফাতিহ' নামের যথার্থতা প্রমাণ হল। আর দুনিয়াতে তাঁর আগমন যেহেতু সকলের পরে হয়েছে, তাই তিনি 'খাতিম' তথা সর্বশেষ নবীও বটে। সৃষ্টি সবার আগে আর দুনিয়ায় আগমন সবার পরে। একই অস্তিত্বে 'ফাতিহ' ও 'খাতিম' গুণের অভিনব সমাবেশ।

ইত্তেবায়ে রাসূলের বরকত

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমি এপর্যন্ত শুধু لا اله الا الله محمد رسول الله - এর কথাই আলোচনা করেছি। আমাদের তাবলীগ এই কালিমাকে ভিত্তি করেই। আজ আমাদের নিকট শুধু 'তাওহীদে আকলী' রয়েছে। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি হয়তো তাওহীদ স্বীকার করে। কিন্তু সে তাওহীদ হৃদয়ে রেখাপাত করতে সক্ষম হয় নি। তাওহীদকে হৃদয়ে প্রোথিত করতে হবে। আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্বকে হৃদয় দিয়ে স্বীকার করতে হবে।

একবার মুসলমানরা খৃষ্টানদের 'হামস' দুর্গ অবরোধ করে। সেই অবরোধকারী দলের দলপতি ছিলেন হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জার্রাহ্ (রাযি.)। পাদ্রীরা খৃষ্টানদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধী করার পরামর্শ দিয়ে

বলল, এরা আখেরী নবীর লোক। এদের সঙ্গে লড়াই করা বৃথা। জবাবে খৃষ্টানদের যুবক সেনারা বলল, না, তা হতে পারে না। আমরা ইরানীদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে এসেছি, আর এই আরবরা তো কোন্ ছার। ফলে হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে দুর্গ অবরোধ করতেই হলো। তিনি নিজের সেনাদের বললেন, আমি তাকবীর দেয়ার পর তোমরা সকলে ওজু করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তারপর তিনি যখন নগর-প্রাচীরের নিকটবর্তী হয়ে তাকবীর বললেন, সঙ্গে সঙ্গে গোটা শহরে কম্পন সৃষ্টি হল। তিনি আবার 'আল্লাহু আক্‌বার' বললেন। এবার গোটা দুর্গের বিভিন্ন স্থানে দেয়াল ফেটে ভেঙ্গে পড়লো। পাদ্রীরা এবার খৃষ্টান সেনাদের বলল, আমরা তো পূর্বেই বলেছিলাম যে, এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেও না। তাদের এক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতেই নগর-প্রাচীর ফেটে টুকরো টুকরো হয়েছে, আর যদি তরবারি বের করে উঁচিয়ে ধরে, তাহলে না জানি কি অবস্থা হবে!

সেই 'আল্লাহু আক্‌বার' এখন আমরাও বলি। তাঁদের 'আল্লাহু আকবার' দুর্গ-প্রাচীর ধ্বসিয়ে দিয়েছিলো। আর আমাদের তাকবীর আমাদের যবান থেকে মিথ্যাকেই হটাতে সক্ষম হয় না। দৃষ্টি থেকে নির্লজ্জতা হটাতে পারে না। কান থেকে গান শোনার স্পৃহাকে দূর করতে পারে না। হাতকে যুলম থেকে বিরত রাখতে পারে না। দোকান থেকে খেয়ানত বের করে দিতে পারে না। তাই বুঝা যায় যে, আমাদের তাওহীদ শুধু বিবেক-প্রসূত, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত নয়।

মহব্বত আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! তাবলীগের মেহনত হল, যাতে সকল মুসলমান আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার অনুসারী হয়ে যায়। সকলেই যাতে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে আমি আরো একটি কথা সংযুক্ত করেছি যে, তরবিয়ত ছাড়া সে অবস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। এবং সে প্রেক্ষিতে আমি কয়েকটি উদাহরণও পেশ করেছি। ইসলামের এই বিপর্যস্ত পরিবেশে যদি বলা হয়, ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গিয়েছে। এদেশের সকলকেই কাল মুত্তাকী-পরহেযগার হয়ে যেতে হবে। তাহলে বিষয়টি এমনই দাঁড়াবে যে, আমি সকলকে বললাম, আপনারা সকলেই কাল ডাক্তার হয়ে যাবেন। তারপর ঘোষণা করে দেয়া হল যে, এই নগরবাসী সকলেই যেহেতু ডাক্তার, তাই এখানে আর কোন ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। তো এবার আপনারাই বলুন, আমার এই

ঘোষনার ফলে কি সকলে ডাক্তার হয়ে যাবে ? এই বিষয়টি যেমন ন্যূনতম বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী ; তেমনি কোন প্রশিক্ষণ ও মেহনত ছাড়া শুধু মৌখিক ঘোষণার ফলে মানুষের মুত্তাকী হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও একটি চরম বুদ্ধি-বর্জিত বিষয়। একজন মানুষ মুত্তাকী হয়ে ওঠার জন্য প্রথমে আল্লাহ্ ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত দিয়ে হৃদয় পরিপূর্ণ করতে হয়। তারপর সে ব্যক্তি হৃদয়ের তাগিদেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতসমূহ খুঁজে খুঁজে আমলে ব্রতী হয়।

আমি একবার তাবলীগী সফরে আমেরিকার শিকাগো গিয়েছিলাম। সেখানে এক মসজিদে গেলাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, মসজিদের ভিতর একটি তাবু খাঁটানো রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলাম যে, অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় গুন্ডা প্রকৃতির লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে তিন চিল্লার সফরে পাকিস্তান গিয়েছিলো। সফর থেকে ফিরে এসে সে এই তাবুর ব্যবস্থা করেছে। প্রতিদিন এসে সে এই তাবুতে কিছু সময় বসে থাকে। এ বিষয়ে তার অভিমত হল—আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুতে বসবাস করেছেন। আমার পক্ষে তো ভিন্নভাবে এ ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তাই দিনে অন্তত দু'এক ঘন্টা সময় এভাবে কাটিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নতটিও পালন করতে চাই।

বিশ্বাস করুন, এ কথা শোনে এই ভেবে আমার খুব লজ্জা হল যে, একজন নও মুসলিম, কিন্তু তার হৃদয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত এমন তীব্রতা লাভ করেছে যে, ছোট্ট একটি তাবু খাঁটিয়ে নবীজীর সুন্নত আদায়ের উদ্যোগ নিয়েছে। লোকটি নিজের নাম পর্যন্ত আবু বকর রেখেছিল।

তার হৃদয়ে এত ভালবাসা কীভাবে এল ? সন্দেহ নেই যে, এটা তরবিয়তের ফল। তাবলীগের নামে আজ গোটা দুনিয়ায় এরই মেহনত চলছে। তারা চেষ্টা করছে যাতে আমাদের জীবনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার পরিপূর্ণ অনুসরণ এসে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে তারই তরবিয়ত দিয়েছেন, হাত ধরে শিখিয়েছেন এবং কখনো কখনো ইমতেহান গ্রহণ করেছেন।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর আযমত

একবার হযরত ফাতেমা (রাযি.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঘরে অনাহার চলছে।

ফিরিশতাদের তো তসবীহ পাঠ করেই ক্ষুধা নিবারিত হয়। আমাদেরকে ক্ষুধা নিবারণের কোন একটা পদ্ধতি বাতলে দিন। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রিয় কন্যা! তুমি এমন পেরেশান হচ্ছ কেন ? তোমার ঘরে তো তিনদিন যাবৎ অনাহার চলছে, আর তোমার পিতার গৃহে যে আজ এক মাস যাবৎ চুলায় আগুন জ্বলে নি! আমার কাছে কিছু ছাগল আছে। তুমি চাইলে সেখান থেকে পাঁচটি নিয়ে যেতে পার। অথবা তুমি চাইলে এটাও হতে পারে যে, আমি তোমাকে পাঁচটি দু'আ শিখিয়ে দিব। এখন বল, তুমি কোনটি গ্রহণ করবে ? এই ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা পদ্ধতি। তিনি কন্যা ফাতেমাকে এত গভীর স্নেহ করতেন যে, কোন সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত শেষ করে একেবারে সবার শেষে হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিতেন। আবার যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তারপর নিজ গৃহে আসতেন।

হযরত ফাতেমা (রাযি.) সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, ফাতেমা আমার হৃদয়ের অংশ। যে তাঁকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে তাঁকে সন্তুষ্ট করল, সে যেন আমাকেই সন্তুষ্ট করল।

শেষ বিদায়ের কিছু পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযি.)-কে আখেরাতে তাঁর সঙ্গে সবার আগে মিলিত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যু-পীড়ায় কাতর, তখন হযরত ফাতেমা (রাযি.) পিতার কষ্ট দেখে অস্থির হয়ে ওঠেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাছে ডেকে তাঁর মুখের কাছে কান নিয়ে আসতে বললেন। তারপর কন্যার কানে কানে কিছু বললেন। ফলে হযরত ফাতেমা (রাযি.) ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কানে কানে পুনরায় কিছু একটা বললেন। ফলে তিনি হেসে ওঠলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ওঠে যাওয়ার পর আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি বলতো ? হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, না, এখন বলবো না। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) পুনরায় তাঁকে সেই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, আমি যখন আব্বাজানের অসুস্থতার কারণে অস্থির

হয়ে ওঠেছিলাম, তখন তিনি আমার কানে কানে বললেন, বেটি! পেরেশান হবার কিছু নেই, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। একথা শোনে আমি কান্না সম্বরণ করতে পারলাম না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আমার কানে কানে বললেন, বেটি! কেঁদো না। সবার আগে তুমিই আমার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে। এই সংবাদে আমি আনন্দিত হয়ে ওঠলাম। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ছয় মাস পর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযি.)-ও পিতার সঙ্গী হলেন।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-কে প্রদত্ত পাঁচটি দু'আ

যেই কন্যার সঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন মহব্বতের সম্পর্ক ছিল, তিনি যখন অনাহারের অভিযোগ নিয়ে পিতার নিকট উপস্থিত হলেন, তিনি তাঁকে বললেন, বল, পাঁচটি বকরি দেব, না পাঁচটি দু'আ শিখিয়ে দিব।

হযরত ফাতেমা (রাযি.) যদি বলতেন, আমাকে বকরি এবং দু'আ উভয়টিই দান করুন, তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেমন কি আর আসত যেত। কিন্তু সাইয়্যেদাতুন্‌নেসা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুচি ও চাহিদা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আব্বা তাঁর নিকট কুরবানী চাচ্ছেন। তাই বললেন, আমি বকরি চাই না, আপনি আমাকে পাঁচটি দু'আই শিখিয়ে দিন। এই জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথেষ্ট আনন্দিত হলেন এবং কন্যাকে পাঁচটি দু'আ শিখিয়ে দিলেন। দু'আগুলি এই—

يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ ، يَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ ، يَا ذَى الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ ، يَا رَحِيْمَ الْمَسَاكِيْنِ ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

দু'আ নিয়ে হযরত ফাতেমা (রাযি.) বাড়ী ফিরে গেলেন। সেখানে হযরত আলী (রাযি.) অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা তাঁর পিতার নিকট থেকে কিছু নিয়ে আসবেন এবং তা দিয়ে তারা ক্ষুধা নিবারণ করবেন। কিন্তু হযরত ফাতেমা (রাযি.)-কে শূন্য হাতে ফিরে আসতে দেখে তিনি বললেন, ব্যাপার কি, কিছু নিয়ে আসো নি ? জবাবে হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, ذهبت للدنيا و جئت بالاخرة আমি দুনিয়ার জন্য গিয়েছিলাম, কিন্তু আখেরাত নিয়ে ফিরে এসেছি। হযরত আলী (রাযি.) বললেন, তোমাকে মোবারকবাদ! আজকের দিনটি তোমার জীবনের সবচেয়ে সফল দিন।

হযরত আলী (রাযি.)-এর পরীক্ষা

হযরত আলী (রাযি.) ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা এবং তাঁর পৌত্রদ্বয়ের পিতা। এই পৌত্রদ্বয় তাঁর এমনই প্রিয় ছিলেন যে, তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এরা আমার চোখের শীতলতা'। তাদের সামান্য কষ্ট-যাতনা বা ক্ষুৎ-পিপাসা তিনি নিজেও অনুভব করতেন। সেই পরিবারটিকেই তিনি এক মহা পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। হযরত আলী (রাযি.)-কে একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা প্রসঙ্গে বললেন, বল, তোমাকে পাঁচ হাজার বকরী দেব না পাঁচটি দু'আ শিখিয়ে দিব। হযরত ফাতেমা (রাযি.)-কে তো মাত্র পাঁচটি বকরি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। এখানে একেবারে পাঁচ হাজার। পরীক্ষা হাজার গুণ কঠিন। হযরত আলী (রাযি.) যদি আমাদের মত সরস রাজনীতিক বা বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন হতেন, তাহলে নিশ্চয় বলতেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দ্বীন-দুনিয়া একই সঙ্গে আছে। আমাকে উভয়টিই দান করুন। ভাই বলেন, জামাতা বলেন, আপনার সঙ্গে আমার উভয় সম্পর্কই রয়েছে। সর্বোপরি আমি আপনার পরিবারেরই একজন। আপনার তো জানাই আছে যে, ফাতেমা ও হাসান-হোসাইন কত কষ্টে আছে। ঠিক আছে, এত না হোক, অন্ততঃ দু'এক শ' বকরি দিন আর কিছু দু'আও শিখিয়ে দিন। দুনিয়া-আখেরাত সবই হোক। কিন্তু তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেজাজ বুঝতে পারলেন। তাই এমন অনুরোধ করার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবলেন না।

তিনি বরং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পাঁচ হাজার বকরি নিশ্চয়ই অনেক সম্পদ। কিন্তু আপনি আমাকে শুধু পাঁচটি দু'আই দান করুন। আমি আর কিছু চাই না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরীক্ষায় কন্যা যেমন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এবার জামাতাও উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, শোন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَ طَيِّبْ لِىْ كَسْبِىْ وَ وَسِّعْ لِىْ خُلُقِىْ وَ قَنِّعْنِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ وَ لَا تَذْهَبْ قَلْبِىْ اِلٰى شَىْءٍ صَرَفْتَهٗ عَنِّىْ

আয় আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ মাফ করে দিন। আমাকে হালাল রিযিক দান করুন। আমার আখলাক সুন্দর ও উদার করে দিন। আমাকে যা রিযিক দান করেছেন, তাতে সন্তুষ্টি দান করুন এবং আমাকে যা দান করেন নি, সেদিক থেকে আমার হৃদয়কে ফিরিয়ে রাখুন।

এই দু'আটি একবার পাঠ করলে পাঁচ হাজার বকরির চেয়েও অধিক সম্পদের অধিকারী হয়ে গেলেন। পাঁচবার পাঠ করলে পঁচিশ হাজার বকরি, দশবার পাঠ করলে পঞ্চাশ হাজার, এভাবে যত ইচ্ছা পড়তে থাকুন আর নিজের সম্পদ বাড়াতে থাকুন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এসব ঘটনা বলে আমি একটি কথাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, ইসলাম তরবিয়ত ও শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া হয় না। শুধু হুকুম জারি করে মানুষের হৃদয়ে আবেগ উৎসারিত করা যায় না। এর জন্য মেহনত প্রয়োজন।

তাবলীগ একটি তরবিয়তী মেহনত

তাবলীগ দ্বীনের একটি তরবিয়তী মেহনত। আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহকামকে নিজের মধ্যে অর্জন করার জন্যই চার মাস, এক চিল্লার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় বের হতে হয়।

ঈমানের পরই ইবাদতের স্থান। সর্বপ্রধান ইবাদত হল নামায। তাবলীগের মেহনত হল, যাতে গোটা উম্মত নামাযওয়ালা হয়ে যায়। তাবলীগ মাসায়েল বা মাসালেকের (মতাদর্শ) দাওয়াত দেয় না। কারণ এতে মহব্বতের বদলে, পরস্পরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন বুনিয়াদী বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেয়া হবে, তাতে ঐক্য ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে। আজ মানুষের আখলাকে এতটা ধৈর্য, দৃঢ়তা ও ভদ্রতা নেই যে, মতাদর্শের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক ঐক্য ও মহব্বত বহাল থাকবে।

কাজেই মাসায়েলের বর্ণনায় পরস্পরের সঙ্গে শুধু বিভেদই সৃষ্টি হবে, বন্ধুত্ব বা সৌহার্দ্য নয়। এমনিতেই তো আমরা পরস্পরের প্রতি কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি করে, একে অন্যকে ভ্রান্ত, কাফের, ফাসেক বলে বলে বিভেদের পাহাড় তুলে রেখেছি। আমি তো বলি, আজ দুনিয়াতে মুসলমান কেউ আছে কি না সন্দেহ। কারণ, মুসলমান একে অন্যের দৃষ্টিতে সকলেই কাফের। হায়রে... নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত আজ কোন পথে চলেছে!

আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! তাবলীগের কাজকে কোন বিশেষ দলের কর্মসূচী মনে করা উচিত নয়। এটা গোটা মুসলিম সমাজেরই কাজ। দুনিয়াতে ছোট-বড় কোন কাজই না শিখে অর্জন করা যায় না। শুধু মুসলমানের ঘরে জন্ম হলেই ইসলাম শিখা যায় না। এর জন্য সময় ব্যয় করতে হয়, মেহনত করতে হয় এবং দ্বীন শিখে তা লোকের মাঝে প্রচার করতে হয়। এটাই আমাদের দায়িত্ব।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও এক বৃদ্ধ

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এক বৃদ্ধকে চার মাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হতে বললেন। জবাবে বৃদ্ধ বলল, আমি তো কালিমাই জানি না, চার মাসের জন্য কী বের হবো ? মাওলানা সাহেব তখন বললেন, ঠিক আছে, বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে অন্তত লোকদেরকে এ কথা বলো যে, আমার জীবনের সত্তরটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথচ আমি কালিমাই শিখি নাই। তোমরা এমন ভুল করো না। লোকটির নাম ছিল 'মওজুদ মীরাসী'। আল্লাহর রাস্তায় সে এমন মেহনত করলো যে, তার হাতে আঠারো হাজার লোক তওবা করে নামাযী হয়েছিল।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! গোটা দুনিয়ায় সফরের নিয়ত করে চার চার মাসের জন্য বের হয়ে দ্বীন শিখুন। তারপর সে মেহনত নিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুন। দুনিয়াতে কোন কাজই মেহনত ছাড়া হাসিল হয় না। আল্লাহর দ্বীনও মেহনত ছাড়া হাসিল হবে না। এই উম্মত যখন ঘর ছেড়েছিল, তখন গোটা দুনিয়ায় দ্বীন ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন আপন পরিবেশকে বিদায় জানিয়ে দিকে দিকে ছুটে গিয়েছিল, তখন গোটা জগতে দ্বীনের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছিল। গোটা মানব জাতি যাতে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের উপর এসে যায় সে যিম্মাদারী প্রতিটি উম্মতের। যারা ঘরের আরামে বসে থাকবে, আর যারা দ্বীনের মেহনত নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে, কাল কেয়ামতের দিন এই উভয় দলের সম্মান ও সাফল্য কোনভাবেই বরাবর হবে না।

দায়ী'-র মর্যাদা

জান্নাতে হঠাৎ চারিদিক আলো করে একটি নূর চমকে উঠবে। সেই আলোর ঝলকানি দেখে নিচের স্তরের জান্নাতীরা বলবে, আয় আল্লাহ্! এ কিসের আলো? ফিরিশতারা বলবেন, জান্নাতুল ফিরদাউসের এক অধিবাসীর নূর। সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার চেহারার আলোতেই গোটা জান্নাত আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। তখন নিচের স্তরের জান্নাতীরা নিবেদন করবে, আয় আল্লাহ্! তাকে এই মর্যাদা কী কারণে দান করা হয়েছে ? আল্লাহ্ পাক বলবেন, তোমরা ঘরে বসে আরাম করেছ, আর এ ব্যক্তি আমার রাস্তায় মেহনত করেছে। তোমরা তার সমান মর্যাদা কী করে লাভ করতে পার ?

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

এ কাজ শুধু চার মাস বা এক চিল্লার নয়। এ কাজ গোটা জীবনের।

চারমাস বা এক চিল্লা তো শুধু কাজ শিখার জন্য। আপনারা আজই ইরাদা করুন এবং দ্বীনের জন্য বেরিয়ে পড়ুন। ঘরের কথা ভুলে গিয়ে দ্বীনের মেহনত করতে থাকুন। তারপর দেখুন, আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় দ্বীন জিন্দা হয় কি না।

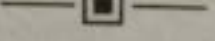

কামিয়াবীর পথ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباى الاء ربكما تكذبان .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم يا قوم اطلبوا الجنة واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها ألا وإن الآخرة محففة اليوم بالمكاره وإن الدنيا محففة بالشهوات او كما قال صلى الله عليه وسلم .

কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি এই নিখিল বিশ্বের কোন জিনিসই নিজে নিজে সৃষ্টি বা শেষ হয় না। বরং খোদ আল্লাহ্ পাক নিজ ইচ্ছাতে সৃষ্টি করেন এবং যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়ে রাখেন বা বিদ্যমান রাখেন। আবার যখন ইচ্ছা হয় মৃত্যু দান করেন বা ধ্বংস করে দেন। আর এই সবকিছুর যিনি স্রষ্টা সেই মহান আল্লাহ্ পাকের কোন শেষ নেই, শুরু নেই, মৃত্যু নেই, বিনাশ নেই। একমাত্র আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর সকল ব্যক্তি ও বস্তুর জন্যই মৃত্যু ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন—

كل شيئ هالك الا وجهه .

একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মহান যাত ছাড়া আর সকল বস্তুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রতিনিয়তই অসংখ্য মানুষ মৃত্যু-মুখে পতিত হচ্ছে। এটাও ধ্বংসের একটা রূপ। আরেকটি ধ্বংস রয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃর্ণ আকারে। সেদিন জগতের সকল বস্তুরই বিনাশ ঘটবে। সে ভয়াবহ ধ্বংসজজ্ঞের খণ্ডচিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে

বিবৃত হয়েছে। সেদিনটি হবে মানুষের কল্পনারও অতীত এক ভয়াবহ সংকটময় দিন। সেদিন এমন প্রচণ্ড ও ভয়াবহ শব্দ হবে যে মানুষের কানের পর্দা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, কলিজা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সেই দিনটির আগমন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই কারো মৃত্যু যেন গাফলতের নিদ্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় না হয়। আল্লাহ্ পাক মানবজাতিকে সেদিনটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, هل اتك حديث الغاشية 'হে বান্দারা! সে দিনটির সংবাদ কি তোমাদের কাছে পৌঁছেছে, যে দিনটি তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।' কেয়ামতের ভয়াবহতার বিবরণ দিয়ে কোরআনে আরো বলেছেন—সেদিন প্রচণ্ড ভূকম্পনে যমীন ওলট-পালট হয়ে তার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল প্রাকৃতিক সম্পদ উগড়ে দিবে। আসমান ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। সূর্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে। নক্ষত্র মলিন হয়ে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশাল বিশাল পাহাড়গুলো বালুকণায় পরিণত হবে। সমুদ্রের জলরাশিতে আগুণ জ্বলে ওঠবে। এভাবেই আল্লাহ্ পাক কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে কেয়ামতের ভয়াবহতার বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন হযরত আযরায়ীল (আ.) একই সময়ে সমস্ত জীন ও ইনসানের প্রাণ সংহারে খুবই ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করবেন।

দিন শেষে ক্লান্ত সূর্য এখনও যেমন পশ্চিম দিগন্তে সুপ্তির অতলে হারিয়ে যায়, সেদিনও এর ব্যতিক্রম হবে না। দিনের কর্মক্লান্ত মানুষ একটি সতেজ প্রভাতের অপেক্ষায় নিজেদেরকে নিদ্রার কোলে সঁপে দিবে। পাখিরা আপন কুলায় ফিরে যাবে। দোকানদার গোটা দিনের কর্মক্লান্তি নিয়ে আপন গৃহে ফিরে কর্মব্যস্ত আগামীর অপেক্ষায় বিছানায় দেহ এলিয়ে দিবে। গোটা পৃথিবীই আগামী সকালের অপেক্ষায় নিদ্রার কোলে হারিয়ে যাবে। তারপর রাত্রির অবসানে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উঁকি দিবে। পৃথিবীতে আবার আলো ছড়িয়ে পড়বে। প্রভাত-সমীরণ মৃদুমন্দ বয়ে চলবে। বনবাঁদার থেকে পশু-পাখীরা বেরিয়ে আসবে। লোকজন প্রতিদিনের মতই আপন আপন কর্মক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হবে। কেউ কল-কারখানায়, কেউ খেত-খামারে, কেউ দোকান-মকানে, কেউ বিয়ে-শাদিতে, কেউ নাচের আসরে, কেউ মদ্যশালায়। দোকানী পসরা সাজিয়ে বসবে। কেউ কেচি হাতে কাপড় কাটতে থাকবে। খরিদদার পকেট থেকে টাকা বের করবে। কিষাণ ক্ষেতে হাল চষতে থাকবে। কেউ বিজ ছিটাতে থাকবে। মা তার শিশু-সন্তানটিকে বুকে চেঁপে দুধ পান করাতে থাকবে। কেউ তার সন্তানের মুখে খাদ্য তুলে দিবে। কেউ সন্তানকে স্কুলের জন্য তৈরী করে দিবে। মোটকথা, দুনিয়ার স্বাভাবিক কর্মব্যস্ত আর দশটি দিনের মত সেদিনটিও মানুষ

ও প্রাণীজগতের কলরোলে কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠবে। জগত আরো একটি কর্মব্যস্ত দিবসের পথে যাত্রা শুরু করবে।

হঠাৎ কম্পন শুরু হবে। প্রচণ্ড শব্দে সবকিছু ফেটে চৌচির হতে থাকবে। যে মা তার শিশু-সন্তানকে বুকে চেপে ধরে দুধ দিচ্ছিল, ময়লা বোঝাই টুকরির মত তাকে ছুড়ে ফেলে দিবে। হাতের লোকমাটি খসে পড়বে। দোকানদারের কেচি থেমে যাবে। ক্রেতার হাতটি পকেটেই স্থির হয়ে যাবে। কৃষকের হাল ভেঙ্গে পড়বে। কেউ এদিকে কেউ ওদিকে, একেকজন একেক দিকে প্রাণভয়ে ছুটাছুটি শুরু করবে। বিয়ের আসর ছেড়ে বর-কনে দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকবে। আগত অতিথিরা প্রাণভয়ে পালাতে থাকবে। ঢোলীর ঢোল পড়ে থাকবে। আসর শূন্য হয়ে পড়বে। মোটকথা, গোটা প্রাণীজগত দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করবে। আল্লাহ্ পাক বলেন—

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

অর্থ ঃ যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদায়িনী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল ; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আযাব সুকঠিন। —*সূরা হজ্জ - ২*

সেদিনটি এমনই ভয়াবহ হবে যে, স্তন্য পানরত বাচ্চাকে মা ছুড়ে ফেলে দিবে। নিজের প্রাণ বাঁচাবার চিন্তাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠবে। ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। এমন ক্ষণভঙ্গুর ও অস্থায়ী জগতের পিছনে যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে বরবাদ করে দেয়, তাকে চরম বোকা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? যে যুবক তার প্রাণোচ্ছল যৌবনকে দুনিয়ার হাসি-তামাসায় উড়িয়ে দেয়, সে মূর্খ ছাড়া আর কি? দুনিয়ার মেকি চমকের পিছনে ঈমান বিকিয়ে দেবার মত নির্বুদ্ধিতা আর কি আছে? এর চেয়ে ঠকের বেচাকেনা আর হয় না।

আল্লাহ্ পাক দুনিয়া সম্পর্কে আরো বলেন—

دار الغرور , متاع قليل ، كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ، لعب و لهو و زينة و تفاخر بينك و تكاثر فى الاموال والاولاد -

দুনিয়ার খালিক ও মালিক দুনিয়া সম্পর্কে কি বলছেন শুনুন—যে জিনিসের জন্য তোমরা মিথ্যা শপথ করছো, পরস্পরকে হত্যা করছো, ঈমান ও ইয্যত বিকিয়ে দিচ্ছো, ওয়াদা ভঙ্গ করছো, শিষ্টাচার ত্যাগ করছো, তা কেমন বস্তু সে সম্পর্কে তোমাদের কি জানা আছে? তা অতি তুচ্ছ একটি মাছির পর আর নিতান্ত ধোঁকার ঘর ছাড়া কিছুই নয়। এ দুনিয়া মাকড়সার জালের মতই ক্ষণভঙ্গুর, মায়া মরিচিকা, মুসাফিরখানা ও খেলাঘর। একদিন এ দুনিয়া চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই যমীন ফেটে যাবে।

আসমান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

কোন মানুষ তথা প্রাণী মাত্রই কিছু আর জীবিত থাকবে না।

ফেরেশতারাও সকলে মরে যাবে।

তারপর আল্লাহ্ পাক হযরত জিবরায়ীল ও মীকায়ীল (আ.)-কে মরে যেতে বলবেন। নির্দেশ শুনে আল্লাহ্ পাকের আরশ কেঁপে ওঠবে। সুপারিশ করে বলবে, আয় আল্লাহ্! আপনি এদেরকেও মৃত্যু দান করবেন ? আল্লাহ্ পাক তাকে ধমক দিয়ে বলবেন, চুপ কর। আজ আমার আরশের নীচে কেউই বেঁচে থাকবে না।

সুতরাং হযরত জীবরায়ীল (আ.)ও মারা যাবেন।

হযরত মীকায়ীল (আ.)ও মারা যাবেন।

হযরত ইসরাফীল (আ.)ও মারা যাবেন।

এবং আরশের সকল ফিরিশতারাও মারা যাবেন।

তারপর অবশিষ্ট থাকবেন শুধুমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন, আর নীচে হযরত আযরায়ীল (আ.)। আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, আর কৈ জীবিত রয়েছে? কেউ জীবিত আছে কি নেই, তা কি আল্লাহ্ পাক জানেন না ? জানেন অবশ্যই। কিন্তু নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রকাশের জন্য জিজ্ঞাসা করবেন, আর কে আছে জীবিত? তখন হযরত আয্রায়ীল (আ.) বলবেন, আয় আল্লাহ্! উপরে আপনার মহান যাত আর নীচে আপনার এই অনুগত গোলাম ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। আল্লাহ্ পাক বলবেন, তুমি আমার এক সামান্য মাখলুক মাত্র, যাকে আমি আমার এক হুকুম দ্বারা সৃষ্টি করেছি। আজ তুমিও মৃত্যু বরণ কর। এই নির্দেশ শোনার পর হযরত আযরায়ীল (আ.) এমন বিকট এক চিৎকার দিয়ে ওঠবেন যে, তখন যদি পৃথিবীর প্রাণীকুল জীবিত থাকতো, তাহলে সেই প্রচণ্ড ও বিকট শব্দে তাদের কলিজা ফেটে যেত। হযরত আযরায়ীল (আ.)-এর মৃত্যুর পর যখন গোটা সৃষ্টি জগতে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মহান অস্তিত্ব ছাড়া আর কেউ জীবিত থাকবে না, তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমার

কোন অংশীদার থেকে থাকলে সামনে আস। আছো কি আমার মোকাবিলা করার মত কেউ, সামনে আস। একবার, দু'বার, তিন বার তিনি এই ঘোষণা দিবেন। তারপর তিনি বলবেন, এই গোটা জগৎ আমারই সৃষ্টি ছিলো এবং আমিই তাকে ধ্বংস করেছি। আবার আমিই তাকে পুনর্গঠন করবো। এই জগতের প্রথম সৃষ্টি আর পুনর্গঠন সবই আমার কাছে সমান। কোনটাই আমার কাছে কঠিন নয়। আল্লাহ্ পাক বলেন—

أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

بلى وهو الخلاق العليم ۞

যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? হাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা। *—সূরা ইয়াসীন - ৮১*

মানুষ এমনই বোকা যে, আজ তারা নামায ছেড়ে দিয়ে, মিথ্যা বলে, যিনা ও অপকর্ম করে, মদ্য পান করে, সুদ খেয়ে, বেপর্দা হয়ে এবং মনচাহী জীবনের অনুসরণ করে সেই মহান রবের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। যেন কোনদিনই তাঁর কাছে যেতে হবে না। মৃত্যু যেন তাদের জন্য নয়। তাদের জানাযা যেন কোনদিনই কবরের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে না। কবরের অন্ধকার যেন কোনদিন তাদেরকে গ্রাস করবে না। তাদের যৌবন যেন কখনো বার্ধক্যের পথে হারিয়ে যাবে না। তাদের এই ধন-সম্পদ চিরদিনই যেন তাদের কাছেই থেকে যাবে। কালামে পাকে বর্ণিত হয়েছে—

ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى

ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ۞

অর্থ ঃ সে বলল, আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। *—সূরা কাহ্ফ - ৩৫-৩৬*

বিত্তবান মানুষের এই অহংকার শুধু আজকের নয়, কোরআন বলছে, তাদের এই ঔদ্ধত্বপূর্ণ প্রকৃতি হাজার হাজার বছরের পুরনো। যার হাতেই অর্থ-সম্পদ আসে, সে বলে, আমার এই সম্পদ কখনো শেষ হবার নয়। আমার এই কল-কারখানা, দোকান-পাট কোনদিনও বিলীন হয়ে যাবে না। আমার এই টাকা-পয়সা, বিত্ত-বৈভব চিরদিন আমার কাছেই থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক

যখন তার ঘাড় চেঁপে ধরেন, তার পায়ের তলার মাটি যখন সরে যেতে থাকে, যখন মাথার উপর বিপদের আকাশ ভেঙ্গে পরে, চারিদিক থেকে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসে, তখন আল্লাহ্ আল্লাহ্ জপ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তখন সময় পার হয়ে যাওয়ার পর জপ-তপে কোন কাজ হয় না।

প্রকৃত রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকের

অতঃপর আল্লাহ্ পাক যমীনকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে বলবেন انا الملك আমিই রাজাধিরাজ। তারপর দ্বিতীয় ঝাঁকি দিয়ে বলবেন انا القدوس السلام المؤمن। আমি পবিত্র এবং শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা। তারপর তৃতীয় ঝাঁকি দিয়ে বলবেন, انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر আমিই আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত ও মহাশ্যশীল। اين الملوك কোথায় রাজা-বাদশারা ? ডাকো তাদের। اين الجبارون والمتكبرون সেই অহংকারী তাগুদের দল কোথায় ? ডাকো তাদের। لمن الملك اليوم আজ রাজত্ব কার ? কেউ কি জবাব দেবার নেই ? لله الواحد القهار পরে আল্লাহ্ পাকই বলবেন, আজ রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকের।

মৃত্যুর পর পুণর্জন্ম

এ হল কেয়ামতের প্রথম পর্ব। তারপর আরম্ভ হবে দ্বিতীয় পর্ব। আল্লাহ্ পাক বলেন—

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة.

যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর হিসাবে। তাকে তিনি মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। তাতে কোন মোড় বা টিলা দেখতে পাবেন না। এপাশ থেকে ওপাশ, গোটা পৃথিবীই থাকবে সমতল। সেদিন তাতে কোন পাহাড়, উপত্যকা বা অসমতল উঁচু-নিচুতা থাকবে না।

তারপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সেখানে উপস্থিত হবেন। আরম্ভ হবে কেয়ামতের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথমে তিনি ফিরিশতাদিগকে জীবন দান করবেন। হযরত ইসরাফীল, হযরত জিবরায়ীল, হযরত মীকায়ীল (আ.) পুনর্জীবন লাভ করবেন। হযরত ইসরাফীল (আ.) হাতে সিঙ্গা ধারণ করে থাকবেন। বিধ্বস্ত যমীনের উপর একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হবে। দুনিয়াতে বৃষ্টির ফলে যেমন উষর জমিতে ঘাস গজিয়ে ওঠে, কাল কেয়ামতের দিন বৃষ্টি হওয়ার

পর তেমনি মানুষের হাড়-মাংসগুলো একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ গ্রহণ করে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে থাকবে। ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه। মৃত মানুষের হাড়-মাংস ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর আর কখনো তা পুনর্গঠিত হবে না এবং মৃত মানুষ আর কখনো প্রাণ ফিরে পাবে না— এ-ই কি তোমাদের ধারণা ? তোমাদের এ ধারণা ভুল। আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তোমাদেরকে পুনর্গঠিত ও পুনর্জীবিত করবেন। তোমাদের পূর্ব আকৃতিই তোমাদেরকে এমন নিখুঁতভাবে ফিরিয়ে দেয়া হবে যে, তোমাদের একের আঙ্গুলের গিঠ অন্য কারো হাতে গিয়ে সংযুক্ত হবে না।

বিজ্ঞানের এ যুগে আল্লাহ্ পাকের এ বক্তব্যের সত্যতা অনুধাবণ করা যথেষ্ট সহজ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ আজকাল অপরাধীদের 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' বা আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করে থাকে। পৃথিবী থেকে এপর্যন্ত যত মানুষ অতীত হয়েছে, এবং বর্তমানে যে শত-সহস্র কোটি মানুষ রয়েছে বা ভবিষ্যতে যারা আসবে, তাদের কারো 'ফিঙ্গার প্রিন্ট'-ই অন্য কারো 'ফিঙ্গার প্রিন্ট'-এর সঙ্গে মিলবে না। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, কেন নয় ? তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পুনর্জন্মদানে সক্ষম। এমনকি তোমাদের আঙ্গুলগুলিও নিখুত গঠনে ফিরিয়ে দিবেন। ... মিলিয়ে দেখে নিও।

বাজারে আজ যে খাশিটি জবাই হয়েছে, তা দশটি পরিবারে ভাগ হয়ে গিয়ে শত মানুষের উদরস্ত হয়েছে। চামড়াটি বিক্রি হয়ে প্রসেসিংয়ের পর তা দিয়ে জেকেট তৈরী হয়েছে এবং বিদেশে রপ্তানী হয়ে গিয়েছে। লোম-পশম, শিং-খুর কোন্‌টি কোথায় পড়েছে তার কোন হদিস কেউ রাখে নি। হাড়গুলোর কিছু গিয়েছে কুকুড়ের পেটে, কিছু কাকের ঠোটে। গোশ্‌ত উদরস্ত হয়েছে শতাধিক মানুষের। তার কিছু অংশ মানুষের দেহে পুষ্টি জুগিয়েছে, কিছু বর্জ হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তারপর সেই গোশ্‌ত ভক্ষণকারী শত মানুষ শত কবরে পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশেছে। তাদেরকে পোকামাকড়ে খেয়েছে। সেই পোকা অন্য পোকার খাদ্যে পরিণত হয়েছে। সেগুলো মরে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশেছে। তারপর কবরের মাটি কত ওলটপালট হয়েছে। বাতাস সেই ধুলিকণাগুলো দূরদূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। মানুষের অনু-পরমানুগুলো বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এক বকরি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। দুনিয়াতে প্রতিদিন এমনি কত শত সহস্র বকরি বিলুপ্ত হচ্ছে। মিশে যাচ্ছে মাটির সাথে। তারপর উথাল বাতাসে হারিয়ে যাচ্ছে কোন্ অজানায়। কিন্তু জেনে রাখুন, কাল কেয়ামতে পুনর্জন্মের সময় কোন বকরির বিন্দু পরিমাণ অংশও অন্য

বকরির দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হবে না। একটির চুল অন্য আরেকটির গায়ে গিয়ে গজিয়ে ওঠবে না।

সাবধান! সেই কেয়ামত এমনই ভয়াবহ হবে যে, সেদিন মানুষের পুনর্জন্ম হবে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে, একাকী। আজকের মা সেদিন মা থাকবে না। সন্তানকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবে। আজকের ভাইও সেদিন ভাই থাকবে না, বাপও বাপ থাকবে না, সন্তানও পিতার পরিচয় দিবে না। বন্ধুবান্ধবও সকলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ্ পাক বলেন—

يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه *

সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। —*সূরা আবাসা ৩৪-৩৭*

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

মাত্র পঞ্চাশ বছর সূর্য-তাপ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় ও সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে থাকে। অথচ কাল কেয়ামতের দিন যখন পঞ্চাশ হাজার বছরের জন্য সূর্য মাথার উপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে গলগল করে আগুণ ছড়াতে থাকবে, সেদিনের সেই ভয়াবহ অবস্থার কথাটি কি একবার ভেবে দেখেছেন ? চন্দ্র আমাদের থেকে দু' লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আর সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে যে আগুনের উদ্গীরণ ঘটে তাতে থাকে বারো বিলিয়ন বিষাক্ত হিলিয়াম গ্যাস। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে যে তাপ নিঃসৃত হয় তা পঞ্চাশ কোটি হাইড্রোজেন বোমার সম্মিলিত বিস্ফোরণে উৎপাদিত তাপের সমতুল্য। সেই তাপ সূর্য শত শত কোটি বছর যাবৎ প্রতি সেকেন্ডে উদ্গীরণ করে চলেছে।

সেই তাপ এমনই প্রবল ও প্রচণ্ড হবে যে, গোটা জগত তাতে মুহূর্তে গলে যাবে। এই যে সুন্দর মসজিদ, বড় বড় দালান-কোঠা, কল-কারখানা, বরফ-ঢাকা হিমালয় পাহাড়, সবকিছু বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। কাল কেয়ামতের দিনটি যখন পঞ্চাশ হাজার বছর দীর্ঘ হবে, এবং এই প্রচণ্ড অগ্নিঝরা সূর্য যখন মাথার এক মাইল উপড়ে চলে আসবে, সেদিন কি আপনাদের ছায়ার প্রয়োজন হবে না ? সেদিন তো কারো মাথায় টুপি থাকবে না। না সেলোয়ার-কামিজ, না ওড়না-পাগড়ী। একেবারে নিঃবস্ত্র-দেহ। নগ্ন পায়ে নগ্ন দেহে হাজার হাজার

বছর তপ্ত সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তারপর আরম্ভ হবে আরো ভয়াবহ অবস্থা। আল্লাহ্ পাক উপস্থিত হবেন। ফিরিশতাগণ সমস্ত মানুষকে ঘিরে দাঁড়াবে। জান্নাত-জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। মানুষের ভাল-মন্দ আমল মাপার জন্য দাড়িপাল্লা স্থাপিত হবে। পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। নগ্নপদ-নগ্নদেহ মানুষ সংশয়াকুল ও নিতান্ত অসহায় অবস্থায় হিন ও অপদস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। চোখ নীচু, নিথর, নির্বাক। বলার শক্তি হারিয়ে যাবে, চোখ-মুখ নিমুখী থাকবে। সেই আদিগন্ত বিস্তৃত ময়দানে শুধু মানুষের চলার পদশব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই থাকবে না। দুনিয়ার হোমড়া-চোমড়া, আর স্বঘোষিত সম্মানী ব্যক্তি, সকলেই সেদিন নিতান্ত অপদস্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। আর দুনিয়ার সেই হীন-দরিদ্র দ্বীনদার ব্যক্তিটি ইয্যতের মুকুট মাথায় দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে অবস্থান করবে। সেদিন মানুষকে অর্থ-বিত্ত আর খান্দানী মর্যাদা দিয়ে পরিমাপ করা হবে না। সেদিন মানুষ মাপের মানদণ্ড হবে আমল।

দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! সে দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যই দুনিয়াতে আমাদের আগমন। এখানে আমরা নিতান্ত একজন মুসাফির ছাড়া আর কিছু নই। দুনিয়া মূলতঃ একটি, মুসাফিরখানা বা অস্থায়ী আবাস। একদিন আমাদেরকে এ দুনিয়া ছেড়ে যেতেই হবে। দুনিয়াকে যারা ভালবেসে এর পিছনে ছুটে চলে তাদের চোখে কখনো শান্তির ঘুম আসতে পারে না। দুনিয়া যাদেরকে দংশন করেছে, তারা কখনো শান্তি পায় না। এই বিষধর সাপ, ধোঁকাবাজ ও যাদুকর ডাইনি থেকে আত্মরক্ষা করে চলুন। আল্লাহ্‌র কসম, দুনিয়া সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। সে যদি বিশ্বাসঘাতক না-ই হত, তাহলে আপনাদের নিকট কিভাবে এসে পৌছাল ? কারো ঘর ছেড়েই তো সে আপনার ঘরে এসেছে। আবার একদিন আপনার ঘর ছেড়েও অন্য কারো ঘরে চলে যাবে। কাজেই সতর্ক হোন এবং দুনিয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মুসাফিরের মত জীবনযাপন করুন। মুসাফিরের পথ চলার জন্য যতটুকু সামানা প্রয়োজন তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আমরা বৈরাগ্যের সমর্থন করি না, কিন্তু তাই বলে নফসানিয়াতকেও তো মেনে নিতে পারি না। এই উভয়টিই ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলাম এ দু'টি পথের মাঝামাঝি একটি পথের শিক্ষা দেয়। সে পথটিই আখেরাতের সরল এবং উজ্জ্বল ও আলোকিত পথ।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

এ দুনিয়ার বুকে এমন একটি দিন আসবে যেদিনের ভয়াবহতা

বাচ্চাদেরকেও বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে। সেদিন আল্লাহ্ পাক আত্মপ্রকাশ করবেন। ফিরিশতারাও দলে দলে এসে উপস্থিত হবে। তখন আল্লাহ্ পাক ডেকে বলবেন, ওহে আমার বান্দারা! যেদিন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে শুধু দেখে এসেছি, বলি নি কিছুই।

কে রাতে সজদায় রত থেকেছো তাও যেমন দেখেছি,
তেমনি কে গান-বাদ্যে মত্ত থেকেছো তাও দেখেছি,
রাতে তোমাদের চারিত্রিক সুচিতাও দেখেছি,
তোমাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়াও দেখেছি,

হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা আর হক-বাতেলের কে কোন্ পথে চলেছো আমি সবই দেখেছি। কে কার উপর কতটুকু জুলুম করেছো বা ইনসাফ করেছো, তাও শুধু অবলোকন করেছি, বলি নি কিছুই। আজ বলার সময় এসেছে, প্রস্তুত হয়ে যাও। কি ভেবেছিলে ? এই মহাবিশ্ব আপনি আপনি সৃষ্টি হয়েছে ? তোমাদের দেহে যৌবনের উদ্যামতা আপনি আপনি এসেছে ? অর্থ-সম্পদ নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে উপার্জন করেছিলে ? বড় বাড় বেড়ে গিয়েছিলো তোমাদের। আস, আজ তোমাদের অপকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করা হবে। প্রস্তুত হয়ে যাও সে কঠিন সময়ের জন্য।

তখন এমন এক কঠিন সময় এসে উপস্থিত হবে যে, মানুষ নিজের স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের বিনিময়েও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাইবে এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট আর্তি জানিয়ে বলবে, আয় আল্লাহ্! আমার স্ত্রীকে জাহান্নামে ফেলে দিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। আমার মাকে জাহান্নামে ফেলে দিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। আমার ভাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার বিনিময়ে আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু বলা হবে, নয়, এটা কিছুতেই হবে না। অপরাধের জন্য আজ খোদ অপরাধীই ধৃত হবে। এটা দুনিয়া নয় যে, অপরাধী নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকবে, আর নিরপরাধ ব্যক্তি সাজা ভোগ করবে। দুনিয়ার আদালতের ন্যায় এখানে ভুল বিচার হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এটা আল্লাহ্ পাকের আদালত— فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল)। ফিরিশতারা একেকজন অপরাধীর ঘার ধরে নিয়ে পাল্লার সামনে দাঁড় করিয়ে দিবে। পাল্লার সামনে উপস্থিত হওয়ার পর ভয়ে তাদের দেহে এমন কম্পন সৃষ্টি হবে যে, তারা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ছাগল-ছানা ভূমিষ্ট হওয়ার পর যেভাবে টালমাটাল পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। একবার এদিকে হেলে পড়ে, একবার ওদিকে হেলে পড়ে।

দুনিয়ার বড় বড় সর্দারদের অবস্থাও সেদিন তেমনি টালমাটাল হবে। তাদের পা দু'টি তাদের অপরাধী দেহের ভার বহন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। তাদের এক দিকে থাকবে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখা। অপর দিকে থাকবে জান্নাতের মনমুগ্ধকর দৃশ্য। জাহান্নাম চিৎকার করে বলতে থাকবে هل من مزيد আরো চাই আরো চাই। আল্লাহ্ পাক বলবেন, নিয়ে আস। কারো কন্যাকে, কারো বা পুত্রকে ধরে এনে উপস্থিত করা হবে। তাদের আমলনামা পেশ করা হবে। একদিকে সত্য রাখা হবে, একদিকে রাখা হবে মিথ্যা। একদিকে পাপ একদিকে পুন্য ; একদিকে ভাল একদিকে মন্দ। তাদের সে আমল পরিমাপ করার জন্য বলা হবে। নির্দিষ্ট ফিরিশতাগণ তা পাল্লায় তুলবেন। হাশরের সেই আশ্চর্য পাল্লায় স্বর্ণ-চান্দি বা মানুষের বংশমর্যাদা মাপা হবে না। সে পাল্লায় মানুষের চরিত্রের সুচিতা ও কলুষতা, সত্য-মিথ্যা, ক্রোধ-ক্ষমা ও পাপ-পুণ্য পরিমাপ করা হবে। যদি মন্দের পাল্লা ভারি হয়ে গেল, যদি সেদিন পুণ্যের পাল্লা উঁচু হয়ে গেল, তাহলে অশেষ দুর্গতি তাঁর কপালে জুটলো। হযরত জিবরায়ীল (আ.) তখন ঘোষণা দিয়ে বলবেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তার জীবন-বাজিতে হেরে গিয়েছে।

সতর্ক হোন

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে একটু সচেতন ও সতর্ক হোন। এই ব্যর্থতা দুনিয়ার নির্বাচনের পরাজয় নয়। কারণ, এই ব্যর্থতার ঘোষণার পরই রয়েছে এক কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা। কারো পরাজয় ও ব্যর্থতা ঘোষিত হবার পরই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করবেন—

خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه ۞ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ۞

'একে ধরে গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।' (সূরা হাক্কাহ্-৩০)। সেই শিকলটি মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে পায়ুপথ দিয়ে বের করে আনা হবে এবং গোটা দেহ তা দিয়ে পেঁচিয়ে দেয়া হবে। তারা বলবে, আমাদের উপর দয়া কর। জবাবে ফিরিশতাগণ বলবেন, আল্লাহ্ পাকই যখন তোমাদের উপর দয়া করেন নি, সেখানে আমরা কিভাবে দয়া করবো ? তুমি তোমার জীবন বাজিতে হেরে গিয়েছো। বড়ই হতভাগা তুমি। দুনিয়ার সামান্য সুখের জন্য আখেরাতের পরাজয়কে মেনে নিয়েছিলে।

উম্মতের জন্য বেদনা-বিধুর নবী (স.)

মহান রাব্বুল আলামীন তার গুনাহ্গার ও অবাধ্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য সাতটি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। সেই সাত জাহান্নামের কোন্ স্তরে কে থাকবে, হযরত জিবরায়ীল (আ.)-এর মাধ্যমে এ সংবাদ তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। হযরত জিবরায়ীল (আ.) তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবৃত করলেন। কিন্তু জাহান্নাম নামক স্তরটির প্রসঙ্গে এসে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তাঁকে নীরব হয়ে যেতে দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি নীরব হয়ে গেলেন কেন, বলুন? হযরত জিবরায়ীল (আ.) বললেন, আপনার নিক তা প্রকাশ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলে ফেলুন। তখন হযরত জিবরায়ীল (আ.) বললেন, জাহান্নাম নামক স্তরটিতে আপনার ঐ সকল গুনাহ্গার উম্মতরা থাকবে, যারা তওবা না করেই মৃত্যু বরণ করবে। একথা শোনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুর্ছা গেলেন। তাঁর পবিত্র চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়াতে লাগলো। তারপর তিনদিন পর্যন্ত তিনি শুধু নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন আর ফিরে এসে ঘরের দরজা এঁটে উম্মতের জন্য কাঁদতেন। তাঁর এই অস্থিরতা দেখে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁর খোঁজ নিতে গেলেন। ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। হযরত ওমর (রাযি.)-ও গেলেন পেয়ারা নবীর খোঁজ নিতে। তিনিও ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন না। তারপর এলেন হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.)। সাক্ষাতের অনুমতি তাঁর কপালেও জুটলো না। ফলে তিনি ছুটে গেলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর নিকট। গিয়ে বললেন, বেটি! আজ তোমাকে ছাড়া কাজ হবে না। তিন দিন হল আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবস্থা। আশা করি তুমি গেলে তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দিবেন না।

সংবাদ শুনে হযরত ফাতেমা (রাযি.) অস্থির হয়ে পিতার নিকট ছুটে গেলেন। গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করলেন। আওয়াজ শুনেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যার উপস্থিতি বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। হযরত ফাতেমা (রাযি.) ভিতরে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেই তাঁর চিত্তের অস্থিরতা অনুভব করতে পারলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বাজান! কি হয়েছে আপনার? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে

বললেন, দুঃখের কথা আর কি বলবো মা! জিবরায়ীল (আ.) এসে আমাকে বলেছেন, আমার উম্মতের নাফরমান ও গুনাহ্গার ব্যক্তিরা জাহান্নামে প্রজ্জ্বলিত হবে।

সেদিন পাপিষ্ঠ নারীদিগকে যখন উলঙ্গ অবস্থায় কপালের চুলের গোছা ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তারা নিজেদের এহেন অপদস্থকর অবস্থার জন্য হা-হুতাশ করে চিৎকার করতে থাকবে। হায়! যদি দুনিয়াতে তারা নিজেদের আব্রু রক্ষা করে চলত, তাহলে আজ এহেন লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতির শিকার হতে হতো না।

পাপিষ্ঠ নারীদিগকে তো ফিরিশ্তারা কপালের চুলের গোছা ধরে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু পাপিষ্ঠ পুরুষদেরকে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে? ফিরিশ্তাগণ তাদের মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে এমন জোড়ে টান দিবেন যে, তাদের চোঁয়াল বের হয়ে আসবে। কিন্তু সেদিন যেহেতু আর মৃত্যু থাকবে না, তাই শত যাতনা সত্ত্বেও কারো মৃত্যু হবে না। এইভাবে তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পাপিষ্ঠরা ফিরিশতাদের নিকট করুণা ভিক্ষা করবে। জবাবে তারা বলবেন, অসম্ভব। পৃথিবীতে তোমরা এতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলে যে, ইচ্ছা করলেই তওবা করতে পারতে। কিন্তু ভুলেও তোমরা সে পথে যাও নি।

পুণ্যের প্রতিদান

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! কেয়ামতের ময়দানে আরেক দল লোক থাকবে, যারা হবে সফল মানুষ। যাদের সৎকর্মের পাল্লাটি ভাড়ি হয়ে ঝুঁকে পড়বে। তাদের জন্য ঘোষণা করা হবে—অমুকের পুত্র অমুক বা অমুকের কন্যা অমুক কামিয়াব হয়ে গিয়েছে। তাদের জীবনে আর কখনো ব্যর্থতা আসবে না। এ ঘোষণার সঙ্গেই সঙ্গেই তাদেরকে স্বাগত জানাবার আয়োজন শুরু হয়ে যাবে। অপূর্ব সব ডিজাইনের অলঙ্কারাদি আর সবুজ রেশমের জান্নাতী পোশাক পড়িয়ে তাদেরকে মোহন সাজে সজ্জিত করা হবে। তাদের দেহাবয়ব ও মুখমণ্ডলে আল্লাহ্ পাক নূরের চমক সৃষ্টি করে দিবেন, আর তাদেরকে বলবেন, আমার বান্দারা! তোমাদের এই সাফল্য মোবারক হোক।

বিজয়ের ঘোষণাপ্রাপ্ত লোকেরা তখন আনন্দে জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকবে— هاؤم এসো, এসো, দেখে যাও। লোকজন এসে তার চারপাশে ভির করবে। জিজ্ঞাসা করবে কি হয়েছে? আনন্দে আত্মহারা লোকটি বলবে, اقرأ كتابية এই যে ধর আমার আমালনামা। চেয়ে দেখ, কোন কাটাছেড়া নেই, লাল কালির চিহ্ন নাই। পূর্ণ নম্বর পেয়ে আমি পাশ করেছি। আমি কামিয়াব হয়ে

গিয়েছি। লোকজন তার এই সাফল্যের রহস্য জানতে চাইবে। জবাবে সে বলবে—

انى ظننت انى ملاق حسابية ❁

এই বিচার দিবস সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। দুনিয়ার জীবনে আমি গাফেল হয়ে বসে থাকি নি। নিরবে তার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম।

তারপর উপর থেকে ঘোষণা হবে—আমার বান্দাদেরকে নিয়ে এসো এবং তাদেরকে জান্নাতের বাহন দান কর। তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও এবং জান্নাতের মনোরম আসনে তাদেরকে উপবেশন করাও। সেখানে চারিদিকে নদীনালা জালের ন্যায় বিছিয়ে থেকে মনমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করবে। তাদের হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে ঝুলে থাকবে সুমিষ্ট ফল-ফলাদি।

জান্নাতের ফল

এক গ্রাম্য লোক একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে কি খেজুর থাকবে ? লোকটির প্রশ্নের জবাবে নয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন, জান্নাতের একেকটি খেজুরের বীচি হবে বারো হাত লম্বা। অন্য এক গ্রাম্য লোক জিজ্ঞাসা করেছিলো, জান্নাতে কি আঙ্গুর আছে ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেছেন, আছে। তার একেকটি থোকা কত বড় হবে জান ? একটা দ্রুতগামী কাক ক্রমাগত এক মাস অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত ও বিরতিহীনভাবে, ডানে বায়ে এঁকেবেঁকে নয়, বরং সরল পথে যতদূর উড়ে যেতে পারবে, তত বড় হবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তার একেকটি আঙ্গুরের আকার কত বড় হবে ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা কি কখনো বড় ছাগল জবাই করে তার চামড়া ছাড়িয়েছে ? লোকটি বলল, হাঁ। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তা দিয়ে কি মশক তৈরী করেছে ? লোকটি বলল, হাঁ। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই মশকটি যত বড় হবে, একেকটি আঙ্গুর তত বড় হবে। লোকটি বলল, তাহলে আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য একটি আঙ্গুরই যথেষ্ট। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার গোটা পরিবারের জন্যই তা যথেষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, বরং তোমার গোটা কবিলার লোকদের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

كلوا واشربوا আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমার বান্দারা! মনের আনন্দে

পানাহার কর। তোমাদের সামনে এখন অফুরন্ত আনন্দের সময়। দুনিয়ায় হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছো। সুদ-ঘুস ত্যাগ করেছো। অবৈধ উপার্জন থেকে আত্মরক্ষা করে মোটা কাপড় ও মোটা ভাতে সবর করেছো। আস, আজ তোমাদের জন্য বিবিধ উপাদেয় খাদ্যবস্তু প্রস্তুত রয়েছে। গাছে গাছে পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে। যে পাখীটি ইচ্ছা, খেতে পারো। পাখীরা তোমাদের কাছে ছুটে আসবে। তোমার খাদ্য হবার জন্য তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে। এখন তো আপনাদের ঘরের পোষা মুরগিটি ধরতে গেলে তা ছুটে পালায়। আর সেদিন পাখীরা এসে আপনাদেরকে বলবে, আমাকে ভক্ষণ করুন, আমাকে ভক্ষণ করুন। কার আগে কে আপনার খাদ্য হতে পারবে পাখীরা পরস্পর সেই প্রতিযোগিতা করবে।

এক পাখী এসে বলবে, আল্লাহর ওলী! আমার আর্যি শুনুন। আমি জান্নাতুল ফিরদাউসের ঘাস খেয়েছি। সালসাবিলের পানি পান করেছি। আমার দুই দিক থেকে দুই ধরনের খাদ্য বের হবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার জন্য খাদ্য উপস্থিত করতে পারি। জান্নাতী ব্যক্তি বলবে, উপস্থিত করো। সুতরাং পাখী তার ডানা দু'টি দু' দিকে ছড়িয়ে দিবে। তার একেকটি ডানায় সত্তর হাজার পর থাকবে। বাতাসে তা ঝটপট করে ঝাপটাবে আর প্রতিটি পর থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খাদ্য পড়তে থাকবে। দুনিয়াতে যেহেতু তুমি সুদ-ঘুস ত্যাগ করেছিলে, মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, মাপে কম দেয়া ত্যাগ করেছিলে, তাই আজ মনের আনন্দে খেতে থাকো।

মহান রাব্বুল আলামীনের ইহসান, ইলম ও ইনসাফ মানুষের হালাল ও হারাম আমলকে এক পাল্লায় ওজন করবে, রাতের শরাবী ও তাহাজ্জুদগুযারকে এক পাল্লায় পরিমাপ করবে, এটা কখনোই হতে পারে না। এ অসম্ভব। আল্লাহ্ পাক সেদিন বলবেন, আস আমার অনুগত বান্দারা, এখানে এসে বসো। তারপর তাদের জন্য অভাবনীয় সব সাজসজ্জা ও পানাহারের আয়োজন করতে বলবেন।

দুনিয়াতে যারা শরাব ও হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলো, আজ তারা যত খুশী 'সালসাবিল' পান করতে থাকবে। 'যানজাবীল ও মায়ীন' পান করতে থাকবে। এদের চেয়েও সম্মানিত একটি দল থাকবে। তাদেরকে উপর দিকে দেখা যাবে। সেখানে তাদেরকে ঘীরে শরবতের পিয়ালা হাতে ফিরিশতা ও হুর-গিলমানদের সসব্যস্ত আনাগোনা হতে থাকবে। সাধারণ অতিথিরা যেমন নিজ হাতে উঠিয়ে খেতে হয়, নীচের স্তরের সাধারণ জান্নাতীরা তেমনি নিজ হাতে পান পাত্র উঠিয়ে নিবে। আর উপরের স্তরের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী

জান্নাতীদের জন্য কখনো ফিরিশতারা ট্রে সাজিয়ে নিয়ে আসবে। কখনো হুরের দল পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে আসবে। কখনো স্ত্রীরা, কখনো গেলমান-খাদেমের দল খাদ্য-ব্যঞ্জন পেশ করবে। আর তারা সেখান থেকে উঠিয়ে উঠিয়ে নিয়ে উপভোগ করতে থাকবে। তাদের উপরে আরো একটি স্তর থাকবে। সে স্তরটি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেখানকার সাকী হবেন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাদেরকে বলবেন, আমার বান্দারা! আস, আমার হাত থেকে পান করো। এত সম্মান দেখে তারা হতবাক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ পাক বলবেন, ان هذا كان لك جزاء এটা দুনিয়াতে তোমাদের মেহনতের প্রতিদান। তোমাদের সে মেহনত আমি দেখেছিলাম। ...

রাতে লোকজন যখন নিদ্রা-বিভোর থাকতো, তুমি তখন তোমার রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। লোকজন হাসি-তামাশায় মশগুল থাকতো, আর তুমি তোমার রবের দরবারে কান্নায় আকুল হতে থাকতে। তারা অট্টহাসি করতো, আর তুমি ভয়ে প্রকম্পিত হতে। তারা অহংকারে দাপিয়ে বেড়াতো, আর তুমি বিনয়ে অবনত থাকতে। আমি তোমাদের সবকিছুই দেখেছি। আমি নিজে তোমাকে পরখ করে জেনেছি যে, তুমি একান্তই আমার, আর কারো নও।

কামিয়াবী

মানব নির্মিত এই নগর, তবুও দেখতে কতই না মনোরম। কিন্তু অচিরেই এমন একটি দিন আসবে, যেদিন এই নগর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। অপর দিকে মহান রাব্বুল আলামীন নিজ হাতে জান্নাত নামে একটি নগর সৃষ্টি করেছেন, যার সৌন্দর্য অভাবনীয়। গোটা মানব সমাজের সম্মিলিত কল্পনাশক্তি দিয়েও যার সৌন্দর্যের সামান্য আভাস পাওয়াও অসম্ভব। তার নির্মাণ কাজে দুনিয়ার সিমেন্ট-বালু আর ইট-পাথরের মত তুচ্ছ বস্তু ব্যবহৃত হয় নি। বরং জান্নাত নির্মিত হয়েছে রৌপ্য, যমররদ, ইয়াকুত ও মোতির ইট আর মিশকের গারা দিয়ে। সেখানে ঘাস হবে যাফরান। দুধের নহর প্রবাহিত হতে থাকবে। পানি, মধু ও শরাবের নহর কলকল-ছলছল রবে বয়ে যাবে। সালসাবিল, রহীক, তাসনীম নামক সুস্বাদু শরবতের নহর বইতে থাকবে। তাতে থাকবে মিশকের মিশ্রণ। আরাম-আয়েশের জন্য খাট-পালঙ্ক, কালিন, রেশমি চাদর ইত্যাদির থাকবে অকল্পনীয় রাজকীয় আয়োজন।

উপর স্তরের জান্নাতীদের কথা বাদ দিন, একেবারে নিম্ন স্তরের জান্নাতীদের জন্য যে কালীন বিছানো হবে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত ক্রমাগত হেঁটে গেলেও তা শেষ

হবে না। তাদের জন্য আরাম করে বসার যে মজলিশি আয়োজন থাকবে, দুনিয়ার বড় থেকে বড় রাজা-বাদশারাও তা কল্পনা করতে পারে না। পরিপূর্ণ শরবতের পেয়ালা। হাতের কাছে পরিপক্ক ফলপূর্ণ বৃক্ষশাখা। চারিদিকে বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত নিবিড় সবুজ পরিবেশ। অদূরে কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ রবে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা। খেদমতের জন্য আশপাশে উপস্থিত থাকবে গেলমানের দল আর মোবারকবাদ জানাতে আগত ফিরিশতাগণ। মনোহরণের জন্য অসামান্য রূপের ডালি নিয়ে উপস্থিত থাকবে মৃদু হাস্যরত হুরগণ। মন ও দেহের সৌন্দর্যে তারা এমনই পরিপূর্ণ থাকবে যে, দুনিয়ার কোন জীবিত লোকের সঙ্গে কথা বললে নির্ঘাত সে মারা যেত, আর কোন মৃত মানুষের সাথে কথা হলে সে নিশ্চয়ই পুনঃজীবন লাভ করতো। যাদের দেহে কোন বর্জ্য পদার্থ নেই। নোংরা ও ঘৃন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। যাদের জীবনে বার্ধক্য নেই। যারা কখনো রাগ-বচসা করে না। বিশ্বাসভঙ্গ করে না। যাদের যৌবন চিরস্থায়ী। বার্ধক্য যাদের দেহে কখনো হানা দেবে না। যাদের ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। কোন রোগ-ব্যাধি বা অভাব-অভিযোগ নেই। যাদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। যাদের হায়েয-নেফাস নেই। প্রতি দৃষ্টিতেই যাদের সৌন্দর্য সত্তর গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমাগত চল্লিশ বছর পর্যন্ত যাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও দেখার সাধ মিটবে না। তাদেরকে একবার আলিঙ্গন করলে সত্তর বছর পর্যন্ত সে আলিঙ্গনের আবেশ ছড়িয়ে থাকবে। কারো সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলে হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও সে কথার নেশা শেষ হবে না। এমন সৌন্দর্যের অধিকারিনী স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্ পাক জান্নাতবাসীদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।

দশটি গুণের অধিকারী নারী

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এটা আপনাদের চরম বোকামীই বলতে হবে যে, দুনিয়ার এই ভবঘুরে স্বভাবের বাজারী নারীদের জন্য জান্নাতের সেই পবিত্রা রমণীদের বিকিয়ে দিচ্ছেন। একটু চিন্তা করুন, আপনার সুস্থ বিবেক থেকে একটু পরামর্শ গ্রহণ করুন। দুনিয়ার এই আপাত চাকচিক্য আর রঙঢঙসর্বস্ব নারী ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখুন। আপনার পবিত্রতার ভিত্তিতেই আল্লাহ্ পাক আপনাকে জান্নাত দান করবেন। আপনার জীবন সঙ্গিনী হওয়া উচিত একজন খাঁটি ঈমানদার, নেককার, পতি-ভক্তা ও কোমল স্বভাবের অধিকারী নারী ; যে নারী আল্লাহ্ পাকের দরবারে দু' হাত তুলে কাঁদতে অভ্যস্ত। আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কালামে জান্নাতী নারীদের একটি

চিত্র এঁকে দিয়েছেন—

مسلمات مؤمنات قانتات صادقات صابرات خاشعات متصدقات

صائمات حافظات ذاكرات ❁

মুসলমান, ঈমানদার, অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, বিনীত, দানশীল, রোযা পালনকারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী এবং আল্লাহ্‌র অধিক যিকিরকারী, এই দশটি গুণের অধিকারী নারী।

এরা যখন জান্নাতে আসবে, জান্নাতের হুরদের চেয়েও তাদের সৌন্দর্য হবে সত্তর হাজার গুণ অধিক। تلك الدار الآخرة এটাই সেই জান্নাত, আল্লাহ্ পাক যা সৃষ্টি করে মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য সজ্জিত করে রেখেছেন।

আল্লাহ্ পাকের দীদার

এরপর জান্নাতবাসীদের জন্য রয়েছে এমন এক নেয়ামত যা গোটা জান্নাতের যাবতীয় নেয়ামতকে ম্লান করে দিবে। 'মযীদ' নামক একটি ময়দানে এমন এক সার্বজনীন সমাবেশের আয়োজন করা হবে, যেখানে জান্নাতের সকল অধিবাসীই একত্রিত হবে। অতঃপর মহান রাব্বুল আলামীন সেখানে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর সকল বান্দাকে ধন্য করবেন। তাঁর প্রেমিকদের অতৃপ্ত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করবেন। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দিবেন, আমার বান্দারা! আমার দীদার লাভ করার জন্য তোমরা সমবেত হও। আমার নিকট চাইবার জন্য আস, আমার কাছ থেকে নিবার জন্য আস। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করবে আর আমি তোমাদেরকে দান করবো। আমি তোমাদেরকে দেখবো, তোমরাও আমাকে দেখতে পাবে। সেই সমাবেশে পূর্বাপর সকল মুমিন নারী-পুরুষই উপস্থিত থাকবে। মুমিন জিনদেরও সেখানে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হবে। সমস্ত আম্বিয়াগণও সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

ময়দানে উপস্থিত রাব্বুল আলামীনের সকল অতিথিরা অধির অপেক্ষায় থাকবে। হঠাৎ রাব্বুল আলামীনের আওয়াজ আসবে—আমার বান্দাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন কর। ফলে তাদের সামনে খাদ্য উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ্ পাকের দস্তরখানের সে খাদ্য খেয়ে তাদের কাছে জান্নাতের খাদ্যকে তুচ্ছ মনে হবে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাদের সামনে পানীয় পরিবেশন করতে বলবেন। ফলে পানীয় উপস্থাপিত হবে। আল্লাহ্ পাক ফলফলাদি পরিবেশন করতে বলবেন। তাও পরিবেশিত হবে। এরপর আল্লাহ্ পাক সকল জান্নাতবাসীকে

নতুন পোশাকে সজ্জিত করতে বলবেন। এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলের পোশাক পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সুগন্ধি-চর্চিত করতে বলবেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি বাতাস উঠবে এবং মৃদু-মন্দ প্রবাহে তা সকলের দেহ ও পোশাকে সুগন্ধের প্রলেপ দিয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এক ফিরিশতা ঘোষণা দিয়ে বলবেন—

ওহে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমাদেরকে প্রদত্ত মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিশ্রুতি কি পূরণ হয়েছে ? উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলবে, হাঁ, হয়েছে। ফিরিশতা বলবেন, না, না ; হয় নি। একটি ওয়াদা এখনো পুরণ হতে বাকি আছে। ফিরিশতার কথা শুনে জান্নাতবাসীরা তাদের স্মৃতিপটে সেই অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিটি খুঁজে পেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু সফল হবে না। তারা ভাববে—

পরম প্রার্থীত জান্নাত পেয়ে গিয়েছি।
জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়েছি।
হাশরের কঠিন হিসাব থেকে বেঁচে গিয়েছি।
আল্লাহ্ পাকের কঠিন পাকড়াও থেকে রক্ষা পেয়েছি।
অনন্তকালের বাসস্থানে পৌছে গিয়েছি।
স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতাকে পেয়েছি।
ইয্যত-সম্মান আর আবাদুল আবাদ-এর জীবন লাভ করেছি।

এরপর আর কী প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে ? সকল বান্দাই এই চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠবে। এরই মধ্যে উপর থেকে আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা ভেসে আসবে, রাব্বুল আলামীন জান্নাতের দারোয়ানকে ডেকে বলবেন—আমার ও আমার বান্দাদের মাঝের পর্দা হটিয়ে দাও। দূর করে দাও সব আড়াল। আজ তারা আমাকে প্রাণভরে ও চোখ জুড়িয়ে দেখে নিক। সুতরাং মহান রাব্বুল আলামীন ও বান্দাদের মাঝ থেকে পর্দা হটে যাবে। সকলের চোখ একযোগে উপরের দিকে ওঠবে। অবর্ণনীয় ও অকল্পনীয় সেই দৃশ্য অবলোকন করে মানুষের দৃষ্টি স্থীর হয়ে যাবে। মানুষ শ্বাস ফেলতে ভুলে যাবে। সময় থেমে যাবে। চারিদিক নিরব-নিথর হয়ে পড়বে। একে একে পর্দা ওঠতে থাকবে। প্রেমের আবেগে সকলের হৃদয় যেন বুক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইবে। তারপর ওঠে যাবে সর্বশেষ পর্দাটিও। মৃদু হাস্যময় মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন— مرحبا بالصادقين আমার সত্য বান্দাদেরকে মোবারকবাদ!

কামিয়াবীর সফর

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে যে সফর শুরু হয়েছে তার সমাপ্তি হবে মাওলা পাকের দীদার লাভের সেই মজলিশে। এটা কামিয়াবির সফর। গোটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী (আ.)-এর দাওয়াত এটাই ছিল যে, এ কামিয়াবির পথে চল। জীবনে এমন পথই গ্রহণ করা উচিত যে পথ মানুষকে মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে পৌছে দিবে। যে পথ সাফল্য ও সম্মানে পরিপূর্ণ। যে পথ ব্যর্থতা ও অসম্মান থেকে পবিত্র। সে পথের নাম হল ঈমান ও ইসলাম। আল্লাহ্ পাক যে পথের পূর্ণতা সাধন করেছেন স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এবং যে পথের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি তিনি দান করেছেন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! তবলীগের মেহনত মূলতঃ এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই হচ্ছে যে, যাতে সমস্ত মুসলমান জাহান্নামের পথ ছেড়ে জান্নাতের পথে ওঠে আসে। অর্থ-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে আমলের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠে এবং নাফরমানীর পথ ছেড়ে ফরমাবরদারীর পথে চলতে আরম্ভ করে। আপনাদেরকে তবলীগের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আপনাদের বিত্তবানরা তবলীগ জমাতে শামিল হলে আমরা আপনাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে উপকৃত হব। কক্ষনো নয়। বরং আমরা আপনাদের নেকীর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আমরা চাই আল্লাহ্ পাক যেন আপনাদের নেকীর মধ্যে আমাদের জন্যও একটা অংশ রাখেন। এছাড়া দ্বিতীয় কোন লোভ বা লালসা আমাদের নেই।

গোটা মুসলিম সমাজের ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, রাজা-প্রজা সকলেই যেন তওবা করে দ্বীনের পথে চলতে আরম্ভ করে এবং জান্নাতের অধিকারী হতে পারে—এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তবলীগের দাওয়াতী মেহনত চলছে। আর একারণেই আমরা রাজনীতি-বিমুখ। কারণ রাজনীতি, দল ও মতের বিরোধ সৃষ্টি করে। আমরা মুসলমানদের মাঝে কোন দলের বিভক্তি চাই না। আমরা চাই যাতে সকল মুসলমান একই মত ও পথের অনুসারী হয়ে জান্নাতের অধিকারী হতে পারে। আমরা নিজেদের জন্য যেভাবে জান্নাত প্রার্থনা করি, সকল মুসলমানের জন্যও তেমনি জান্নাত প্রার্থনা করে থাকি। এ কারণেই আমরা মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতির চর্চা করি না ; বরং মানুষের হাতে-পায়ে ধরে তাদেরকে কীভাবে জান্নাতের পথে তুলে আনা যাবে, সে মেহনতের শিক্ষা গ্রহণ করি।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্র ওয়াস্তে তওবা করুন এবং জান্নাতের পথ

গ্রহণ করুন। কারোরই জানা নেই যে, জীবন-পথের কোন্ বাঁকে কার মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে। জানা নেই যে, মৃত্যু কখন আচমকা-আক্রমণে গোটা কাফেলাই লুট করে নিয়ে যাবে। এজীবন ফুরিয়ে যাবার আগে, আমাদের এই অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের দিনগুলো জীবন-দিগন্তে অস্ত যাবার আগে তওবা করে নিন। জেনে রাখুন, মহান রাব্বুল আলামীনের চেয়ে অধিক দয়ালু ও মেহেরবান আর কেউ নেই। মা তার সন্তানের প্রতি স্নেহের আঁচল যতই বিস্তৃত করুক, সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ যতই গভীর হোক, বান্দার প্রতি মাওলা পাকের স্নেহ ও দয়ার সঙ্গে তা মোটেও তুল্য হতে পারে না। অনুগত বান্দার প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের স্নেহ তো সীমাহীন। যারা তাঁর নাফরমান, তাদের প্রতি রাব্বুল আলামীনের যে স্নেহ-বারী বর্ষিত হয়, তার বিবরণ কোরআন ও হাদীসের ভাষায় শুনুন— يا داؤد بشر المذنبين হে দাউদ! পাপীষ্ঠদেরকে সুসংবাদ দিন। যারা নিরাশ হয়ে পড়েছে, যাদের হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে, নিজেদের পাহাড় পরিমাণ পাপের দিকে তাকিয়ে যারা হতাশ হয়ে ভাবছে যে, তাদের আর তওবা করার সুযোগ নেই, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহ্ পাকের দরবারে আর কবুল হবে না ; তাদেরকে সুসংবাদ দান করে বলুন যে, তাদের বড় থেকে বড় গুনাহ্ এবং পাহাড় পরিমাণ পাপও আল্লাহ্ পাকের পক্ষে মাফ করে দেয়া মোটেও কঠিন নয়। তোমরা তওবা কর, নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, তারপর দেখ আল্লাহ্র ক্ষমা তোমাদেরকে কীভাবে আলিঙ্গন করে নেয়।

এটা কতইনা অন্যায় যে, আমরা সীমাহীন অপরাধে আকণ্ঠ ডুবে থাকবো। সুদ-ঘুস ও পরের ধন আত্মসাতে দিন কাটাবো, আর রাত হলে নৃত্য-গীত, শরাব পান ও অবৈধ শারিরীক সম্পর্কে মজে থাকবো, আর বলবো, নিরাশ হওয়া হারাম। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, তিনি গফুরুর্‌রহীম। কাজেই যা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা করতে থাক। আল্লাহ্ পাকের আদেশ নিষেধ পালন কর বা না কর, কোন পরওয়া নেই—এ ধারণা ঠিক নয়। নফ্স-শয়তানের ধোঁকা ছাড়া এ আর কিছু নয়। এটা কি আল্লাহ্ পাকের রহমতের সাথে উপহাস করা নয়? আল্লাহ্ পাক বলেন— افنجعل المسلمين كالمجرمين আমি কি করে মুসলমান আর মুজরিমকে একই পাল্লায় পরিমাপ করতে পারি ? এ ফয়সালা কোন্ আদালত দিয়েছে? রাতভর মদ্য পানকারী আর কোরআন তিলাওয়াতকারীর মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না ; সুদখোর, ঘুসখোর, পরের ধন আত্মসাৎকারী আর হক-হালালীভাবে কৃচ্ছতার মধ্যে জীবন যাপনকারীদেরকে একই পাল্লায় পরিমাপ করবো, পর্দানশীন আর পর্দাহীন উশৃঙ্খল নারী আমার বিচারে একই হবে, একথা তোমরা কোন্ কিতাবে পেয়েছো? কোথায় লেখা আছে, এনে দেখাও তো!

নৈরাশ্য অবশ্যই নিষিদ্ধ, তবে ক্ষমা লাভের জন্য তওবা করা আবশ্যক। হে দাউদ! আপনি গিয়ে বলুন, তারা যেন নিজেদের কৃত কর্মের জন্য তওবা করে। আমি তাদের সমস্ত অপরাধ মাফ করে দিব। হে দাউদ! তারা যেন বুঝতে পারে যে, আমি তাদের তওবার জন্য কত অধীর অপেক্ষায় রয়েছি। আমি তাদেরকে কত ভালবাসি।

এটি ছিল হাদীসের বিবরণ। এবার কোরআনের কথা শুনুন।

মা মানুষের সবচেয়ে আপন ব্যক্তি। সন্তানের আচরণে বিরক্ত হয়ে সেই মা-ই তার প্রতি কখনো কখনো নানাবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। রাগান্বিত পিতাও শাসনবাক্যে সন্ত্রস্ত করে তোলেন। আর সাধারণ মানুষ তো রেগে গেলে লাগামহীন কটুবাক্য ও গালাগালিতে ভিতরের ক্রোধ উদ্গিরণ করতে থাকে। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গালাগালি করে, আল্লাহ্ পাক তার উপর থেকে রহমতের দৃষ্টি সরিয়ে নেন। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, সম্মানে তুমি সুমহান। তুমি কতই না পবিত্র। কিন্তু আমার উম্মতের সম্মান তোমার চেয়েও অধিক। বাইতুল্লাহ্ শরীফ সম্পর্কে কেউ কটুবাক্য প্রয়োগ করলে মুসলমানরা তার প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে। অথচ আশ্চর্য হলো, যে মুসলমানের সম্মান বাইতুল্লাহ্ থেকেও অধিক, তাকে মানুষ নিঃসঙ্কোচে গালাগালি করে থাকে। সন্দেহ নেই মুসলমানকে গালি দেয়া বাইতুল্লাহ্‌কে গালি দেয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। এতে আল্লাহ্ পাক বেশী অসন্তুষ্ট হন।

যাহোক, অবাধ্য অপরাধীকে সম্বোধন করার সময় মানুষের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে। এটা মানুষের স্বভাব। উস্তাদ শাগরীদের উপর রুষ্ট হন। মা সন্তানের উপর কঠোর হন। আর রাজাধিরাজ মহান রাব্বুল আলামীন, অসীম-অনন্ত জগত জুড়ে যাঁর রাজত্ব, যাঁর ক্ষমতা সীমাহীন, যাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কোন শেষ নেই, অকুল-অশেষ যাঁর কুদরত। যিনি মানুষের কল্পনারও অতীত এক সূক্ষ্ম ও সুতীব্র অস্তিত্বের অধিকারী। যাঁর ব্যাপ্তি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিন সর্বত্র। اينما تولوا فثم وجه الله যেদিকেই ফিরে দেখ, আল্লাহ্ পাক সর্বত্রই বিরাজমান। এমনকি তোমার নিজের মধ্যেও যদি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পার, সেখানেও মহান রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে। সেই রাজাধিরাজ মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর অবাধ্যচারী নাফরমানদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়াই তো ছিল স্বাভাবিক। তাদের অবাধ্য ঘাড়টি চেপে ধরে প্রচণ্ডভাবে পিষে দেয়াই ছিল মানব-রুচির অনুকুল বিচার। কিন্তু তিনি তাঁর নাফরমান বান্দাদেরকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রেও 'জালেম, বদমাশ' ইত্যাদি শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার না করে

গভীর মমতায় তাদেরকে 'আমার বান্দারা' বলে সম্বোধন করেছেন। পবিত্র কালামে বলেছেন— يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم (হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর অন্যায় করেছো।) মায়ের স্নেহাপ্লুত মন যেমন তার সন্তানকে 'আমার সোনা, আমার কলিজা' ইত্যাদি শব্দে স্নেহসিক্ত করে থাকে, তার চেয়েও বহুগুণ অধিক স্নেহ ও মহব্বত আল্লাহ্ পাকের 'আমার বান্দা' সম্বোধনের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। চোর, ডাকাত, মদখোর, সুদখোর, যেনাকার সকলকেই তার এই স্নেহসিক্ত সম্বোধন—'আমার বান্দাগণ'।

'আমার বান্দাগণ'—কতই না স্নেহমাখা ডাক। যেন আল্লাহ্ পাক তাঁর কোন প্রিয় পরহেযগার মুত্তাকী বান্দাকে ডাকছেন। 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা গোটা জীবনে ভুলেও কখনো পূণ্যকর্ম ও নেকের কাজ করো নি, তোমরাও আমারই বান্দা। ভয় কী? শুধু একবার তওবা কর। তারপর চেয়ে দেখ, আমি কীভাবে তোমাদেরকে মাফ করে দেই।'

পরিশুদ্ধ তওবার প্রয়োজনীয়তা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনাদের প্রতি আমার করজোড় অনুরোধ হল, আপনারা আল্লাহ্কে ভয় করুন। সে ভয়ের প্রকাশ কিভাবে হবে? তওবার মাধ্যমে। তওবা আপনাদের অতীত জীবনের যাবতীয় পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে দিবে। আজ আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। চলুন আমরা সকলে মিলে তওবা করি। আপনাদের নিকট আমার এই অনুরোধ কি কোন অসঙ্গত প্রার্থনা? এখানে কয়েক হাজার লোক উপস্থিত আছেন। একটি বিষয় দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, সে জন্য আল্লাহ্ পাকের শোকর যে, এখানে উপস্থিত লোকদের নব্বুই শতাংশই যুবা শ্রেণীর। সবুজ পাতার ভীরে গাছের কাণ্ড খুব কমই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এটা আশার কথা। যদি আজ এই তরুণ যুবারা সকলে তওবা করে নেয়, তাহলে সন্দেহ নেই যে, আসমানের জগতে আজ আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে। সেখানে আনন্দ-কল্লোলে সকলে মুখরিত হয়ে ওঠবে। সেই আনন্দ উৎযাপনের জন্য গোটা আসমানকে সুসজ্জিত করা হবে। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এক সঙ্গে তাঁর এত উম্মতের তওবায় আত্মহারা হয়ে ওঠবেন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাক যখন এতই দয়ালু, তখন চলুন আজ আমরা তওবার নিয়ত করে ফেলি। বলুন, আপনারা কি তওবা করতে রাজি নন? আমি জানি না যে, আপনাদের কে সত্যিকার তওবা করবেন, আর কে শুধু

মুখে মুখে বলবেন। কিন্তু যারা সত্যিকার তওবা করবেন, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। ঐ রবের কসম! যিনি আকাশকে ছাদের মত টানিয়ে দিয়েছেন। যমীনকে বিছানার মত বিছিয়ে দিয়েছেন। যিনি চাঁদে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান। যিনি রাতকে অন্ধকার করেছেন আর দিনকে করেছেন উজ্জ্বল। সেই জালাল ও মহত্বের অধিকারী রবের কসম! আজকের এই মজমায় যারা সত্যিকার তওবা করে নিয়েছেন, তারা এমন নিষ্পাপ ও নির্মল হয়ে গিয়েছেন, যেন এইমাত্র মাতৃগর্ভ ছেড়ে জগতের আলোয় আবির্ভূত হয়েছেন। তারা আনন্দ করুন। কাল বিচার দিনে আপনাদের বাঁ হাতে দেবার জন্য যে খাতাটি প্রস্তুত ছিল, আল্লাহ্ পাক তা ছিড়ে ফেলে দিয়েছেন। ফিরিশতাদের গত ত্রিশ বছরের পরিশ্রম পণ্ড হয়ে গিয়েছে। কারো বা পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি বছরের পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে। বিগত দিনের সমস্ত ফাইল নষ্ট করে দিয়ে আল্লাহ্ পাক ফিরিশতাগণকে নতুন খাতায় নতুনভাবে লিখতে বলেছেন। সুতরাং যারা সত্যিকার তওবা করেছেন তাদের জন্য মোবারকবাদ। আর যাদের তওবা অপরিশুদ্ধ ছিল, তারা পরিশুদ্ধ তওবা করে নিন। আপনাদের মু'আমালাও পরিস্কার ও ঝকঝকে হয়ে যাবে। তওবার একাংশ পূর্ণ হলো, রইল হক আদায়ের বিষয়টি। কারো একশ' টাকা মেরে খেয়েছেন, আপনার জিম্মায় নামায বাকী রয়েছে। এবার সেগুলো আদায়ের ব্যবস্থা করুন।

আমাদের পরবর্তী করণীয় কি ? তা হল, আজকের পর আপনারা নিজেকে রাব্বুল আলামীনের নিকট মুহাম্মদীরূপে উপস্থাপন করুন। ইতিপূর্বে তো আমাদের কেউ নিজেকে ব্যবসায়ীরূপে উপস্থাপন করেছি, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক, কেউ আওয়ামীলীগ, কেউ বিএনপি, আরো কত কি। কিন্তু আজ থেকে নিজেকে মুহম্মদীরূপে গড়ে তোলার মেহনতে লিপ্ত হোন। আল্লাহ্ পাকের নিকট নিজেকে মুহাম্মদীরূপে উপস্থাপন করুন। এটাই তাবলীগের মেহনত। এটাই কালিমার মেহনত। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসার সাথে এই মেহনতে শরীক হোন। সন্দেহ নেই, এই মেহনত মানব আত্মায় অভাবনীয় এক ঐশী শক্তির সঞ্চার করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শকে নিজেদের জীবনে আপন করে গ্রহণ করুন। তিনি ছিলেন দু' জাহানের সরদার। তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে আপনারাও সরদারী লাভ করতে পারবেন। তিনি ছিলেন জগতের সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি। তাঁর আদর্শের অনুসরণ আমাদের জন্যও ইয্যত ও সম্মানের খাযানা খুলে দিবে। নবীর আদর্শ আমাদের জন্য চির কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করে দিবে। আর অকল্যাণের দরজাটি চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিবে। তাঁর আদর্শ আমাদের জন্য একাধারে সম্মানের চাবি ও

অসম্মানের তালা। সাফল্যের চাবি ও ব্যর্থতার তালা। মহব্বতের চাবি ও শত্রুতার তালা। জান্নাতের চাবি ও জাহান্নামের তালা। বরকতের চাবি ও বে-বরকতির তালা। রহমতের খাযানার চাবি আর গযবের খাযানার তালা। সকল প্রশান্তির চাবি ও অশান্তির তালা।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন পবিত্র জীবন-আদর্শ উপহার দিয়েছেন, যে আদর্শ একদিকে আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়, অন্যদিকে বন্ধ করে দেয় চির দুঃখের জাহান্নামের দরজা। একদিকে ইয্যতের দরজা খুলে দেয়, অন্যদিকে বন্ধ করে দেয় যিল্লতির দরজা। তাই আমাদের অনুরোধ হল, সকল মুসলমানই যেন খাঁটি মুহম্মদী হয়ে যায় এবং জীবনে ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী আদর্শ গ্রহণ করে নেয়, যিনি আল্লাহ্ পাকের নিকট ছিলেন সর্বাধিক প্রিয় ও মাহবুব।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে যিনি আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয় ; তাঁর সুন্নতকে আমরা খান খান করে দিচ্ছি। আর সে জন্য আমাদের দিলে সামান্য আফসোসও হয় না। একেকটি সুন্নত পালন মানব জীবনে প্রভূত ছওয়াব ও কল্যাণ বয়ে আনে। সুন্নত পালন না করলে কোন গুনাহ্ নেই সত্য, তবে, ...। কোন পুলিশকে বা গুজরানওয়ালার ডিআইজিকে বলুন, 'আগামীকাল আপনি ভারতীয় ইউনিফর্ম পরিধান করে ডিউটি করুন। মানুষের বাইরের সাজ মোটেও বিবেচ্য নয়—যেমন ইচ্ছা পোশাক পড়ুন। যেমন ইচ্ছা সাজ করুন। ভেতর ঠিক থাকলেই হল। নিয়ত পরিচ্ছন্ন ও মন ঠিক থাকাই আসল।' অসম্ভব, অন্তর যতই পরিশুদ্ধ হোক, বাইরের সাজে শত্রুর সাদৃশ্য পাকিস্তান সরকার কোনক্রমেই মেনে নিবে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ছোট্ট সুন্নত হল—তিনি কখনো টুপিহীন অবস্থায় চলতেন না। আমি শৈশবে দেখেছি, আমাদের গ্রামেও সাধারণত কেউ খালি মাথায় থাকত না। তাদের এই অভ্যাস সুন্নতের অনুসরণের ভিত্তিতে না হোক, কিন্তু এই শালিনতাবোধটুকু তাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু আজকের সমাজে উলঙ্গপনার যে ভয়াবহ সয়লাব বয়ে চলছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঐ শালিনতা ও নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের মিডিয়া আমাদেরকে বিবেক-বুদ্ধিহীন মত্ত পাগলে পরিণত করেছে। আমাদের গোটা প্রজন্মকে অশ্লীলতা ও প্রবৃত্তির জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। যে জাতি গান-বাদ্য নিয়ে মেতে থাকে তাদেরকে অধঃপতন থেকে কেউই রক্ষা করতে পারে না। যে জাতির মধ্যে গান-বাদ্য রয়েছে, তার

আবশ্যিক পরিণতি হিসাবে তারা যিনা, জুয়া, শরাব ও এজাতীয় সকল পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এবং পরিশেষে তাদের মাঝে ব্যাপক হারে অন্যায়-অবিচার শুরু হয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্ পাকের গায়েবী আযাবের চাবুক নেমে আসে।

মুহাম্মদী হওয়ার জন্য তরবিয়ত আবশ্যক

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

আমাদেরকে মুহাম্মদী হতে হবে। এটা কোন সহজ কাজ নয়। এ জন্য তরবিয়ত প্রয়োজন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মুবারক ও পরিপূর্ণ এক জীবন আদর্শ নিয়ে এসেছেন যে, এর ফলে অন্য সকল নবীর শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই যে তরীকার অনুগমনে অন্য নবীদের তরীকা পর্যন্ত রহিত হয়ে যায়, তার মোকাবেলায় আজকের কাফির-মুশরিকদের তরীকা অনুসরণ করে চলার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুণ-গরিমায় এমনই পরিপূর্ণ ছিলেন যে, কোরআনের পাতার পর পাতা তাঁর প্রশংসা দিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ পাক সূরা নাজ্‌ম-এ ইরশাদ করেছেন—

"নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি। এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফিরিশতা। সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। উর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ্ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন।"

সূরা কলমে ইরশাদ করেছেন—

"নূন—শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরুস্কার। আপনি নিশ্চয় মহান চরিত্রের অধিকারী।"

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'যাত ও সিফাত' তথা অস্তিত্ব ও গুণাবলীসমূহ এক অনন্য ভিন্নতায় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নামটি পর্যন্ত পিতা-মাতা নয়, বরং তিনি নিজে রেখেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন আব্দুল্লাহ্, মা ছিলেন আমেনা আর দুধ-মা ছিলেন হালিমা। পিতা আব্দুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র দাস-এর নির্যাস, মা আমেনার নিরাপদ আশ্রয় এবং সভ্য, ভদ্র ও নম্র হালিমার দুগ্ধ পান করে গড়ে ওঠেছেন হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হবার মুহূর্ত থেকে তাঁর গোটা জীবনটিই ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। মানব শিশু ভূমিষ্ট হবার সময় জন্ম প্রক্রিয়া উপলব্ধি করার মত জ্ঞান তার থাকে না। জন্ম গ্রহণের পরও সে থাকে একটি মাংসপিন্ডে মত প্রায় জড় পদার্থ। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের উপর ভর দিয়ে বুক উঁচু করে ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলখানা আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরেছিলেন। তাঁর এই ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গেই মা আমেনার সামনে গোটা দুনিয়া উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছিল। আমরা সে নবীরই গোলাম।

সময়ের নানা ঝড়ঝাপটা আমাদের কাছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ-বিবরণীকে মলিন করে দিতে পারে নি। হাদীস তো অনেক পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শয়তান বড় চেষ্টা করেছিল সেখানে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটাতে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের কুদরত সবসময়ই সে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছে। ফলে শয়তান নিজের গোমরাহীতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, আর আল্লাহ্র মাহ্বুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগী সূর্যের মত উজ্জ্বল আর চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ হয়ে হাদীসের পাতা আলোকিত করে রেখেছে। আর হাদীসের একেকটি শব্দ কোরআনের আয়াতের মত অক্ষত ও অবিকৃতরূপে বিদ্যমান আছে। আগাছা যা গজিয়েছিল, সযত্নে তা উপড়ে ফেলে নির্ভেজাল করা হয়েছে।

সফল পথ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরম্ভ করে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত নবীজীর গোটা নসবনামা আমাদের ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। দশ হাজার বছরের সুদীর্ঘ কাল আমাদের যে ইতিহাসকে মলিন করতে সক্ষম হয় নি, মাত্র চৌদ্দশ' বছর তা কীভাবে আমাদেরকে ভুলিয়ে দিতে পারে? যে পথ চলতে চায় তার জন্য পথ প্রশস্তই আছে। আর যার চলার ইচ্ছা নেই, তার জন্য বাহানারও অভাব নেই। যেই মহান ব্যক্তির পূর্বাপর সকল ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে, পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি শুধু একজনই এসেছিলেন। তিনি হলেন, আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জীবন পথে এমন মহান ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না তো কার অনুসরণ করবেন? যারা জানোয়ারের চেয়েও অধম, যারা হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, তাদের? তাবলীগ সেই মহান ব্যক্তি, আখেরী নবী

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে চলার শিক্ষা দেয়। যার অনুসরণ করে চলে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করা যায়। মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের স্বভাব-চরিত্রে শুধু 'মুহাম্মদী গুণাবলীকে' স্বীকৃতি দেন এবং কেবলমাত্র তাতেই সন্তুষ্ট হন। কাজেই মুহাম্মদী চরিত্র অর্জন করুন। তাতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই সফল হওয়া যাবে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তা মসজিদ-মুখী এক পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। তাতে ইবাদত যেমন রয়েছে, তেমনি মুআমালাতও রয়েছে। উম্মতকে তিনি নামায পড়ে দেখিয়েছেন এবং পড়িয়ে শিখিয়েছেন। তারপর বলেছেন, صلوا كما رأيتمونى اصلى আমাকে যেমন করে পড়তে দেখেছো, ঠিক তেমনি করেই তোমরা নামায পড়বে। আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায উপহার দিয়ে তা মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে মিলনের উপায়রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সকল বিপদ-আপদে মসজিদমুখী হতে ও আল্লাহ্‌কে ডাকার শিক্ষা দিয়েছেন। বিপদে আল্লাহ্ পাকের নিকট করজোড় হতে শিখিয়েছেন। নামাযের তা'লীম দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও ইবাদতের মধ্যে নামাযের স্থান সবার উপরে। সুতরাং কেউ যেন বেনামাযী না থাকে। নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ সকলেই যেন নামাযী হয়ে যায়। আমরা যে মসজিদে বসে আছি, সে মসজিদের মহল্লা তো ছোট নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও মসজিদ এত ছোট হবার রহস্য কি ? যেহেতু মহল্লার সকলে নামাযী নয়, তাই মসজিদও বড় হবার প্রয়োজন ছিল না—সম্ভবত এটাই কারণ।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ ওসিয়ত

উম্মতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাকের মাহবুব আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ অসিয়ত ছিল নামায সম্পর্কে— الصلوة الصلوة ওহে আমার উম্মত! তোমরা নামাযের প্রতি অবহেলা করো না। নামায ত্যাগ করো না। وما ملكت ايمانكم আর গোলাম, অধিনস্ত, গরীব-মিসকিনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার থেকে বিরত থেকো। অহংকারী, অত্যাচারী হয়ো না। মোটকথা, উম্মতের উদ্দেশ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখেরী ওসীয়ত বা নসীহত ছিল নামায সম্পর্কে। এবার আপনারা বলুন, আমাদের এ শহরে কয়জন খাঁটি ও নিয়মিত নামাযী রয়েছে? উপস্থিত এই মজলিশে কয়জন নিয়মিত নামাযী পাওয়া যাবে? পচানব্বুই শতাংশ লোক যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়মিত নামাযী নয়, আল্লাহ্ পাকের মদদ তাদের জন্য কীভাবে আসতে পারে বলুন! কীভাবে পেতে পারে তারা আসমানের কুদরতী সাহায্য! উম্মতের

পচানব্বুই শতাংশ লোকই বেনামাযী, আর যে পাঁচ জন নামায পড়েন, তারাও অমনোযোগী। তাদের তেলাওয়াত অশুদ্ধ, রুকূ-সিজদা নিয়ম অনুযায়ী হয় না— এই হল নামাযীদের হালত। তবে এটা ঠিক যে, নামায একেবারে না পড়ার চেয়ে অশুদ্ধ পাঠও হাজার গুণ ভাল। কিন্তু এই পড়াকে কোনভাবেই স্থায়ীভাবে মেনে নেয়া যায় না।

নামাযীদের প্রকার

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, নামাযীদের মধ্যে পাঁচ প্রকার লোক রয়েছে। এক প্রকার নামাযী হল 'অলস'। এই শ্রেণীর নামাযীরা কোনদিন দুই ওয়াক্ত, কোনদিন তিন ওয়াক্ত, কোনদিন চার ওয়াক্ত এবং কোনদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। আর কোন কোন দিন এক ওয়াক্তও নয়। এ প্রকারের নামাযীরা জাহান্নামে যাবে। আর এক প্রকার নামাযী হল যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে বটে, কিন্তু নামাযে দাঁড়িয়ে তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কেন দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই মনে থাকে না। আল্লাহ্র আদালতে এরাও পাকড়াও হবে। রাজাধিরাজ মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবার আদব রক্ষা না করার কারণে তাদেরকেও শাস্তি পোহাতে হবে। তৃতীয় প্রকারের নামাযী হল, যারা নামাযে তাকবীর বাঁধার পর নামাযের প্রতি একাগ্র হবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টায় তারা পরিপূর্ণরূপে সফল হতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণেই মন একাগ্রতা হারিয়ে নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কখনো হাজির কখনো গরহাজির। কখনো নামাযে মনোযোগী কখনো অমনোযোগী। অনুগ্রহ করে মহান রাব্বুল আলামীন এদেরকে মাফ করে দিবেন। চতুর্থ প্রকার নামাযী হল ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যারা নামাযে তকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে রাব্বুল আলামীনের ধ্যানে বিভোর হয়ে পড়েন। পার্থিব যাবতীয় বিষয় হতে তাদের মন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নামাযে তকবীর বলার পর এভাবে যারা আল্লাহ্র ধ্যানে হারিয়ে যান, আল্লাহ্ পাকের নিকট শুধু এমন ব্যক্তিরাই প্রকৃত নামাযী বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

হযরত ইয়াকুব (আ.) ও হযরত ইউসুফ (আ.) এই দুই নবী সম্পর্কে পরস্পর ছিলেন পিতা-পুত্র। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শৈশব কালেই আল্লাহ্ পাক এই দুই পিতা-পুত্রের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন প্রায় চল্লিশ বছরের জন্য। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর পুণরায় তাদের মাঝে মিলন ঘটে। পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের পর আল্লাহ্ পাক নবী-ইয়াকুব (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের মাঝে যাতনাময় এই বিচ্ছেদ কেন ঘটিয়েছি জানেন কি ? শুনুন—আপনি একদিন

নামাযে দণ্ডায়মান ছিলেন। পাশেই আপনার প্রিয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) শায়িত ছিলেন। তিনি কেঁদে উঠলে নামাযরত অবস্থায়ই আপনার দৃষ্টি তার দিকে ফিরে গিয়েছিল। আপনার মনোযোগ আমার দিক থেকে সরে গিয়ে আপনার পুত্রের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। আমার নবী হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি মাখলুকের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। আপনার দৃষ্টি ও মন আমার প্রতি অমনোযোগী হয়ে ওঠেছিল। তাই আমি আপনার সেই দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিয়েছিলাম, এবং আপনাদের পিতা-পুত্রের মাঝে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! গোটা নামায তো দূরের কথা, আমাদের তো এমন একটি সিজদাও নসীব হয় না, যে সিজদায় নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই আমাদের মনে ও ধ্যানে বিদ্যমান থাকেন।

পঞ্চম প্রকারের নামাযী হল, নামায যে ব্যক্তির চোখের শীতলতা। জানি না আজকের দুনিয়ায় এমন কোন নামাযী আছেন কি না, নামাযে যাদের চোখ শীতল হয়ে ওঠে, এবং নামায পড়ে যাদের হৃদয় পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মাওলা পাকের কাছে এই বলে দু'আ করুন—আয় মাওলা! আপনার দুনিয়ায় যদি এমন কোন বান্দা থেকে থাকেন, নামায যার চোখের শীতলতা, তবে আমাকেও তেমন নামায দান করুন। তবলীগ সে নামায শিক্ষারই দাওয়াতের নাম। শরীয়তের সব ইবাদতই গুরুত্বপূর্ণ, তবে এখানে অধিক গুরুত্বের কারণে নামাযের আলোচনা করা হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে স্বভাব-মাধুর্য শিখিয়েছেন। আখলাকের তা'লীম দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমাদের আখলাক চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ক্ষমা করতে শিখিয়েছেন। বলেছেন। فاعفوا واصفحوا ক্ষমা করো, মাফ করো। সম্পর্ক ছিন্নকারীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করো। যে ছিনিয়ে নেয় তাকে দান করো। যে বাড়াবাড়ি করে তাকে মাফ করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি কাজে অভ্যস্ত হতে পারবে, আমি তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। সেই তিনটি কাজ হলো— (১) সম্পর্ক ছিন্নকারীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। (২) যে ব্যক্তি জোড়জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয় বা দখল করে নেয়, তাকে দান করা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপনার প্রাপ্য হক আপনাকে দেয় না, তার কোন হক যদি আপনার যিম্মায় থেকে থাকে, তা পরিশোধ করে দেয়া। এবং (৩) অবিচার ও যুলুমকারীকে মাফ করে দেয়া। এই তিন কাজ যে ব্যক্তি করবে, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে ঘর

নিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ওয়াদা কোন আমলের প্রেক্ষিতে নয়, এ ছিল আখলাক ও সুস্বভাবের বিনিময়ে।

কিন্তু আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আজ আমাদের আখলাক একেবারে বরবাদ হয়ে গিয়েছে। একই মায়ের স্তন পান করে, একই মায়ের কোলে লালিত-পালিত হয়ে ও একই বিছানায় গলাগলি করে বেড়ে ওঠে, দু' ভাই সামান্য সম্পদ আর মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য পরস্পর এমন বিবাদে লিপ্ত হচ্ছে যে, একজন অন্যজনের চেহারা পর্যন্ত দেখতে নারাজ। যে ভাই-বোন একই থালায় খাবার খেয়েছে, একই গ্লাসে পানি পান করেছে, একই আঙ্গিনায় লুটোপুটি খেয়েছে, আজ তারাই কয়েক ইঞ্চি জায়গার জন্য বা দোকানের সামান্য অংশীদারিত্বের জন্য পরস্পরের প্রতি এতটা মারমুখী হয়ে ওঠে যে, কেউ কারো ছায়া পর্যন্ত দেখতে পারে না। এই কী মুসলমানের আখলাক ? এই আখলাক নিয়ে কখনো কি ইসলাম প্রচারের দাবী করা চলে! ইসলাম কী এমন আখলাকের উপর নির্ভর করেই প্রসার লাভ করেছিলো ? এই আখলাক থেকেই কি দুনিয়াতে ঈমান ও হিদায়াতের হাওয়া বয়েছিলো ?

নবী করীম (সা.)-এর ক্ষমাগুণ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাকে হত্যাকারী জামাতা হাওয়ার ইবনে আসওয়াদ যখন মক্কা বিজয়ের সময় তওবা করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সেই আখলাক অর্জণ করার জন্যই তাবলীগের দাওয়াতী মেহনত।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-কে এক ব্যক্তি গালি দিল। ইমাম (রহঃ) লোকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তা দেখে লোকটি মনে করল, ইমাম হয়ত তার গালি শোনতে পায় নি। তাই লোকটি ঘুরে তার সামনে এসে বললো, আমি তোমাকে গালি দিচ্ছি। ভেবে দেখুন, কত বড় জালেম! ইমাম যয়নুল আবেদীনকে গালি দেয়া তো কোন সাধারণ অপরাধ নয়। তিনি ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম বংশধর। তাঁকে গালি দেয়া খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়ারই নামান্তর। সেই নরাধমের যবানটি তো টেনে ছিড়ে দেয়া উচিত ছিল। অথচ লোকটি যেই মহান ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে, তিনি তাকে কিছু বলবেন তো দূরের কথা, বরং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসছেন। চরম ধৃষ্টতা দেখিয়ে লোকটি যখন ঘুরে তার সামনে এসে গালি দেয়ার সংবাদ দিল, তিনি জবাবে বললেন, আমি তোমাকে মাফ করে

দিচ্ছি।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা মাফ করতে শিখুন। পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে শিখুন। সমাজের গান্ধা পরিবেশ আমাদেরকে বরবাদ করে দিচ্ছে। ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। ভাই-বোনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে তাদের সম্প্রীতির সম্পর্ক বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দরবারে একটি মামলা উপস্থিত হল। অপরাধী ছিল তিনজন। তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ হল। সেখানে অপরাধীদের এক আত্মীয়া উপস্থিত ছিল। মহিলা হাজ্জাজের নিকট করজোড়ে মিনতি জানিয়ে তাদের মুক্তি প্রার্থনা করলো। হাজ্জাজ তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বলল, এদের মধ্য থেকে তোমার খুশী মত যে কোন একজনকে মুক্ত করে নিতে পার। অপরাধীদের একজন ছিল মহিলার পুত্র, একজন স্বামী ও একজন ছিল ভাই। মহিলা বলল, স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামী পাওয়া যাবে। পুনঃবিবাহিত জীবনে সন্তান পাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার পিতামাতা ইন্তেকাল করেছেন। কাজেই এখন আর ভাই পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, দয়া করে আমার ভাইকে মুক্ত করে দিন। মহিলার বক্তব্য শোনে হাজ্জাজ বলল, তোমার সুন্দর নির্বাচনের জন্য আমি সকলকেই মুক্ত করে দিলাম।

আজ সে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, বোন বোনের বিরুদ্ধে সামান্য সম্পদের জন্য খুনোখুনি করে চলেছে। এ অন্যায় ও মুর্খতার কী পরিণাম হতে পারে বলুন?

আখলাকে হাসানা বা সুন্দর স্বভাবের গুরুত্ব

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনাদের আখলাককে সুন্দর করুন। সুন্দর স্বভাব ও আচার-ব্যবহার শিখুন। অন্যকে মাফ করতে ও তাদের প্রতি কোমল আচরণ করতে শিখুন এবং সন্তানকে শিক্ষা দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গোটা জীবন নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়েছে এবং যে ব্যক্তি গোটা জীবন নিয়মিত রোযা রেখেছে তাদের চেয়েও একজন সুন্দর আখলাকের মানুষ অধিক সম্মানের অধিকারী।

এক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের পরিচয় কি? নবীজী বললেন, সুন্দর স্বভাব। সাহাবী নবীজীর সামনে বসা ছিলেন, ওঠে একপাশে এসে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম কি জিনিস? তিনি বললেন, সুন্দর স্বভাব। সাহাবী ওঠে আরেক দিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

ইসলাম কাকে বলে? তিনি বললেন, সুন্দর স্বভাব। সাহাবী ওঠে পিছন দিকে গেলেন। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! দ্বীন কাকে বলে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুন্দর স্বভাব। সাহাবা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, দ্বীন কাকে বলে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুন্দর স্বভাব। সাহাবী তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! দ্বীন কাকে বলে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার শরীর ঘুরিয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বললেন, আরে ভাই! তুমি আর কবে বুঝবে? দ্বীন হল সুন্দর স্বভাব। انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق 'জেনে রাখ, আমি স্বভাব-সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

অথচ আজকের মানুষ এক কাতারে নামায পড়লেও পারস্পরিক সালাম ও দু'আর প্রতি তাদের চরম অনিহা। প্রতিবেশীর সঙ্গে অপরিচয়ের দেয়াল তুলে সালাম-কালাম বন্ধ। আত্মীয়-প্রতিবেশীদের যারা হাদিয়া-তোহ্ফা নিয়ে আসে, শুধু তাদের সঙ্গেই কুশল বিনিময় চলে। যারা আসে না, তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেও দেখে না। একে তো কোনভাবেই প্রশংসিত আখলাক বলা চলে না।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আখলাক আমাদেরকে শিখতেই হবে। যদিও বিষয়টি খুব সহজ নয়। শত রাকাত নফল নামায পড়া সহজ, কিন্তু যে ব্যক্তি গালাগালি করে, তার জন্য দু'আ করা কঠিন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ ও খুৎ-পিপাসা উপেক্ষা করে রোযা রাখা সহজ, কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাকে যেঁচে গিয়ে সালাম করা কঠিন। হাজার মাইল পথ পারি দিয়ে, লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে হজ্জ করতে যাওয়া সহজ, কিন্তু যেই পরসীর সঙ্গে যোগজিজ্ঞাসা নেই, তার অসুস্থতায় দু' কদম হেটে খোঁজ নিতে যাওয়া খুবই কঠিন। নফস বলে, 'সে কি তোমার খোঁজ নিতে এসেছিলো যে তুমি যাবে ?' স্ত্রী হয়ত প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। তাই সেও বলছে, আমাদের উপর কত কেয়ামত গুজরে গেছে, তারা কি এসেছিলো খোঁজ নিতে যে এখন আমরা যাবো ? সোবহানাল্লাহ্! এই হল আমাদের আখলাক!

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! প্রতিপক্ষকে বলুন, তোমার তুনীরে যত তীর রয়েছে, আমার দিকে একে একে তার সবগুলোও যদি ছুড়ে দাও, হলপ করে বলছি, আমার দিক থেকে তার সামান্যও জবাব হবে না। আপনারা এই আখলাক অর্জন করুন। তাহলে জান্নাতুল ফিরদাউসের সেই সুদৃশ্য অট্টালিকার চাবি খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার হাতে তুলে দিয়ে বলবেন, এই নাও তোমার উপহার।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! ক্ষমা করার স্বভাব অর্জন করুন। কন্যা বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েছে, বিয়ে দিচ্ছেন। তাকে অঢেল আসবাবপত্র তৈরী করে দিচ্ছেন, কিন্তু তার চরিত্রে সুন্দর স্বভাব কি দিয়েছেন? পরের ঘরে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে সে স্বভাবের কি সৌরভ ছড়াবে? মানুষের সঙ্গে কী আচার-ব্যবহার করবে, স্বামীর স্বভাব কেমন জানা নেই। তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কি না? প্রীতিময় সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে কি না? এসব কি ভেবে দেখেছেন? শুধু স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনা দিয়ে জীবন চলে না, সঙ্গে আখলাকের অলঙ্কারও বড় প্রয়োজন। পুত্র যুবক হয়েছে, কারবারী হয়েছে, আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামাল দিচ্ছে, মাশাআল্লাহ্! বেটা লায়েক হয়েছে, এবার তাকে বিয়ে করাতে হবে। কিন্তু তাকে মানুষ কি বানাতে পেরেছেন? তার স্বভাবকে কি মাধুর্য মণ্ডিত করতে পেরেছেন? আরেকজন লোক যে তাদের আদরে-আহ্লাদে পালিত কন্যাটি তার হাতে তুলে দিবে, কাল যে আপনার সন্তান তার প্রতি অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার করবে না, মনুষত্বের খোলশ ছেড়ে পশু হয়ে ওঠবে না, তার নিশ্চয়তা কি? শুধু সুদৃশ্য বাড়ী আর গাড়ী দিয়ে জীবনের সুখের পথ রচিত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন স্বভাব-মাধুর্য। শুধু গাড়ী হাঁকানো, মোবাইল হাতে ঘুরে বেড়ানো, বার্গার খাওয়া আর আড্ডা মারার নাম জীবন নয়। একে জীবন বলে না। আজ ঘরে ঘরে এই অনাচারের আগুন জ্বলছে। ছেলে-মেয়ে কেউই আখলাক শিখছে না। পিতা-মাতা সন্তানের খেদমত পাবার আশায় আশায় মৃত্যুপথযাত্রী। আর সন্তান বলছে, তোমাদেরকে দেবার মত অবসর আমাদের নেই। আফসোস!

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! সমাজের চিত্র এখন বড়ই বেদনাদায়ক। প্রতিটি ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন, সেখানে সঙ্গে মরমরের দেয়াল থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে। ইয়ারকণ্ডিশনের ঠান্ডা বাতাস বদআখলাকীর উত্তাপ মোটেও কমাতে পারছে না। ঠান্ডা পানি দিয়ে মনের জ্বালা দূর করা যায় না। নরম গদির বিছানা মানুষের কাছে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই নগরের সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যাবলী তাদের মনে কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রতিটি কাজে ইখলাস প্রয়োজন

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনাদের প্রতি আমার করজোড় অনুরোধ হলো, আপনারা মাফ করতে শিখুন। রাগ, অপমান, অবহেলা হজম করতে শিখুন। আমার আল্লাহ্র নবীর ওয়াদা রয়েছে, তাহলে আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে ইয্যত ও সম্মান দান করবেন। আপনি একটু নত হয়েই দেখুন না, আল্লাহ্ পাক কিভাবে আপনার মাথা উঁচু করে তোলেন। নামায পড়া, রোযা রাখা, হজ করা

ইতাদি অনেক সহজ কাজ। কিন্তু বিনয় অবলম্বন করে নত হয়ে চলা, যে ব্যক্তি গালি দেয় তার জন্য দু'আ করা, অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নেয় যে ব্যক্তি, হাসিমুখে তাকে সালাম করা, বড়ই কঠিন-কর্ম। এই কঠিন কর্মটিতে যে অভ্যস্ত হতে পারবে, আল্লাহ্‌র নবী তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের ব্যবস্থা করে দিবেন বলে ওয়াদা রয়েছে।

তবলীগ শুধু বয়ান করার নাম নয়। আমারও শুধু বয়ান করা উদ্দেশ্য নয়। মানুষের মাঝে এই ক্ষমাগুণকে জিন্দা করার জন্যই আমাদের এই দাওয়াত ও মেহনত। আমরা মানুষকে এই ক্ষমা গুণ শিখতে, অর্জন করতে এবং গোটা দুনিয়ায় তা প্রচারের মেহনতে অংশ নিতে বলছি। এটাই হলো খতমে নবুওয়াতের মেহনত। আর এ মেহনতের পিছনে একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য যেন না থাকে। আমি যে আপনাদের সামনে কথা বলছি, এতে যদি আমার উদ্দেশ্য হয় সমাজে প্রসিদ্ধি অর্জন, এই যে আমি দাঁড়িয়ে কষ্ট করছি, পা ব্যাথা করছে, গরমের কষ্ট হচ্ছে ; এই কষ্ট স্বীকারের পিছনে যদি উদ্দেশ্য গরবর হয়, তাহলে কাল কেয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনার কোন শেষ থাকবে না। কাজেই সর্বাগ্রে নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। গাড়ির চাকা কাটার আঘাতে পাংচার হয়ে যেমন নিশ্চল হয়ে পড়ে, তেমনি বদ-নিয়তির কাটা গোটা জীবনের সমস্ত আমল ও ইবাদতের হাওয়া বের করে তা চুপসে দিতে পারে।

কাজেই আমার ভাই ও বন্ধুগণ! একমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিই যেন আমাদের মেহনতের উদ্দেশ্য হয়। আর কোন উদ্দেশ্য যেন আমাদের কর্ম-পরিশ্রমকে নিষ্ফল করে দিতে না পারে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর কাধে বোঝা বহনের চিহ্ন দেখে লোকজন বেশ অবাক হয়—ইনি হলেন দ্বীন-দুনিয়ার বাদশা, তাঁর কাঁধে এই চিহ্ন এল কি করে ? অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, তিনি প্রায় শতাধিক পরিবারের ব্যয় ভার বহন করতেন। রাতের আঁধারে বস্তা ভরে নিজেই কাঁধে বহন করে নিয়ে যেতেন খাদ্যসামগ্রী। খাদেমকেও কাঁধে নিতে দিতেন না : আঁধার থাকতে থাকতেই সকলের ঘরে ঘরে পৌছে দিয়ে এসে নিজের শয়ন কক্ষে পৌছে যেতেন। কেউ জানতেও পেত না যে, বস্তাভর্তি খাদ্যসম্ভার কে পৌছে দিয়ে গেছে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! ঐসব মহান মনীষীদের ন্যায় ইখলাস ও আখলাকের ইসলাম অর্জন করুন। এমন যেন না হয় যে, মসজিদে একটি পাখা

দিয়ে তার পাতায় লিখে দিতে হবে, 'হাজী বুটা মিয়ার দান'। আরে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি এই ভেবেছ যে, আটশ' টাকার পাখা দিয়ে আল্লাহ্‌কে যথেষ্ট ইহ্‌সান করে ফেলেছো ?

নামাযের স্থায়ী ক্যালেন্ডারের নীচের দিকে দেখবেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা থাকে। তেমনি এক প্রতিষ্ঠানের মালিককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বলুন তো, এই ক্যালেন্ডার ছাপানোর পিছনে কি নামাযীদের খেদমত উদ্দেশ্য, না প্রতিষ্ঠানের প্রচার উদ্দেশ্য ? লোকটি বলল, প্রতিষ্ঠানের প্রচারই উদ্দেশ্য। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমাদের দুনিয়াবী এই হাঙ্গামা হতে মসজিদকে তো অন্তত মাফ করে দিতে পারো। আমরা এমনই জালেম যে, মসজিদকে পর্যন্ত বাজার বানিয়ে ছেড়েছি। নিয়তের সামান্য গরমিল, আপনার গোটা পরিশ্রমকে মূল্যহীন করে দিতে পারে। কাজেই গোটা দুনিয়ার অসন্তুষ্টিকে পিছনে ফেলে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিকে লক্ষ্যবস্তু করুন। তবেই আপনার দ্বীনকে দ্বীন ও আমলকে আমল বলা যাবে। অন্যথায় আমার এই গোটা বয়ান দুনিয়াদারী হতে বাধ্য। আপনারা দোকান থেকে অর্থ-বিত্ত উপার্জন করেন, আর আমি বয়ান দিয়ে সম্মান লাভ করি। ফলে আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আপনিও দোকানদার, আমিও দোকানদার।

যাই হোক, আমার বক্তব্যের সার হল, প্রতিটি আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত হতে হবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি। গোটা দুনিয়ায় এই বাণীর প্রচার-প্রশারই দাওয়াত ও তবলীগের কাজ।

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত কতদিনের জন্য এবং কাদের জন্য তিনি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, তাঁর নবুওয়াত কেয়ামত তথা গোটা সৃষ্টি জগতের বিলয়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সে সময় পর্যন্ত আগত সমস্ত জিন ও মানুষের নবীরূপে তিনি প্রেরিত। তাঁর নবুওয়াত কি কোন দেশ বা এলাকার নির্দিষ্ট সীমারেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ ? না। বরং তিনি গোটা দুনিয়ার জন্যই নবীরূপে আগমন করেছেন। তাঁর জীবন কতদিনের ছিল ? আট হাজার একশ' ছাপ্পান্ন দিন মাত্র। এত ছোট একটি জীবন, কিন্তু নুবুওয়াত কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। তাঁর ইন্তেকালের পর কে সামাল দিবে এ দায়িত্ব ? কেয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের কাছে তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীন কে পৌঁছে দিবে ? এ সমস্যার সমাধান ও এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার জন্য আল্লাহ্ পাক আখেরী উম্মতকে নির্বাচন করেছেন, كنتم خير امت اخرجت للناس আল্লাহ্ পাক এই উম্মতকে মোবারকবাদ দিয়ে বলেছেন, তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। কেননা اخرجت তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

للناس মানুষের জন্য। মানুষের জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে? বড় বড় আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ করতে হবে ? সড়ক, পার্ক আর বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে দিতে হবে ? না। মানুষের সৃষ্টি এই উদ্দেশ্যে নয়। এটা অতি সাধারণ কাজ। তোমাদেরকে অন্য একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা কেবল তোমরাই করতে পারো, আর কেউ নয়। সে বিশেষ কাজটি হল? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر তোমরা সৎকাজের প্রচার-প্রসার করবে এবং অসৎকাজ ও অপকর্ম থেকে নিষেধ করবে। আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখবে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এই মেহনত নিয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এবং মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তা পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। চাই আমাদের নিজেদের আমল থাকুক বা না থাকুক, এ দায়িত্ব সর্বাবস্থায়ই আমাদের কাঁধে বিদ্যমান থাকবে। তবলীগের কাজ সর্বাবস্থায়ই ফরয। অবশ্য সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, 'যে বিষয়ে নিজের আমল নেই, তা নিয়ে অন্যকে বলা উচিত নয়। এ বলায় কোন লাভ হয় না।' সমাজের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। লাভ অবশ্যই আছে। বলছি শুনুন।

মূর্খ পিতা নিজে কোরআন পড়তে না জানলেও সন্তানকে যখন কোরআন শিখতে মসজিদে পাঠিয়ে দেয়, তখন এতে লাভ এই হয় যে, সন্তান যখন 'বিসমিল্লাহ্' বলে, তার প্রথম বিসমিল্লাহতেই আল্লাহ্‌র খাতায় পিতার ক্ষমার ফায়সালা হয়ে যায়। কাজেই নিজে আমল না করলেও অন্যকে আমলের কথা বলার মধ্যে যথেষ্ট ফায়দা রয়েছে। অবশ্য আমার এ বক্তব্য দ্বারা আপনারা একথা মনে করবেন না যে, নিজের আমলের প্রয়োজন নেই। আমি সে কথা বলছিও না। আমি শুধু সমাজে প্রচলিত একটি ভুল ধারণা অপনোদনের চেষ্টা করেছি মাত্র। মোটকথা, এই উম্মত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার বদৌলতে।

চারটি গুণ

চারটি বিষয়ে এই উম্মতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন, والعصر ، ان الانسان لفى خسر সমস্ত মানুষ ব্যর্থ। তবে الا الذين امنوا যারা ঈমান এনেছে, তারা সফল। সুতরাং যারা ঈমান গ্রহণ করে নি, সেই কাফের মুশরিকের দল ব্যর্থ ও বঞ্চিত। وعملوا الصالحات আর ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ ব্যর্থ নয়, যারা পুণ্যকর্ম ও নেক আমল করেছে। وتواصو بالحق وتواصو بالصبر আর হক ও সবরের দাওয়াত দিয়েছে। মোটকথা, মানুষের কামিয়াবী চারটি অংশে

বিভক্ত। যারা শুধু ঈমান এনেছে, তারা চারের একভাগ কামিয়াব, আর তিন ভাগ ব্যর্থ। যারা ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলও করেছে, তারা অর্ধেক কামিয়াব। আর যারা চার পেপারেই ফুল মার্ক পেয়েছে, পূর্ণ নম্বর অর্জন করতে পেরেছে, তারা ১০০% সফল। সুতরাং মানুষকে পূর্ণ সাফল্যের জন্য চারটি গুণই পরিপূর্ণরূপে অর্জন করতে হবে।

একটি আয়াতের ভুল অর্থ

তবে কিছু লোকের মধ্যে একটা ভুল চিন্তা প্রচলিত রয়েছে। তারা বলে, যে ব্যক্তি নিজেই আমল করে না, তার দাওয়াতে অন্যের লাভ হবার আশা করা যায় না। لم تقلون ما لا تفعلون (যে কাজ নিজে করো না, তা কেন অন্যকে বলো ?) এই আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যার সঙ্গে তারা পরিচিত। তাদেরকে বলছি, গোড়ামী ত্যাগ করে ইসলামকে জানুন এবং ইসলামের তরবিয়ত শিখুন। জেনে রাখুন, অশিক্ষিত পিতা যখন তার সন্তানকে পড়তে পাঠায়, সন্তানের প্রথম বিসমিল্লাহ্‌র সঙ্গে সঙ্গে পিতা, সন্তান এবং শিক্ষক, তিনজনেরই ক্ষমা হয়ে যায়।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—

الدال على الخير كفاعله

যে ব্যক্তি নেক ও পূণ্য-পথের সন্ধান দেয়, ভাল কাজের প্রতি পথ দেখায়; সে ব্যক্তি, ভাল কাজ যে করে তার সমপরিমাণ নেকী ও পূণ্য লাভ করে। আরেকটি প্রমাণ দেখুন—

أرئيت الذى يكذب بالدين * فذلك الذى يدع اليتيم *

'আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? এতীমদেরকে সামান্য অণ্ন দান করে না।' অর্থাৎ, দানের আমল সে করে না। সুতরাং আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী অন্যকে দানের কথা বলাও তার কর্তব্য নয়। কিন্তু কোরআন তার তৃতীয় অপরাধ হিসাবে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছে তা হল, ولا يحض على طعام المسكين 'এবং মিসকিনকে অণ্ন দিতে অন্যকে উৎসাহিতও করে না।' তার অপরাধের সংখ্যা তিনটি হল—আখেরাতকে অস্বীকার করা, দরিদ্র-ইয়াতীমকে আহার না করানো এবং অভাবীকে আহার্য্য দানের ব্যাপারে অন্যকে উৎসাহিত না করা। নিজে আমল না করে সে সম্পর্কে অন্যকে উৎসাহিত করায় যদি কোন ফায়দা না-ই হত, তাহলে আল্লাহ্ পাক কেন দীন-দুঃখীদের আহার করানোর প্রতি অন্য লোকদেরকে উৎসাহিত না করাকে

সেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করলেন? এবং নিজেও আহার না করানো এবং অন্যকেও আহার করাতে উৎসাহিত না করাকে সেই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করলেন। কাজেই এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নিজে আমল না করা এবং অন্যকে আমলের দাওয়াত না দেওয়া দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ। দাওয়াত দেয়ার জন্য নিজে আমলদার হওয়া মোটেও পূর্ব শর্ত নয়।

আমি যদি এই বিভ্রান্ত চিন্তার অন্ধকারে থাকতাম, যারা আমার কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, আমি যদি তাদেরকে বলতাম, হুঁ, খুব তবলীগ করতে এসেছেন, আমাকে কলেজ ত্যাগ করতে বলছেন! আগে নিজেরা দোকানদারী ছাড়ুন, তারপর আমাকে কলেজ ছাড়তে বলবেন ; তাহলে আজ আমি কতইনা ক্ষতিগ্রস্ত থাকতাম। আজ যে বিভিন্ন সমাবেশে কথা বলতে পারছি, এই সৌভাগ্য তাহলে হতো না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের গুণগান গাওয়া আমার নসীবে হতো না। আমি থাকতাম ক্লিনিকে। দেরাজ খোলা থাকত। সেখানে অঢেল টাকা-পয়সা আমদানী হতে থাকত। ভুল-শুদ্ধ নানা রকমের ব্যবস্থাপত্র দিতে থাকতাম। যে ডাক্তার এক বসায় শত রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়, তার পক্ষে ভুল ব্যবস্থাপত্র না দিয়ে উপায় কি? ভালভাবে দশ-পনেরটি রোগী দেখার পরই তো একজন ডাক্তারের ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু পয়সার লোভ তাকে টেবিলে বসিয়ে রাখে। আর ক্লান্ত ডাক্তার রোগীকে ভুল চিকিৎসা দিতে থাকে।

যাহোক, আমার দ্বীনী পড়াশোনা আল্লাহ্ পাক কবুল করেছেন কি না তা কেবল মৃত্যুর পরেই জানা যাবে। মৃত্যুর পূর্বে কারো পক্ষেই কবুল হওয়ার দাবী করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার আমল কবুল হোক বা না হোক, দাওয়াত ও তাবলীগের বদৌলতে আখেরাতে আমি অনেক আমলের বিনিময় পেয়ে যাবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

প্রথমে নিজে ঠিক হতে হবে, আত্মশুদ্ধির চরম পারাকাষ্ঠা অর্জন করতে হবে, তারপর অন্যকে ঠিক হওয়ার কথা বলা যাবে, এটা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। ভালোত্বর সীমা কীভাবে নির্ধারণ করবেন ? 'আমি আত্মশুদ্ধির চূড়ান্তে উপনীত হয়েছি'—এই উক্তি কি কখনো করা সম্ভব ? এটা তো পেট ব্যাথা নয় যে, টেবলেট খেলেন আর 'ভালো হয়ে গেল। তারপর কোমর বেঁধে অন্যের পেট ব্যথা নিরাময়ে নেমে পড়বেন! বাতেন বা আত্মার শুদ্ধির বিষয়টি এত সহজ নয়। আত্মার শুদ্ধি বা সুস্থতার চূড়ান্ত কোন সীমা নির্ধারণ করা অসম্ভব। কারো পক্ষে একথা বলা সম্ভব নয় যে, 'আমার আত্মশুদ্ধি হয়ে গিয়েছে, এবার অন্যদের

শুদ্ধি অভিযানে অবতীর্ণ হবো'। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির পূর্ণতার দাবী করবে, তার চেয়ে বড় অসুস্থ আত্মার অধিকারী আর কেউ নয়। আত্মশুদ্ধির দাবী করা শয়তানের স্বভাব।

হযরত আলী (রাযি.)-এর ন্যায় বড় বুযুর্গ তো আর কেউ হতে পারে না। কারণ স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, জান্নাতে তোমার ঘর হবে আমার ঘরের সামনে। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন আল্লাহ্‌র দরবারে হযরত আলী (রাযি.) ফরিয়াদ করে বলতেন—'আয় আমার মাওলা! সামনে সফর অনেক দীর্ঘ, কিন্তু আমার আমলের সামানা অতি সামান্য। আমার কী উপায় হবে ?' যাকে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে তাঁর ঘরের সামনে ঘর হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনিই এমন কাতর ফরিয়াদ করতেন। আসলে যিনি যত বড় তিনি নিজেকে ততই অযোগ্য ও অধম মনে করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি যত অযোগ্য ও অধম, সে নিজেকে ততই যোগ্য ও নির্দোষ মনে করে।

আমল করা ও দাওয়াত দেয়া পূর্ণ মুসলমানের পরিচয়। একজন পূর্ণ মুসলমান দাওয়াতও দিবে, আমলও করবে। যে ব্যক্তি আমল করে কিন্তু দাওয়াত দেয় না, সে অসম্পূর্ণ মুসলমান। মূর্খ পিতা তার ছেলেকে পড়াশোনার কথা বলতে পারবে না, এ কেমন কথা! শরাবী পিতা যদি তার সন্তানকে বলে, 'আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাই ছাড়তে পারছি না, কিন্তু খবরদার! তোমরা এর ধারেকাছেও যাবে না', তা কি অসঙ্গত হবে? তার উত্তরে ছেলে যদি বলে, আব্বাজান! আগে নিজে ত্যাগ করুন, তারপর আমাদেরকে বলবেন। সন্তানের এই উত্তরই বা আপনাদের কাছে কতটা সঙ্গত মনে হয়? আসলে কোরআনের বক্তব্য لم تقولون ما لا تفعلون যে কাজ তোমরা কর না, তার কথা কেন বল, এবং كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون যা তোমরা কর না সে কথা বলা আল্লাহ্ পাকের নিকট অনেক বড় গুণাহ্'—এই আয়াত দু'টি দ্বারা এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত লোক ভেবেছে যে, নিজে আমল না করলে তবলীগও করা যায় না।

আপনার বিবেক ও চিন্তাশক্তি থেকে একটু সাহায্য গ্রহণ করুন। বেনামাযী পিতা যদি তার সন্তানকে নামায পড়তে বলে, তা কি কবীরা গুণাহ্ হবে? অবশ্যই নয়। মূর্খ পিতা যদি তার পুত্রকে পড়ালেখা করতে বলে, তাও কি কবীরা গুণাহ্ হবে? মোটেও না। কোন লাচার মদ্যপ তার বন্ধু-বান্ধবকে মদ্যপান করতে নিষেধ করলে কি কবীরা গুণাহ্ হবে? না। কিন্তু সেই বিশেষ শ্রেণীর লোকদের বক্তব্য অনুযায়ী তো কোরআন এজাতীয় আমলহীন দায়ীর দাওয়াতের আমলকে কবীরা গুণাহ্ বলে সাব্যস্ত করেছে। কোনটাকে আমরা

ঠিক বলবো? কোরআন তো কিছুতেই ভুল হতে পারে না। ভুল আমাদের বুঝের। আরবী ভাষার বাগধারা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে আয়াতের শাব্দিক অর্থ দ্বারা আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি।

প্রতিটি ভাষার নিজস্ব কিছু বাগধারা রয়েছে। 'দানশীল ব্যক্তির সম্পদ দ্বারা সকলে উপকৃত হয়'—একথাটি প্রকাশের জন্য উর্দূ ভাষায় বলা হয় 'হাথী কে পাওঁ মেঁ সবকা পাওঁ'। যারা উর্দূ ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ নয়, এমন ভিনদেশী কেউ এই বাক্যটি শুনে আশপাশে হাতি খুঁজতে আরম্ভ করা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, তারা উর্দূভাষী না হওয়ায় এবং সে ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হওয়ার কারণে এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি। আমরা যেমন আরবী বুঝি না, তাদের পক্ষেও তেমনি এই বাক্যটির সঠিক অর্থ বুঝতে না পারা অসম্ভব নয়। আমি তো মাদরাসার ছেলেদের সম্পর্কে বলে থাকি যে, তাদের অধিকাংশেরই আরবীর অবস্থা এক পাঠানের উর্দূর মত। ঘটনাটি যেহেতু এক পাঠানের, সে কারণেই পাঠানের কথা বলা। অন্যথায় পাঠান আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এখানে পাঠান কেউ থাকলে অসন্তুষ্ট হবেন না।

এক পাঠান মিরযা মাযহার জানজানাঁ (রহ.)-এর নিকট মুরীদ হল। লোকটি দিল্লীতে থাকত। ফলে কিছু উর্দূ সে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল। একদিন লোকটি হযরতের মজলিশে বসা ছিল। হযরত তাকে বললেন, খান সাহেব! পানির সোরাহিটি নিয়ে আসুন। খান সাহেব হযরতের আদেশ পালন করার জন্য ওঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের মনে হলো, লোকটি না আবার সোরাহিটি ভেঙ্গে ফেলে। শুধু মুখের কাছে ধরে টেনে তুললে সোরাহিটির নীচের অংশ ভেঙ্গে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাই তার নীচেও একটি হাত রাখা উচিত। ফলে হযরত পিছন থেকে খান সাহেবকে ডেকে বললেন, 'খান সাহেব! পেট ধরে ওঠাবেন।' দিল্লীর ভাষায় সোরাহীর নিম্নাংশকে 'পেট' বলা হত। কিন্তু সে অর্থ খান সাহেব বুঝতে পারলেন না। তিনি নিজের পেটে এক হাত রেখে আরেক হাত দিয়ে কলস ওঠালেন।

আমাদের ক্ষেত্রে আরবীর বিষয়টিও ঠিক তেমনি। বাগধারা, স্থান-কাল-পাত্র—ইত্যাদি বিষয়গুলো কথার অর্থকে অনেক পরিবর্তন করে দেয়। দেখুন 'কিয়া বাত হায়'—এই একটি বাক্যের অর্থ তিনটি। এই বাক্যটি দিয়ে প্রশ্ন যেমন করা যায়, তেমনি উত্তরও দেয়া যায় এবং এই বাক্যটি বিবাদও প্রকাশ করে। কিন্তু কোন ভিনদেশীর পক্ষে বাক্যটির তিনটি অর্থ বুঝতে পারা কঠিন। কথার ভঙ্গি এবং সুরও যে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে, তা তিনি বুঝবেন কেমন করে ?

আমি আপনাদের সামনে অনেক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়ে কথা বলছি। খুব পিপাসা লাগছে। বার বার পানি পান করতে হচ্ছে। বসে পড়লে লোকজনকে দেখা যায় না। আর দাঁড়িয়েই বা পানি পান করি কেমন করে? কারণ, উপস্থিত লোকদের অধিকাংশেরই হয়তো এ সম্পর্কিত মাসআলাটি জানা নেই। কাজেই দাঁড়িয়ে পানি পান করলে আমার সম্পর্কে তাঁদের মনে একটি ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

দুই হাদীসের সামঞ্জস্য বিধান

হযরত আলী (রাযি.) একবার এভাবে দাঁড়িয়ে পানি পান করে বললেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখেছি। অন্য হাদীসে আছে, যদি দাঁড়িয়ে পানি পান করতে আরম্ভ কর, তাহলে সে পানির কুলি ফেলে দাও। বর্ণিত দু'টি হাদীসই সহীহ। আপাত বিরোধপূর্ণ হাদীস দু'টির সামঞ্জস্য বিধান কীভাবে হবে ? প্রথমোক্ত হাদীসটির উদ্দেশ্য হল, যখন এমন কোন পরিস্থিতি হয়, যেখানে পানি বসে পান করা কঠিন, এমন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পান করাই সুন্নত। তবে যেখানে বসে পান করার পক্ষে কোন বাঁধা না থাকে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পান করতে আরম্ভ করে থাকলে সে পানি মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বসে পান করাই কর্তব্য। কিন্তু আমি এখানে দাঁড়িয়ে পানি পান করলাম না একারণে যে, যেহেতু লোকজনের এ সম্পর্কিত মাসআলাটি জানা না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। তাই আমাকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখলে আমার সম্পর্কে তাদের মনে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

এক কথার তিন অর্থ

এখানে পানি চাওয়ার পর আমাকে কোন্ পাত্রে করে পানি দেয়া হয়েছে, আপনারা সকলেই তা দেখতে পেয়েছেন। তা ছিল একটি গ্লাস। এই পানিই যদি আমি মসজিদের ইস্তিঞ্জাখানার দরজায় দাঁড়িয়ে চেয়ে বলতাম, ভাই আমের! পানি নিয়ে এস। তখন আমাকে কোন্ পাত্রে করে পানি দেয়া হত ? গ্লাসে করে নয় নিশ্চয়ই। সেই পরিবেশ তাকে বদনা ভরে পানি আনতে বলত। আবার এই ব্যক্তিকেই যদি আমি গোসলখানার দরজায় দাঁড়িয়ে পানি আনতে বলি, তখন নিশ্চয়ই সে বালতি ভরে পানি আনবে। কথা তো আমার একটিই ছিল—'পানি নিয়ে এস'। কিন্তু পরিবেশ বা স্থানের বিভিন্নতার কারণে সে কথাটির অর্থই তিন রকম হয়েছে। কখনো গ্লাসে এসেছে, কখনো বদনায় এসেছে, কখনো এসেছে বালতি ভরে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, স্থান পরিবর্তনের কারণে শব্দের ভাববোধক অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। বাচন ভঙ্গিও শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে দেয়। 'কিয়া বাত হায়, কিয়া বাত হায়, কিয়া বাত হায়', বাচনভঙ্গিও এই কথাটির তিন রকম অর্থ করতে পারে। কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে, আমরা কোরআনের বাচনভঙ্গি বুঝতে পারি নি। শুধু শাব্দিক অর্থ দিয়ে কোরআনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যায় না। তার জন্য আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। এখন মনোযোগ দিয়ে সেই আয়াতটির অর্থ শুনুন।

لم تقولون কেন বল, ما لا تفعلون যা তোমরা করো না। অর্থাৎ, যে কাজ কর নাই, তা করার দাবী কেন করো ? পড় নাই তো ফজর নামাযও, কিন্তু দাবী করছো গোটা রাত তাহাজ্জুদ পড়ে কাটিয়েছ বলে। لم تقولون ما لا تفعلون যে কাজ করো নাই, সে কাজ করার মিথ্যা দাবী কেন করছো ? كبر مقتا বড় জঘন্য পাপ, ان تقولوا যে কাজ তোমরা কর নাই, তা করেছো বলে লোকজনের কাছে বলে বেড়ানো। এভাবে মিথ্যা বলা কবীরা গুণাহ্।

আয়াতের সঠিক অর্থটি এবার নিশ্চয় আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি দান করে না কানা পয়সাও, সে যদি বলে বেড়ায় 'পাই পাই হিসাব করে যাকাত আদায় করে দিয়েছে'—এ মিথ্যাচার জঘন্য পাপ। আয়াতে সেকথাই বলা হয়েছে। আমরা যেমন বুঝেছি—নিজে নেক কাজ না করলে, অন্যকেও নেক কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করা যাবে না'—এ অর্থ মোটেও নয়। আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই একথা বলেন নি যে, তোমরা কেন নসীহত করছো ? কেন লোকজনকে দ্বীনের দাওয়াত দাও ? যে নেক কাজ নিজেরা করো না, সে নেকের দাওয়াত কেন অন্যকে দিতে যাও ?

তবলীগ করা ফরয

কাজেই মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! তবলীগ তথা দাওয়াতী কাজ এই উম্মতের সকলের উপরই ফরয। তিনি চাই আমলদার হোন বা বেআমল হোন, আলেম হোন বা জাহেল হোন, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ যে-ই হোন না কেন ? এটাই আমাদের দাওয়াত। এ উদ্দেশ্যেই আমরা মানুষকে ডেকে থাকি। তাদেরকে এই বলে মিনতি করি যে, আসুন, আমরা সকলে মিলে তওবা করি এবং আজকের পর আল্লাহ্ পাক অসন্তুষ্ট হন, এমন কাজ থেকে বিরত থাকি। আর তিনি যে পথে সন্তুষ্ট হন সেই মুহাম্মদী পথ অনুসরণ করে চলি। আর এই দাওয়াত পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা দুনিয়ায় পৌছে দেই।

এই দাওয়াত যদি তবলীগ জমাতের নিজস্ব কোন প্রোগ্রাম হত, তাহলে

আল্লাহর কসম! আমি এ কাজের জন্য এক মিনিট সময়ও দিতাম না। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের লাখো শোকর যে, তিনি আমাকে সমজ দান করেছেন। এ কথাগুলো আমার কথা নয়। আমি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব না হতে পারি, কিন্তু আমার কথাগুলো আপনারা যাচাই করে দেখুন—একথাগুলো কার কথা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? এই মহান কাজের গ্রহণযোগ্যতা মোটেও আমার ব্যক্তিত্ব বা তবলীগওয়ালাদের বিচারে নয়।

আপনার পার্সেল যদি কোন চর্মকার নিয়ে আসে, আপনি কি তা এই বলে ফেরত দিবেন যে, তুমি চামার, নিচু জাত ; তোমার হাত থেকে পার্সেল আমি গ্রহণ করতে পারি না। পার্সেল বহনকারী চামার কি কামার, তা দিয়ে আপনার কি আসে যায়। আপনি পার্সেল দেখুন, তা আপনার কি না যাচাই করুন। আপনার হলে নিয়ে নিন, না হলে ফেরত দিন।

আমি একজন মানুষ। ভালমন্দ, দোষগুণ সব মিলিয়েই আমার অস্তিত্ব। আমাকে পরখ করলে, সন্দেহ নেই, আমার মধ্যে অনেক ত্রুটিই আপনারা দেখতে পাবেন। দোহাই আপনাদের, আমার গ্রহণযোগ্যতার বিচারে আপনারা তবলীগের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপ করবেন না। কারণ, হতে পারে কালই আপনার কাছে আমার অনেক ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন আপনি বলবেন, 'হাঁ, দেখেছি তবলীগওয়ালাদের অবস্থা'।

আমি যা বলছি, এগুলো কোরআন হাদীসের কথা। শুধু আপনাদের সামনে প্রকাশের জন্য আমার যবান ব্যবহৃত হচ্ছে। আমার ভূমিকা একজন ডাক পিয়নের চেয়ে বেশী নয়। পিয়নের নোংরা অবস্থা সত্ত্বেও যখন তার হাত থেকে পার্সেল গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হয় না, তাই আমার গুণাহ সত্ত্বেও আপনারা তবলীগের মহান কাজের প্রতি বিরাগভাজন হবেন না। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মানবিক দুর্বলতার দায়ভার দাওয়াতের মহান কাজের প্রতি চাপাবেন না। কোন নামাযীর বদ-আখলাকী দেখে আমরা নিশ্চয়ই নামায ত্যাগ করি না। কোন রোযাদারের বদ-আখলাকী দেখেও আমরা রোযা ছেড়ে দেই না। কোন কোরআন তেলাওয়াতকারীর বদ-আখলাকী দেখে আমরা কোরআন তেলাওয়াত ত্যাগ করি না। কাজেই আমার আখলাক ও আমলের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি যেন আপনাদের তবলীগ ত্যাগের কারণ না হয়। তবলীগ যদি আমার ঘরের জিনিস হয়, আমার নিজের উদ্ভাবন হয়, তাহলে আমার ব্যক্তিগত আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি তার অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু তবলীগ স্বয়ং আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ। একাজ আমার উপর যেমন ফরয, তেমনি আপনাদের উপরও ফরয। আমি যদি কোন মন্দ কাজ

করি, আপনারা এসে তা ঠিক করে দিন। আমার মন্দ অবস্থা দেখে আপনাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে যাওয়া তো সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

আমার মন্দ অবস্থা দেখে যদি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ত্যাগ করা না হয়, তাহলে তবলীগ ত্যাগ করার যৌক্তিকতা কী ? নামায যেমন আমার নির্দেশ ছিল না, তবলীগও তেমনি আমার নির্দেশ বা উদ্ভাবন নয়। আল্লাহ্ পাকের হুকুম হিসাবে নামায-রোযা যেমন সকলকেই আদায় করতে হয়, তেমনি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ হিসাবে তবলীগ করাও সকলের জন্যই অবশ্য-কর্তব্য।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের মতই একজন অতি সাধারণ মুসলমান। আমার চরিত্রে অসংখ্য ভুল-বিচ্যুতি যেমন আছে, তেমনি কিছু ভালো ও সদগুণ থাকাও বিচিত্র নয়। আমি দাওয়াত ও তবলীগের মত এক মহান কাজের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি কোনক্রমেই হতে পারি না। তবলীগের প্রকৃত মাপকাঠি হলো মহান রাব্বুল আলামীনের কিতাব, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এবং হযরত সাহাবায়ে কেরাম—যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে বলেছেন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'। আপনারা খুব বেশী হলে আমাকে এমন একজন পিয়ন মনে করতে পারেন, লোকজনের কাছে পার্সেল বিতরণ করে বেড়ানো যার কাজ। সকলকে তার পার্সেল বুঝিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে আমি প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র নিয়ে নিতে চাই। কাল কেয়ামতের দিন মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সেই স্বীকারপত্র পেশ করে বলবো, আয় আল্লাহ্! আমি আপনার বান্দাদের কাছে আপনার দ্বীনের কথা পৌছে দিয়েছিলাম। এই দেখুন তার প্রমাণ।

বস্তুতঃ আমার গ্রহণযোগ্যতার উপর তবলীগের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে না। তবলীগ তো দ্বীন বা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ। এই মহান কাজের জন্য আমি কীভাবে মাপকাঠি হতে পারি। কারো ব্যক্তিগত ভালোমন্দ দিয়ে আল্লাহ্র হুকুম পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ্ পাক আখেরী উম্মতকে এই তবলীগের কাজে শামিল করেছেন। মানব-সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর তার কানে আযান ও ইকামত দিয়ে তার নিকট এ বার্তাই পৌছে দেয়া হয় যে, তুমি তবলীগ জমাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছো। আল্লাহ্র বড়ত্বের আওয়াজ তোমার কানে যেমন পৌছানো হল, এই বড়ত্বের কথা তোমাকেও গোটা জগতে পৌছে দিতে হবে।

মোটকথা, কোন ব্যক্তির নিজস্ব ভাল-মন্দ বিবেচনা করে তবলীগ গ্রহণ বা বর্জন করার নীতি অগ্রহণযোগ্য। আমি আপনাদের সামনে যা পেশ করেছি, তা বিশুদ্ধ সনদের সাথে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এগুলো কোন কাব্য-কবিতা বা গল্প-উপন্যাস নয়; বরং কোরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ বাণী। তবে ব্যাখ্যা ও

বিস্তৃত আলোচনার অনুসঙ্গে কোন ভুল-বিচ্যুতির অনুপ্রবেশ ঘটে থাকতে পারে, সে কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু মূল বক্তব্য কোরআন ও হাদীসের, কোন পুথি-পুস্তকের নয়। আপনারা সেই কোরআন-হাদীস ও হযরত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে তবলীগের মহান কাজে অংশ গ্রহণ করুন। আমার ভূমিকা একজন পিয়নের চেয়ে বেশী কিছু নয়। স্বীকারপত্র দিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুন।

হতে পারে আবার কখনো ইসলামের পূর্বাকাশে সুবহে সাদিকের শুভ্ররেখা ফুটে ওঠবে। আবারো দ্বীনের স্নিগ্ধ সমীরণ দিকে দিকে বয়ে যাবে। আবারো জগতে এমন একটি সুসময় আসবে, যখন ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠবে। আজ আমি মাপকাঠি হবার যোগ্য নই ঠিক, কিন্তু আমার কথাগুলো মোটেও অগ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো মোহরযুক্ত পরিপোক্ত কথা। তওবা করা, আমল করা এবং আমলের দাওয়াত দেওয়া—এগুলোই মুসলমানদের প্রধানতম কর্তব্য।

যাকাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান

যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি যথেষ্ট মেহেরবানী করেছেন। আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত সম্পদ থেকেই শতকরা আড়াই টাকা তিনি গরীব-মিসকিনকে দিতে বলেছেন। যদি অর্ধেকই দিয়ে দিতে বলতেন, আমাদের কী করার ছিল ? কিন্তু মেহেরবান মাওলা আমাদের প্রতি দয়া করে মাত্র আড়াই শতাংশ দিতে বলেছেন। তাও একেবারে মুফ্ত নয় ; বরং একের বদলে তিনি যাকাত প্রদানকারীকে দশগুণ ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই মজলিশে যাকাত অনাদায়ী বিত্তবান যারা আছেন, তারা তওবা করুন এবং পিছনের যাকাতের হিসাব করে অল্প অল্প করে দিতে আরম্ভ করুন। আর ভবিষ্যতে নিয়মিত যাকাত আদায় করতে থাকুন।

ইংল্যান্ডের মেনচেষ্টার শহরে অর্ধবয়স্ক এক লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। লোকটি আমাদের সাথে তিনদিন সময় লাগিয়েছিলেন। তিনি তার বিগত সাতাইশ বছরের অনাদায়ী সমুদয় যাকাত একসঙ্গে পরিশোধ করে দিয়েছেন। লোকটি খুবই বিত্তবান ছিলেন। মহিলাদের মত তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রায় পনের-ষোল লাখ টাকার অংলকার ছিল।

শয়তান বলে, দানশীল যতই নাফরমান হোক না কেন, তাকে আমার ভারি অপছন্দ। আর বখীল যতই ইবাদতগুজার হোক না কেন, তাকে আমার ভাল লাগে। বখীল আমার বড়ই প্রিয় ব্যক্তি।

আল্লাহ্ পাক জান্নাতুল ফিরদাউস তৈরী করার পর তাকে বললেন, বল। জান্নাত বলল, 'ঈমানদারগণ কামিয়াব হয়ে গিয়েছে'। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, আমার ইয্যতের কসম! বখীল বা কৃপণ ব্যক্তিরা তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না।

যে ব্যক্তি যাকাতের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত কোন দান-খয়রাত করে না, সে বখীলও নয়, আবার দানশীলও নয়। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সে কৃপণতার স্তর অতিক্রম করতে পারে বটে, কিন্তু দানশীলতার স্তরে প্রবেশ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি যাকাতের পরিমাণের চেয়ে অধিক দান-খয়রাত করে, অভাবী মানুষের প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থা করে, তাকে দানশীল বলা যায়। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় দানশীল মহান রাব্বুল আলামীন। তারপর আমিই সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আজ মানুষের চরিত্র থেকে সেই দানের অভ্যাসই মিটে গেছে। নিজের খাহেশ পুরণের জন্য তো কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা যায়, কিন্তু আল্লাহ্র নামে দু'চার টাকা দান করতে হাত ওঠে না। আজ দুঃখী-দরিদ্র মানুষ বড়ই কষ্টে আছে। আরো আফসোসের কথা হলো যে, সেই দরিদ্র-দুঃখী লোকজন নিজেদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাকের কাছে প্রার্থনা করে না। মালদারদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও নাফরমান। মালদার নাফরমানদের তুলনায় দরিদ্র নাফরমানদের প্রতি আল্লাহ্ পাক বেশী অসন্তুষ্ট হন। কারণ, দরিদ্র ব্যক্তিরা কোন্ জিনিসের ধোঁকায় পরে সিজদা বিমুখ হয়ে থাকবে? তাদের তো বরং কাতর হয়ে সিজদায় পড়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'আ করা উচিত।

আমি আপনাদেরকে দরিদ্রতা দূরীকরণের একটি কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি— যে ব্যক্তি সর্বদা অজুর সঙ্গে থাকবে, আল্লাহ্ পাক তার দরিদ্রতা দূর করে দিবেন। একবার জনৈক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের দারিদ্রতার কথা পেশ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সর্বদা অযুর সঙ্গে থাকবে, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমার দরিদ্রতা দূর করে দিবেন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা দানের অভ্যাস গড়ে তুলুন। আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করুন এবং এমনভাবে ব্যয় করুন, যেন কেউ বুঝতেও না পারে যে, কাকে দেয়া হয়েছে এবং কে দিয়েছে। গোপনে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা আল্লাহ্র ক্রোধ দমন করে দেয় এবং জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দেয়। কাজেই শুধু বিল্ডিং বানানো আর নিত্য নতুন গাড়ী কেনার নেশার পিছনেই মেতে থাকবেন না। আপনার সম্পদ থেকে কিছু অংশ আল্লাহ্র রাস্তায়ও দান করুন। দান আল্লাহ্ পাক বড়ই পছন্দ করেন।

এক জমিদারের ঘটনা

আমাদের এখানে খুব দানশীল একজন জমিদার ছিল। লোকটি নিজের জন্য বছরে মাত্র এক জোড়া পোশাক তৈরী করত। একদিন কেউ একজন তাকে বলল, জনাব! আল্লাহ্ পাক আপনাকে এত সম্পদ দান করেছেন। নিজের জন্য অত্যন্ত দু'চার জোড়া পোশাকের ব্যবস্থা করুন। জবাবে তিনি বললেন, যদি নিজের জন্য বানাতে আরম্ভ করি, তাহলে দুঃখী-দরিদ্রদেরকে দেয়ার মন থাকবে না।

বাস্তবিকই, মানুষ যখন নিজের জন্য দুনিয়া সংগ্রহে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তর থেকে দান করার মানসিকতা লোপ পায়। কাজেই দানশীল মানসিকতার জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'আ করুন। ধনী-দরিদ্র যে-ই হোন না কেন, সাধ্য অনুযায়ী সকলেই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করুন। দৈনিক কিছু সময় কোরআন তিলাওয়াতের জন্য ওয়াক্ফ করুন। এতে দিল নরম হয় এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়। কিছু সময় আল্লাহ্ পাকের যিকিরের জন্য নির্দিষ্ট করুন। আর আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে শরীয়ত অনুযায়ী নিজের জীবন চালাতে চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ্ আমাদের এই কোশেশ, জীবন সাজিয়ে তোলার এই চেষ্টা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে, এবং অতীত জীবনের কমী-কোতাহীগুলো মাফের যরী'আ হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে আমলের তৌফীক দান করুন। আমীন।

—▣—

সুদের অভিশাপ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم - اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب و لهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور -

قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم الدنيا دار من لا دار لهُ ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له -

وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها -

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ!

এই দুনিয়া একটি বাজার সদৃশ। দুনিয়াতে যেমন ধান, গম ইত্যাদি পণ্য সামগ্রীর ছোট ছোট হাট বসে এবং সেই হাটে প্রতিনিয়ত বেচাকেনা হয়, প্রতিদিন মানুষের হাতে লাভ-ক্ষতির ফলাফল ওঠে আসে, তেমনি এই গোটা দুনিয়াটিও একটি বাজার। এখানে প্রতি মুহূর্তেই জীবনের বেচাকেনা চলছে। লাভ-ক্ষতির ব্যবসা চলছে। হাট-বাজারে যেমন কেউ টাকা দিয়ে ধান কিনছে আর কেউ ধান দিয়ে টাকা নিচ্ছে। তেমনি এই দুনিয়ার বাজারে কিছু লোক আছে যারা নিজের জান-মাল দিয়ে ঈমান কিনছে। আবার কিছু লোক আছে যারা জান-মালের বিনিময়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দিচ্ছে। জীবনের

বেচাকেনা অবিরাম চলছে। এভাবেই চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। কিছু লোক সবসময়ই ঈমানের বিনিময়ে নিজের জান-মাল বিক্রি করে দিতে থাকবে এবং ঈমানের জন্য নিজের সব কিছু কুরবান করে দিবে। আর কিছু লোক থাকবে যারা জান-মালের জন্য নিজের ঈমান বিক্রি করে দিতে দ্বিধা করবে না। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ীও তুচ্ছ ইয্যত-সম্মানের জন্য নিজের দ্বীন বিকিয়ে দিতে থাকবে। ক্ষণস্থায়ী লাভের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুমকে কুরবান করে দিবে। বাজারে এই দু'ধরনের বেচাকেনাই চলতে থাকবে। কোথাও ঈমান বিক্রি হতে থাকবে, আর কোথাওবা জান-মালের নয্‌রানা পেশ হতে থাকবে। আর সবার অলক্ষে থেকে মহান রাব্বুল আলামীন সকলকেই দেখছেন ও দেখতে থাকবেন। যে ব্যক্তি ঈমানের জন্য নিজের জান-মাল বিক্রি করে দিচ্ছে, তাকেও যেমন দেখছেন, তেমনি যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে ইয্যত কিনছে, তাকেও দেখছেন। সেই মহান জাতের নিদ্রা নেই, ঝিমুনি নেই, ক্লান্তি নেই, আলস্যও নেই। আর তিনি অক্ষমও নন। সেই সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজের দৃষ্টি থেকে যার্‌রা পরিমাণ কোন বস্তু গোপন থাকে না। একটি সরিষা দানার কোটি ভাগের এক ভাগও তাঁর কুদরতী দৃষ্টি, তাঁর অসীম ও অনন্ত জ্ঞানের সামনে দীপ্যমান থাকে। কেউ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিমাণ ভাল বা মন্দ করল, তারপর তা পাহাড়ের গহিন কোন কন্দরে বা আকাশের সীমাহীন প্রশস্ততায় হারিয়ে গেল, অথবা যমীনের অতল গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল, সেই আল্লাহ্ এমনই ক্ষমতাবান যে, তাও এনে উপস্থিত করবেন এবং কেয়ামতের দিন তা সেই ব্যক্তির সামনে হাজির করে বলবেন— إِقْرَأْ كِتَابَكَ পড়ে দেখ। দুনিয়াতে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য যা করেছিলে এই সেই আমলনামা।

সুদের অভিশাপ

'আল্লাহ্ পাক মানুষের ভাল-মন্দ সব কিছুই দেখতে পান'—দুনিয়ার মানুষের কাছে এ আওয়াজ কি পৌঁছায় নি? এ দেশের কোনো মানুষ কি তা অস্বীকার করতে পারবে? বিশ্বাস করুন, মহান রাব্বুল আলামীন এমনই ক্ষমতাবান ও সর্বদর্শী জাত যে, দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার আর দুনিয়ারূপী গোটা মানব-বাজারের প্রতিই তাঁর সমান দৃষ্টি রয়েছে। কে কি বিক্রি করছে আর কে কি ক্রয় করছে কিছুই তাঁর নিকট অপ্রকাশ্য নয়। তবে উভয়কেই তিনি ঢিল দিয়ে রেখেছেন। সুদের কারবারীর অর্থ-সম্পদও ধ্বংস করে দেন না, আবার হালাল কারবারীর অর্জিত সম্পদকেও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অঢেল করে দেন না। সুদের রুটি তিতাও হয় না, আবার হালাল রুটি মিঠাও হয়ে যায় না। সুদের

কারবারীর দোকান ক্রেতাশূন্য হয়ে পড়ে না। হালাল কারবারীর দোকানে ক্রেতার অস্বাভাবিক সমাবেশও ঘটে না। সুদের টাকায় কেনা পোশাক পরিধান করলে মানুষকে অসুন্দর দেখায় না। আবার হালাল টাকায় কেনা কাপড় পরিধান করে মানুষ অতি সুদর্শনও হয়ে ওঠে না। কিন্তু অলক্ষে এক মহান পর্যবেক্ষক রয়েছেন, যার কাছে দু'টি লোক আকাশ-পাতাল পার্থক্য নিয়ে প্রতিভাত হয়। সেই মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করছেন– افنجعل المسلمين كالمجرمين তোমাদের কি ধারণা, ফরমাঁবরদার আর নাফরমানকে আল্লাহ্ পাক একই পাল্লায় পরিমাপ করবেন? ما لكم كيف تحكمون তোমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার কী হলো? এমন কথা তোমরা কি করে ভাবতে পারলে?

এক ব্যক্তি অতিকষ্টে হালাল উপায়ে ন্যূনতম অণ্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করছে। আরেক ব্যক্তির সুদের কারবারে হু হু করে ব্যাংক-ব্যালেন্স ফুলেফেপে ওঠছে। বাড়ী-গাড়ী আর কলকারখানার অভাব নেই। এই দু'জনকে আল্লাহ্ পাক কী একই আসনে বসতে দিবেন? কেয়ামতের সেই বিচার দিবসে এই দু'জনের প্রতি কি রাব্বুল আলামীন একই আচরণ করবেন? হালাল অর্থে এক ব্যক্তি অসুস্থ সন্তানের জন্য ঔষধ সংগ্রহ করতে পারে না। আরেক ব্যক্তির হারাম পয়সায় তার ছেলে-মেয়েরা আমেরিকায় দেশ-ভ্রমনে যায়। তোমাদের কি ধারণা, আল্লাহ্র কানূন এই দু' ব্যক্তিকে এক পাল্লায় ওজন করবে? একজন রাত জেগে শরাব পান করছে, আর একজন জায়নামায বিছিয়ে চোখের অশ্রুতে যমীন সিক্ত করছে। এদের উভয়কে কি এক করে দিতে বলো? ما لكم كيف تحكمون এ কেমন বিবেচনা তোমাদের? না তোমাদের কাছে নতুন কোন কোরআন এসেছে, যাতে একথা লিখা রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট শরাবী আর তাহাজ্জুদগুজার বান্দা সমান অনুগ্রহের অধিকারী হবে? সুদখোর আর হালাল উপার্জনকারী, মিথ্যাবাদী আর সত্যবাদী, কোরআন শ্রবণকারী আর গাণ-পাগল মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না? এ কথা কোন্ কিতাবে লেখা আছে, এনে দেখাও তো দেখি? ام نجعل المتقين كالفجار পাপীষ্ঠ আর পূণ্যবানকে, নাফরমান আর ফরমাঁবরদারকে আমি একই প্রতিদান দিব ? মোটেও না। এই দুনিয়া ফয়সালার স্থান নয়, এখানে কাউকে প্রতিদান দেয়া হয় না। এই দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। কাজেই কারো বিত্ত-বৈভব আর কারো দীনহীন অবস্থা দেখে ধোঁকা খেও না। এখানে সত্য-মিথ্যা পাশাপাশি চলে। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে এগিয়ে যায়। কখনো সত্যের জয় হয়, কখনো মিথ্যাই প্রবল-প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলে। কিন্তু চূড়ান্ত ফয়সালা এখানে নয়। পাপ-পুণ্যের মিমাংসা এখানে হবে না। তার জন্য ভিন্ন এক জগত নির্দিষ্ট রয়েছে। যেদিন

ভালমন্দের মীমাংসা করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন স্বয়ং এসে উপস্থিত হবেন। ان يوم الفصل كان ميقاتا সেই দিনটি সুনির্দিষ্ট রয়েছে। সেই নির্দিষ্ট দিনে সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। গোটা জগতকে সেদিন মৃত্যু গ্রাস করে নিবে। এই আসমান ও যমীন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। নক্ষত্রসমূহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠবে। পর্বতশ্রেণী বালুকণায় পরিণত হবে। মোটকথা, সকলেই মৃত্যুবরণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র পাকের মহান অস্তিত্ব ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই নগরবাসীর শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উঁচুনীচু সকলেরই মৃত্যু ঘটবে। মহাপ্রলয় বা গোটা সৃষ্টিজগতের ধ্বংসলীলা দেখার জন্য সেদিন কেউ বেঁচে থাকবে না। শুধু বাতাসের প্রবল-প্রচণ্ড ঝড়ো শব্দ আর সবকিছু ভেঙ্গেচুড়ে পরার বিকট আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দই থাকবে না। না কোন সন্ত্রস্ত প্রাণীর আর্তচিৎকার, না কারো বেঁচে থাকার করুণ আকুতি।

তারপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক উপস্থিত হবেন। ফিরিশতাগণও দলে দলে এসে হাজির হবেন। জান্নাত-জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। দাড়ি-পাল্লা স্থাপন করা হবে। আমরা যে দাড়িপাল্লার সঙ্গে পরিচিত তা দিয়ে চাল-ডাল, ধান-গম ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়। কিন্তু কাল হাশরের ময়দানে স্থাপিত দাড়িপাল্লায় দুনিয়ার কোন স্থূল জিনিস মাপা হবে না। সে পাল্লায় মাপা হবে নামাযী-বেনামাযী, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী, যিনাকার, চরিত্রবান, সুদখোর-ঘুসখোর, হালাল উপার্জনকারী আর কাফির-মুমিনের ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য সকল আমল।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-এর আল্লাহ্‌ভীতি

একবার জনৈক ব্যক্তি সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-কে গালি দিলে তিনি বললেন, বেটা! আমার সামনে পুলসিরাত নামক এক কঠিন ঘাটি অপেক্ষা করছে। সে ঘাঁটি যদি আমি পার হয়ে যেতে পারি, তাহলে তোমার এ গালি দিয়ে আমার কিছু আসে যায় না। আর (আল্লাহ্ না করুন) যদি আমি আটকে গেলাম, তাহলে তুমি যা বললে, আমি তার চেয়েও অধম।

ইয্যত ও যিল্লতির মাপকাঠি

হযরত সালমান ফারেসী (রাযি.) ছিলেন ইরানের লোক। এ কারণে কোন কোন কোরায়শী আরব তার সঙ্গে ফখর করে বলত, 'আমরা কোরায়শী, আর তুমি হলে অনারব পারসী লোক। কাজেই মর্যাদায় তোমার চেয়ে আমরা যথেষ্ট

শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। জবাবে তিনি বলতেন, আমি তো ইরানীও নই, বরং এক ঘৃন্য পানির সৃষ্টি। অচিরেই আমার মৃত্যু হবে এবং তখন এই দেহ পচে-গলে মাটি হয়ে যাবে। তারপর আমার রবের সামনে আমাকে উপস্থিত করা হবে। সেদিন যদি আমার নেকীর পাল্লা ভাড়ি হয়, তাহলে আমার চেয়ে বড় সম্মানী আর কে আছে। আর (আল্লাহ্ না করুন) যদি আমার গুনাহের পাল্লা ভাড়ি হয়ে যায়, তাহলে আমার অসম্মানের কোন শেষ থাকবে না।

হাশর ও মিযান

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! কাল হাশরের ময়দানে মানুষের ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্য পরিমাপ করার জন্য একটি পাল্লা স্থাপন করা হবে। সেখানে সমস্ত মানুষের আমল উপস্থিত করা হবে। নেকী-বদী পাল্লায় তোলা হবে। আল্লাহ্ পাক উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করবেন—আমার বান্দারা! দুনিয়াতে তোমরা যার যা ইচ্ছা করেছ, আমি তোমাদেরকে কিছুই বলি নি। শুধু অলক্ষে থেকে তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ অবলোকন করেছি। আজ তোমাদের কথা বলার শক্তি লোপ করা হয়েছে। কথা আজ শুধু আমিই বলবো এবং তোমাদের আমলনামা প্রকাশ করে দিবো। ধনী-দরিদ্র, কুলীন-অকুলীন সকলেই তাদের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। দুনিয়াতে যে মন্দ করেছ, যে আমার নাফরমানী করেছ, সে চরম অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নেককার ছিলে, আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছ, আজ সে পরম সম্মানের অধিকারী হবে। খান্দানের সম্মান, সম্পদের সম্মান আর ক্ষমতার সম্মান দিয়ে এখানে সম্মানিত হওয়া যাবে না। হাশরে স্থাপিত পাল্লা মানুষের পার্থিব স্থূল সম্মান-অসম্মানকে পরিমাপ করে না। এ পাল্লা শুধু মানুষের নেকী-বদীর ওর্জনে তাদের সম্মানিত ও অসম্মানিত হবার ফয়সালা করে দিবে। সেই পাল্লার সামনে পরাক্রমশালী বিচারক মহান রাব্বুল আলামীন এবং গোটা মানব সমাজ উপস্থিত থাকবে। পাল্লায় মানুষের নেকী-বদী উত্তোলিত হতে থাকবে। যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, ফিরিশতাগণ তার সম্পর্কে ঘোষণা করে বলবেন—'অমুকের পুত্র অমুক বা অমুকের কন্যা অমুকের নেকীর পাল্লা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। সে তার বাজীতে হেরে গিয়েছে। আর কোন দিন তার কামিয়াব হবার সম্ভাবনা নেই।

সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে পরাজিত ব্যক্তি ফরিয়াদ জানিয়ে বলবে, আয় আল্লাহ্! আমার বদলে আমার সন্তানদেরকে পাকড়াও করুন। কারণ, তাদের জন্যই আমি হারাম কামাই করেছি। আপনার নাফরমানী করেছি। আমার স্ত্রীকে পাকড়াও করুন। তার পিছনে পড়েই আমি আপনার হুকুম অমান্য

করেছি। আমার আত্মীয়-স্বজনকে পাকড়াও করুন। গোটা জগদ্বাসীকে জাহান্নামে দিয়ে হলেও আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু তার সেই ফরিয়াদ রক্ষা করা হবে না। لا تزر وازرة وزر اخري সেদিন কেউই করো বোঝা বহন করবে না। করতে পারবেও না। কারণ, সেদিনটি হবে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি ও খোঁটার ফয়সালার দিন।

কারো পরাজয় ঘোষিত হবার পর ফিরিশতাগণ তার মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এক হেঁচকা টানে তার চোয়াল বের করে নিয়ে আসবেন এবং চোয়াল ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবেন। কোন নারীর পরাজয়ের ফয়সালা ঘোষিত হলে ফিরিশতাগণ তার কপালের চুলের গোছা চেপে ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে চরম ঠিকানার দিকে নিয়ে যাবেন। ফেরেশতাদের কাছে সে মিনতি জানিয়ে দয়া ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু ফিরিশতাগণ বলবেন, 'রহমান' যেখানে তোর উপর দয়া করেন নি, আমরা কিভাবে দয়া করবো ?

কেয়ামতের দিন যাদের পরাজয়ের কথা ঘোষিত হবে, সেই হতভাগারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। জাহান্নামের সাতটি স্তরের সবচেয়ে উপরের স্তরটির নাম হল 'জাহান্নাম', এবং সবচেয়ে নীচের স্তরটির নাম হল 'হাবিয়া'। সর্বনিম্ন এই স্তরটির আযাবই হবে সবচেয়ে ভয়াবহ। মুনাফিকরা হবে এই স্তরের অধিবাসী। তারপর পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ স্তর জাহান্নামের আযাব হবে তুলনামূলক সবচেয়ে লঘু। সেই লঘু স্তরের জাহান্নাম থেকে যদি একটি অঙ্গার এনে দুনিয়ায় রাখা হয়, তাহলে গোটা দুনিয়া পুরে ছাই হয়ে যাবে। জাহান্নামের শিকলের একটি কড়া এনে যদি দুনিয়াতে রাখা হয়, তাহলে তার ওজনে গোটা যমীন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। এ হল সবচেয়ে লঘু ও সবচেয়ে হাল্কা শাস্তির জাহান্নামের অবস্থা। এই জাহান্নামটি হল গুনাহ্গার মুসলমানদের জন্য—যারা কবীরা গুনাহ করে মৃত্যুবরণ করেছে, যারা বেনামাযী, মিথ্যাবাদী ও শরাবী ছিল। যারা দুনিয়াতে অহংকারে লিপ্ত ছিল। পরের ধন আত্মসাৎ করেছে। অন্যের জমিন যবরদখল করেছে। সুদ খেয়েছে। ঘুস গ্রহণ করেছে। মানুষের হক মেরে খেয়েছে। রোযা রাখে নি, ফরয হজ্ব ও যাকাত আদায় করে নি, এরাই হল জাহান্নামের এ স্তরের অধিবাসী। এদলের সর্বপ্রথম সদস্য হল স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যাকারী কাবিল, আর সর্বশেষ জাহান্নামী হল 'জুহাইনা'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে তার নাম হল, 'জুহাইনা'। তার কবীলার নামও জুহাইনা। আমি তাকে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে দেখছি। জাহান্নামের ক্রমধারার সর্বনিম্ন স্তর হল হাবিয়া। এ স্তরটি মুনাফিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট। এ স্তরের আযাবই হবে

সর্বাধিক ভয়াবহ। আল্লাহ্ পাক যখন জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করতে চান, তখন হাবিয়ার দরজাটি খুলে দেন। ফলে তা থেকে আগুনের ভয়াবহ শিখা বেরিয়ে আসতে থাকে এবং সেই অসহ্য উত্তাপে সমস্ত জাহান্নাম চিৎকার করে পানাহ্ চাইতে থাকে।

হযরত জিবরায়ীল (আ.) একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন যে তাঁর চেহারার রঙ ছিল বিবর্ণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি হয়েছে ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে উত্তপ্ত করে তুলেছেন। তার ভয়াবহ রূপ দেখে ভীত হয়ে আপনার নিকট ছুটে এসেছি। হযরত জিবরায়ীল (আ.) যে জাহান্নামে যাবেন না, একথা তাঁর অজানা নয়। তারপরও জাহান্নাম এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল যে, সে ভয়ে ভীত হয়ে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে ছুটে এসেছিলেন।

যে জাহান্নামের ভয়াবহতা দেখে হযরত জিবরায়ীল (আ.) পালিয়ে এসেছেন, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যে সকল নাফরমান মুসলমান তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে, আইনত তারা জাহান্নামে যাবে। তবে আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন। এই স্বাধীনতা ও ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তবে মহান রাব্বুল আলামীনের ফয়সালা সাধারণত মানুষের আমলের প্রেক্ষিতেই হয়ে থাকে। মানুষের ভাল-মন্দ আমলের উপরই নির্ভর করে তার আখেরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা। আসবাবের দুনিয়ায় মানুষের কর্ম ও বস্তুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রোগ নিরাময়ের জন্য মানুষ ঔষধ সেবন করে, চিকিৎসা-জ্ঞান অর্জন এবং চিকিৎসা সেবার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মাণ করে। সুস্থতা লাভের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু তারপরও সুস্থতালাভ নিশ্চিত নয়। কোন চিকিৎসা গ্রহণ ছাড়াই হয়ত একজন আশংকাজনক রোগী সুস্থ হয়ে ওঠছে। আবার যাবতীয় চিকিৎসা-সুবিধা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেকে সুস্থতা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষের সুস্থতা ও অসুস্থতা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তারপরও মানুষ তার সুস্থতা লাভের সমস্ত ভার আল্লাহ্ পাকের ভরসায় ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকত

হযরত আলী (রাযি.) শীতের দিনে পাতলা পোশাক পড়তেন আর গ্রীষ্মের খরতাপে যখন চারিদিক খাঁখাঁ করতে থাকে, সেই প্রচণ্ড গরমের দিনে পড়তেন

মোটা পোশাক। হযরত আবু ইয়ালা' (রাযি.)-এর পুত্র আব্দুর রহমান (রাযি.) একদিন পিতাকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের কেমন উল্টা কাজ—গরমের দিনে তিনি মোটা কাপড় পরে থাকেন, আর শীতের দিনে পড়েন পাতলা কাপড়। তখন ছেলেকে তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে এসে তোমাকে বলবো। পরে একসময় তিনি হযরত আলী (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আয় আমীরুল মুমিনীন! আপনার এই অস্বাভাবিক আচরণ সম্পর্কে লোকজনের মনে প্রশ্ন জেগেছে। বলুন এর রহস্য কি ? জবাবে হযরত আলী (রাযি.) বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে ছিলে ? আবু ইয়ালা (রাযি.) হাঁ সূচক জবাব দিলেন। হযরত আলী (রাযি.) বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেয়ার সময় এই বলে দু'আ করেছিলেন, اللهم فيه الحر والبرد আয় আল্লাহ্! তাকে শীত ও গরম থেকে হেফাযত করুন। সেদিন থেকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে আমার গরম লাগে না এবং শীতের কষ্টও আমি অনুভব করি না। আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে উসীলা বা উপকরণ ছাড়াই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। কাউকে শীত বা গরম থেকে রক্ষা করার জন্য কোট বা মোটা-পাতলা কাপড় তার প্রয়োজন হয় না। মানুষের অভ্যন্তরেই এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যা তার ভিতর থেকেই শীত-গরম দূর করে দেয়। হযরত আলী (রাযি.)-এর ক্ষেত্রে এ ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকত।

হযরত আলী (রাযি.)-এর ক্ষেত্রে যেই অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, সকলের ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ পাক তা ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু দুনিয়া আস্‌বাবের জগত। ব্যাপকভাবে মু'জেযা বা কারামত প্রকাশের স্থান নয়। কাজেই আমাকে আপনাকে আস্‌বাব গ্রহণ করেই চলতে হবে।

রাব্বুল আলামীনের নেয়ামত

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাক অবশ্যই যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন। কিন্তু আমরা আল্লাহ্ পাকের কানূনের অধীন। আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত নিয়ম হল, যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ করবে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে যাবে। আল্লাহ্ পাক বলেন—হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাকে রিযিক দান করেছি। তোমাকে কলকারখানা আর বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য দান করেছি। তোমাকে চোখ দিয়েছি দেখার জন্য, কান দিয়েছি শোনার জন্য, যবান দিয়েছি কথা বলার জন্য, পা দিয়েছি চলার, হাত দিয়েছি ধারণ করার জন্য, বুদ্ধি দিয়েছি চিন্তা করার জন্য। তোমার জন্য আমার অসংখ্য

নেয়ামতের জাল বিস্তৃত রয়েছে। আমার এই অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করার পরও তুমি আমাকে সিজদা করা থেকে বিমুখ হয়ে রইলে? এ তোমার কেমন দাসত্ব? যার কপাল সিজদা করতে অসম্মত সে আল্লাহ্ পাকের কেমন গোলাম!

সন্দেহ নেই আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন, এবং তাঁর কুদরত কোন নির্দিষ্ট নিয়মের কাছেও দায়বদ্ধ নয়। কিন্তু আমাদের পায়ে পড়ানো রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়মের ঐশী শৃঙ্খল। রাব্বুল আলামীনের ক্ষমা পেতে হলে আমাদেরকে তাঁর সামনে অবশ্যই আনুগত্যের মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে হবে। অবাধ্য পাপিষ্ঠের জন্য ক্ষমার কোন অবকাশ নেই।

এ দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। এখানে ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য সবই থাকবে। ফয়সালা হবে মৃত্যুর পর। ভাল-মন্দের পুরুস্কার ও পরিণতি পাওয়া যাবে পরকালে। অনেকের ঘরেই হয়ত কোরআন শরীফ গিলাফবন্দী অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখে না যে, এই কোরআন তার নিকট কী দাবী করছে এবং তার নিকট কেমন আচরণ কামনা করছে। ঘুম থেকে ওঠেই খবরের কাগজের পাতা খুলে বসতে ভুল হয় না। অথচ ভুলেও কোনদিন ঘরের কোণে সংরক্ষিত কোরআনটি খুলে দেখার ইচ্ছা হয় না। আর যারা কমবেশ তেলাওয়াত করেন, তারা শুধু শব্দই তেলাওয়াত করেন। এর মর্ম ও বাণী উপলব্ধির চেষ্টা করেন না। গোটা মানব জাতির ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যেসকল বিধানাবলী রয়েছে, তা যথাযথরূপে পালন ছাড়া যে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই, একথা ক্ষণিকের জন্যও হয়ত তাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে না।

এটা কতই না দুঃখের কথা যে, এই উম্মত কোরআনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও পরিচয়হীন হয়ে পড়েছে। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক যেখানে ঘোষণা দিয়েছেন 'তাকওয়া' ও 'পরহেজগারী' অবলম্বন করার জন্য এবং আল্লাহ্কে ভয় করে চলার জন্য, সেখানে আজকের সমাজের যেসকল মানুষ আখেরাত সম্পর্কে চরম উদাসীন হয়ে রয়েছে তাদের কী পরিণতি হতে পারে একবার তা ভেবে দেখুন! তারা কী করে লাভ করতে পারে হাশরের সেই পরম বিজয়ের ঘোষণা!

কাল হাশরের ময়দানে কারো বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে যখন বলা হবে–

فلان بن فلان قد ثقلت موازينه وسعى سعادة لا يسقها بعدها ابدا .

অমুকের পুত্র অমুক বিজয় লাভ করেছে। পরাজয় আর কখনো তাকে স্পর্শ করবে না। আজ থেকে সে এমন সম্মানের অধিকারী হয়ে গেল, যে সম্মান আর কখনো অসম্মানের আবর্তে পর্যুদস্ত হবে না। বিজয়ের ঘোষণাপ্রাপ্ত ঐসকল

ব্যক্তিরা কতই না সৌভাগ্যবান। তবে, এতে মোটেও সন্দেহ নেই যে, সেদিনের ঐ সম্মান ও অসম্মান অর্থ-বিত্ত বা পার্থিব প্রতিপত্তির বিচারে হবে না ; বরং তা হবে একান্তই মহান রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের বিচারে।

সেদিন বিজয়ের ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী ব্যক্তির দৈহিক গঠন হয়ে যাবে হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের ন্যায় ২৫ ফিট দীর্ঘ। চেহারায় ভেসে ওঠবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় কমনীয় সৌন্দর্য। কণ্ঠে আসবে হযরত দাউদ (আ.)-এর সুর লহরী। দেহে আসবে হযরত ঈসা (আ.)-এর উদ্দাম যৌবন। চরিত্রে লাভ করবে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-মাধুর্য। অবশেষে হয়ে ওঠবে সে শশ্রুহীন কমনীয় মুখচ্ছবীর অধিকারী জান্নাতী পোশাকে সজ্জিত এক রাজপুত্র।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন, 'হায়! আমার উম্মতের পুরুষরা যদি স্বর্ণালঙ্কার পরিধান না করতো'! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় স্বর্ণালঙ্কার পরিধানকারী পুরুষ নিশ্চয়ই ছিল না। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এমন একটা সময় আসবে, যখন তাঁর উম্মতের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের অনেকেই মেয়েদের ন্যায় হাতে আংটি আর গলায় চেইন পরিধান করবে।

যাহোক, আল্লাহ্ পাক তাঁর অনুগত বান্দাদের ডেকে বলবেন, ওহে আমার বান্দারা! যারা আমার হুকুম পালন করেছ, আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছো, আজ তোমাদেরকে জান্নাতী অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিত করবো।

আখেরাতের নেয়ামত

দুনিয়ার ঘরবাড়ী একদিন শেষ হয়ে যাবে। এই ঘরবাড়ী ছেড়ে একদিন সকলকেই আখেরাতের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। সেটাই মানুষের স্থায়ী নিবাস। আখেরাতের সেই বাড়ী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাড়ীর মত কাঠ-খড় আর ইট-বালুর তৈরী নয়। বরং তার একেকটি ইট হবে মুতি, ইয়াকুত ও যমররদের। আর সেই ইটের সঙ্গে ইট জুড়ে দেবার গারা হবে মিশকের। সেখানে ঘাস হবে জাফরানের। তার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে কলকল ছলছল রবে বয়ে যাবে নহরশ্রেণী। তার কোনটা হবে দুধের, কোনটা স্বচ্ছ পানির, কোনটা সুমিষ্ট মধুর আর কোনটা পবিত্র শরাবের। সুসজ্জিত জান্নাত চারিদিকে তার সৌন্দর্য্যের বিভা ছড়াতে থাকবে। তথাকার রূপবতী রমণীদেরকে মনে হতে থাকবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তাশ্রেণী। যারা দুনিয়াতে নিজের চরিত্রকে নিষ্কলুষ রেখেছে এবং দৃষ্টির হিফাযত করেছে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ডেকে বলবেন,

আস, আজ পুরস্কারস্বরূপ এ সব রমণীদের সঙ্গে তোমাদের বৈবাহিক বন্ধনের আয়োজন করে দিবো, যারা কথা বললে হৃদয়-তন্ত্রীতে রিনিঝিনি সুরঝঙ্কার বেজে ওঠে। যাদের দেহ মিশক, জাফরান ও কর্পূরের তৈরী। যাদের মুখাবয়ব মহান রাব্বুল আলামীনের নূরের তাজাল্লীতে উদ্ভাসিত। যাদের সৌন্দর্য এমনই মোহনীয় যে, যদি ইতিপূর্বে মৃত্যুর মৃত্যু ঘটে না যেত, তাহলে জান্নাতবাসীরা সেই রমণীদের সৌন্দর্য অবলোকন করে বুক ফেটে মারা যেত। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সেই অকল্পনীয় নাজ-নেয়ামতে পূর্ণ জান্নাত দেখিয়ে বলবেন, আজ থেকে এই ঘর-বাড়ী ও বাগবাগিচা তোমাদের। এখানেই তোমরা চিরকাল বসবাস করবে। কারো সাধ্য নেই তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দেবার। যারা দুনিয়ার সেই ধোঁকার জীবনকে এবং মাকড়সার জালের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর সেই ঘরবাড়ীকে স্থায়ী মনে করেছিলো, আজ তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হযরত আলী (রাযি.)-এর নসীহত

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! ঈমানের তাকাযা হলো আখেরাতের জন্য যদি দুনিয়া বিক্রি করে দিতে হয়, তা দাও। তবু আখেরাতকে কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিয়ো না। হযরত আলী (রাযি.) আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে আহত হবার পর মৃত্যু শয্যায় প্রিয় সন্তান হযরত ইমাম হাসান (রাযি.)-কে যে নসীহত করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন—'প্রিয় বৎস! সর্বদা আল্লাহ্র কথা ও ওয়াজ-নসীহত শোনে দিল জিন্দা রেখো।' এখানেও যারা উপস্থিত আছেন, এই দ্বীনের আলোচনা শোনার পূর্বে তাদের মনের অবস্থা ছিল একরকম। আর আধঘন্টা পর দ্বীনের কথা শোনে মনের সেই অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। এটা কেন হয়? এর রহস্য আর কিছুই নয়—মনোবৃক্ষ ঈমানের সামান্য পানির স্পর্শে তাজা হয়ে ওঠেছে।

যাহোক। হযরত আলী (রাযি.) প্রিয় পুত্রকে বললেন, বৎস! সর্বদা আল্লাহ্র কথা শোনতে থাকবে। এতে তোমার অন্তর প্রাণময় হবে। তোমার হৃদয়-বৃক্ষটি শ্যামল-সতেজ থাকবে। আর হিকমত ও আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী বাণী দ্বারা তাতে আলো সঞ্চার করো। দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা করে তা থেকে বিমুখ হয়ে তোমার হৃদয়কে মজবুত কর। আর মৃত্যুর কথা সর্বদা মনে রেখো। এই মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে মনের লাগামটি নিজের হাতের মুঠোয় এমন মজবুতভাবে ধারণ করে রেখো, যাতে তা মুহূর্তের জন্যও তোমার হাত ফসকে যাবার অবকাশ না পায়। অন্যথায় তা তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আর অতীতের ঐ সকল জাতির

ঘটনাগুলো নিজেকে শোনাতে থেকো, যাদেরকে নাফরমানির দরুন বিভিন্ন আযাব দিয়ে আল্লাহ্ পাক ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর সুযোগ হলে তাদের বাড়ীঘর ও জনপদের ধ্বংসাবশেষে বিচরণ করে নসীহত অর্জন করো।

এক কালে লাহোরের সুবিশাল মোঘল রাজপ্রাসাদের অধিবাসীরা হয়তো মনে করতো—তাদের এই রাজত্ব এবং বিলাশী জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণ চিরদিন তাদের অধিকারেই থাকবে। আজ সেই ভগ্ন, জীর্ণ প্রাসাদশ্রেণীর পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন—তোমার অধিবাসীরা আজ কোথায় ? সেই বিরান, জীর্ণ প্রাচীর আপনাকে ডেকে বলবে, তারা আমাদেরকে ছেড়ে বহু দূরে চলে গিয়েছে। প্রাসাদের কোমল-কমনীয় বিছানা ছেড়ে আজ তাহারা বিরান ও একাকিত্বের ঘর কবরে মাটির বিছানায় শোয়ে আছে।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, প্রিয় বৎস! একদিন তোমাকেও কবরের মাটির বিছানায় শয়ন করতে হবে। তোমার জীবনে যখনই দুনিয়া ও আখেরাতের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে, তখন অবশ্যই তুমি আখেরাত গ্রহণ করে দুনিয়াকে বর্জন করবে। কোনক্রমেই যেন আখেরাতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত না হয়। কারণ, দুনিয়া এক সময় তোমাকে ফাঁকি দিবেই। কাজেই আখেরাত বর্জন করে কখনো দুনিয়া গ্রহণ করতে যেয়ো না।

মিথ্যা বলে বেচাকিনি করা, সুদের উপর কলকারখানা করা আখেরাত বিক্রি করে দুনিয়া ক্রয় করারই নামান্তর। যারা জান্নাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করে তাদের বোকামী সত্যই চরম আক্ষেপজনক।

ছোট্ট একটি দোকান, সামান্য মাল-সামান। এর বিনিময়ে জান্নাত বিক্রি করে দেয়া ; সামান্য ক্ষমতার লোভ, মেম্বার-চেয়ারম্যান আর এমপি পদের বিনিময়ে জান্নাত বিক্রি করে দেয়া—এর চেয়ে বড় বোকামী আর কী হতে পারে ?

আখেরাতের মুসাফির

আমরা সকলেই আখেরাতের মুসাফির। এ দুনিয়া এভাবেই চলবে—ইয্যত-যিল্লত, জীবন-মরণ, জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা—কখনো এর কাছে কখনো ওর কাছে—এভাবেই চলতে থাকবে। আর চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আখেরাতে। দুনিয়ার পরাজয় প্রকৃত পরাজয় নয়। দুনিয়ার বিজয়ও তেমনি প্রকৃতি বিজয় নয়। নাহলে পরাজিত টিপু সুলতান কখনো সম্মানের এমন উচ্চাসন লাভ করতো না। সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত হয়েও সম্মানিত আর মির জাফর বিজয়ী হয়েও বিশ্বাস ঘাতকতার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ধিকৃত হতো না। তবে আশ্চর্য হলো—আমরা মীর জাফরী চরিত্রকে যতই ঘৃণা করি না কেন,

নিজের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সেই মীর জাফরী চরিত্রই আমাদের মাঝে ফুটে ওঠে। দুনিয়ার বাহ্যিক বিজয় ও ব্যর্থতা এক জিনিস, আর আমাদের প্রকৃত কামিয়াবী ও নাকামী ভিন্ন এক জিনিস। এই দুনিয়া পরীক্ষার স্থান। তাই সতর্কতার সঙ্গে দুনিয়া পরিহার করে চলাই আমাদের কর্তব্য।

দুই পয়গম্বরের ঘটনা

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) ও হযরত যাকারিয়্যা (আ.) এই দুই নবী ছিলেন সম্পর্কে পিতা-পুত্র। সোয়া লক্ষ আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্য হতে বিশেষ সম্মানের অধিকারী মাত্র পঁচিশ জনের নাম পবিত্র কালামুল্লাহ্য় উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পঁচিশ জনের মধ্যে এই পিতা-পুত্র ছিলেন অন্যতম। গোটা কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানেই তাঁদের আলোচনা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট যাদের এত সম্মান, তাঁদের পার্থিব জীবনটা কেমন কেটেছে শুনুন—ইহুদীরা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর দেহ থেকে পবিত্র মাথা বিচ্ছিন্ন করে নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছিল। এতে কি হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলেন? মোটেও নয়। আপাত দৃষ্টিতে হয়ত তার পরাজয় ছিল, কিন্তু ব্যর্থতা কোনোভাবেই নয়। তাছাড়া তাকে শহীদ করে দিয়ে ইহুদীরাও কামিয়াব হয়ে যায় নি। অনুরূপভাবে পিতা হযরত যাকারিয়্যা (আ.)-ও ইহুদী কর্তৃক অনুরূপ নির্মমতার শিকার হয়েছিলেন। কাঠ চেঁড়াইয়ের মত মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁকে দু' টুকরো করে দেয়া হয়েছিল। এমন নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করার পরও তিনি মোটেও ব্যর্থ হয়ে যান নি।

কামিয়াবী লাভের জন্য পরীক্ষা আবশ্যক

অহোদ যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাময়িক পরাজয় হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে তিনি কি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলেন ? মোটেও না। আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাকে সুখ দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, তেমনি দুঃখ দিয়েও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—

الم ۞ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ۞

মানুষ কি ভেবেছে যে, তারা ঈমানের দাবী করার পর (সে দাবীর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য) তাদের কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না ? —*সূরা আনকাবূত ১-২*

তাদের কি ধারণা—জান্নাত এতটাই সস্তা যে, কোন পরীক্ষা না দিয়েই তারা তা লাভ করবে ?

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম কর নি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট।—*সূরা বাকারা ২১৪*

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়াতে অর্থ-বিত্ত অর্জন যেমন কামিয়াবীর আলামত নয়, তেমনি সঞ্চিত অর্থ বিলুপ্ত হওয়াও নাকামীর লক্ষণ নয়। বিজয়-কেতন উড়াতে পারা যেমন সাফল্য নয়, তেমনি পরাজয়ের গ্লানিও ব্যর্থতার বার্তা বহন করে না। মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিবেচিত হয় মূলতঃ আখেরাতের কামিয়াবী ও নাকামীর ভিত্তিতে।

ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাযি.)-এর ফযীলত

হযরত হোসাইন (রাযি.)-কে যখন শহীদ করা হয়, পৃথিবীতে তখন তাঁর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আর কেউ ছিল না। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর শরাফত ও গুণ-বিবরণী দেবার পক্ষে মানুষের মুখের ভাষা যথেষ্ট নয়। তিনি এমনই মহান সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর গোটা শৈশব কেটেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকে-পিঠে। তাঁর গন্ডদ্বয় ও ওষ্ঠযুগলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিভের স্বাদ গ্রহণ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছিলেন।

ক্ষুধার তাড়নায় দু' ভাই যখন কাঁদতে থাকতেন, আম্মাজান হযরত ফাতেমা (রাযি.) ভ্রাত্রিদ্বয়কে নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতেন—'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘরে আহার্য বলতে কিছুই নেই। এমনকি এ দু'টির মুখে দেবার মত এক টুকরো শুকনো রুটিও নেই।' তখন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় ভাইকে কোলে নিয়ে তাকে নিজের পবিত্র জিহ্বাটি চুষতে দিতেন। নবীজীর জিহ্বা চুষেই তাঁর ক্ষুধা নিবারিত হত। তারপর ছোট ভাইকে কোলে নিতেন এবং তাঁকেও নিজের জিহ্বাটি চুষতে দিতেন। এভাবে অনাহার-ক্লিষ্ট দু' ভাইয়ের ক্ষুধা নিবারিত হয়েছে বহুবার।

দৈহিক গঠনেও এ দু' ভাই ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত হাসান (রাযি.)-এর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর কোমর থেকে নিম্নাংশে ছিল পিতা হযরত আলী (রাযি.)-এর দেহাবয়বের ছায়া। পক্ষান্তরে হযরত হোসাইন (রাযি.) ছিলেন তার বিপরীত। তাঁর কোমর থেকে উর্ধ্বাংশ ছিল পিতা হযরত আলী (রাযি.) এর অনুরূপ, আর নিম্নাংশ ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

এমন সুউচ্চ যাঁদের মর্যাদা, তাঁরাও তো তীর-তরবারী আর বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁদের এই পরাজয় কেন হয়েছিল? কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ্‌র সাহায্যের অভাবে', তাহলে তার কথার অপরিহার্য ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ইয়াযীদ ও সীমারের পক্ষে ছিল। যেই মহান ব্যক্তির গোটা শৈশব কেটেছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে-কাঁখে, যাঁর জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে ছিল অপার স্নেহ-ভালবাসা, আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য না করে করলেন এক ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে, একথা যে বলে, তাকে চরম মূর্খ ছাড়া আর কী বলা যায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার চার হাত-পায়ের উপর ভর দিয়ে দু' ভাইকে কাঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খেলা করছিলেন। তা দেখে হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, দু' ভাই যে সওয়ারির উপর আরোহণ করেছে, কতই না উত্তম সে সওয়ারি। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, نعم الركبان আরোহীদ্বয়ও কম উত্তম নয়।

হযরত ফাতেমা (রাযি.) একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ছেলেদেরকে কিছু দান করুন'। প্রিয় কন্যার আবেদনের প্রেক্ষিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজের ওয়ারাসাত দান করলেন। সে মিরাস স্থূল বিষয়-সম্পদ বা টাকা-কড়ি ছিল না। তাঁদের গোটা জীবন তো বরং অর্থ-সম্পদের অভাবে অনাহার-ক্লিষ্ট অবস্থাতেই কেটেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' ভাইকে যে মিরাস দান করেছিলেন, তা ছিল পার্থিব স্থূলতার বহু উর্ধ্বে এক নূরানী বিষয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হাসানকে আমি আমার নেতৃত্ব গুণ ও প্রভাব দান করলাম। আর হোসাইনকে দিলাম আমার বীরত্ব ও দানশীলতা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই উত্তরসূরীর মাঝে ওরাসাত বণ্টন করেছিলেন এভাবেই।

এই ছিল যাঁর মর্যাদা, তিনি এমন এক ব্যক্তির হাতে শাহাদত বরণ

করলেন, যাকে মানুষ বলাও মানবজাতির জন্য কলঙ্কজনক। এই দুনিয়া যদি ফয়সালার স্থান হতো, তাহলে হযরত হোসাইন (রাযি.) কিছুতেই ইয়াযীদের হাতে শাহাদত বরণ করতেন না, এবং ইয়াযীদ ও ইবনে যিয়াদও ক্ষমতার মসনদে উপবেশন করতে পারতো না।

চরম ধৃষ্টতা

ইবনে যিয়াদের হাতে যষ্ঠি। তার সামনে রক্ষিত পাত্রে হযরত ইমাম হোসাইন (রাযি.)-এর কর্তিত রক্তমাখা মস্তক। ইবনে যিয়াদ তার হাতের যষ্ঠি দিয়ে ইমাম হোসাইন (রাযি.)-এর ওষ্ঠে আঘাত করছিল। তার এই চরম ধৃষ্টতার পরও যমীন ফেটে গিয়ে তাকে ধ্বসিয়ে দেয় নি, বা আকাশও ভেঙ্গে পড়ে নি তার মাথার উপর। কারণ, এই দুনিয়া ফয়সালার স্থান নয়, এটা পরীক্ষাগার।

ইমাম হযরত ইবনে সিনান (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যিয়াদের এই ধৃষ্টতা দেখে অস্থির হয়ে ওঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, (নরাধম!) তোমার ছড়িটি সরিয়ে নাও। আমি এই ওষ্ঠ দু'টিকে সহস্রবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক ওষ্ঠদ্বয়কে স্পর্শ করতে দেখেছি।

সেই তিনি কিছু পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রের ফলে শহীদ হয়েছেন। তাঁর মোবারক দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে যমীনের বিভিন্ন স্থানে লাঞ্ছনা ও বেহুরমতীর শিকার হয়েছে। এমনকি তাঁর সেই বিখণ্ডিত দেহ এক কবরে দাফন হওয়ারও সুযোগ পায় নি। নরাধম শত্রুরা তাঁর কর্তিত মস্তক বর্শায় গেঁথে উল্লাশ করেছে। এত কিছুর পরও আমরা কি একথা মনে করি যে, তিনি জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন, বা ইয়াযীদ ও শীমার কামিয়াব হয়েছে ? মোটেও না। তারা ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে থাকলেও নিজেদের গলায় লা'নতের এমন তওক পরিধান করেছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত খুলবে না।

কিন্তু আমাদের অবস্থা এমনই দুঃখজনক যে, ইমাম হাসান ও হোসাইন (রাযি.)-এর প্রতি আমাদের ভালবাসা শুধু তাদের চরিতালোচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তার প্রতি আমাদের অবহেলার শেষ নেই। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করার কথা আমরা চিন্তাও করে দেখি না। আমরা সুদ-ঘুস ত্যাগ করতে পারি না, মিথ্যা পরিহার করতে পারি না। এ কেমন ভালবাসা!

শেষ বিচারের দিন

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! সন্দেহ নেই যে, মানুষের ভালমন্দ কর্মের বিচার

হবে মৃত্যুর পর। দুনিয়াতে মুসলিম-মুশরিক ও ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলের প্রতিই আল্লাহ্ পাকের দানের বারি বর্ষিত হয়ে থাকে। এখানে প্রাপ্তির পথে কারো আমল খুব একটা প্রভাব ফেলে না। আল্লাহ্ পাকের ঘোরতর দুশমনও লাভ করতে পারে অঢেল বৈভব। আর তাঁর একজন খাঁটি বান্দাও ভোগ করতে পারে চরম দরিদ্রতার অসহ্য কষ্ট। মানুষের প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার হবে মৃত্যুর পর, এবং সেই সাফল্য ব্যর্থতা বিবেচিত হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের ভিত্তিতে। কাজেই আসুন, আমরা তওবা করি। আজ পর্যন্ত জীবনে আমরা যে আদর্শের অনুসারী ছিলাম, যেভাবে আমরা জীবন কাটিয়েছি, রাব্বুল আলামীনের কাছে এর কী কৈফিয়ত দিবার আছে ?

ইমাম হোসাইন (রাযি.)-এর শাহাদতের পূর্বাভাস

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-কে বললেন, আমি কিছুক্ষণ গৃহাভ্যন্তরে নির্জনে থাকতে চাই। আমার নিকট এখন একজন বিশেষ ফিরিশ্‌তা আসবেন। ভিতরে যেন কেউ না আসে। দরজা বন্ধ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে আর হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন পাহারায়। এমন সময় হযরত হোসাইন (রাযি.) খেলতে খেলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং জোড় করে তিনি ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) চঞ্চল শিশুর সাথে পেরে ওঠলেন না। হযরত হোসাইন (রাযি.) হাত ফসকে ছুটে ভিতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ভিতর থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল। হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি ছুটে ভিতরে গেলেন। দেখলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হোসাইন (রাযি.)-কে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে সশব্দ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) নিবেদন করলেন, আয় আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান! বলুন আপনার কি হয়েছে? কেন কাঁদছেন আপনি? জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে যেই বিশেষ ফিরিশতা এসেছিলেন, তিনি বলে গেলেন, আমার এই বাচ্চাকে আমার উম্মত শহীদ করে দিবে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন যদি তাঁর হাত দু'টি রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে তুলে দিতেন, তাহলে হয়তো সেই পাপিষ্ঠদের জন্মই হতো না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অল্পে-তুষ্টি

উম্মতকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবনে বিবিধ কষ্ট বরণ করে নিয়েছিলেন। অনাহারের কষ্ট ভোগ করেছেন, পেটে পাথর বেঁধেছেন। চরম দরিদ্রতার মধ্যে দিন যাপন করেছেন। যাতে উম্মতের কেউ দরিদ্রতার অভিযোগ করে দ্বীন থেকে সরে যেতে না পারে। কাল কেয়ামতের দিন যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দরিদ্রতাকে এবং পেটে বাঁধা সেই পাথরটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন, তখন সুদ-ঘুস ও যাবতীয় অবৈধ উপার্জন সম্পর্কে আপনাদের কী কৈফিয়ত দেবার আছে? আপনাকে মিথ্যার রাজনীতি করার দোহাই কে দিয়েছে? দরকার নেই সেই রাজনীতির। হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকুন। যে রাজনীতির কারণে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অপদস্ত হতে হবে, সে রাজনীতি করার এমন কী আবশ্যক হলো আপনার?

যাঁর সামান্য ইশারায় জান্নাত থেকে রকমারি খাদ্য-সম্ভার নেমে আসতে পারত, এবং সামান্য ইঙ্গিতে জান্নাতের আসবাবপত্র দিয়ে গোটা গৃহ সজ্জিত হয়ে যেতে পারত, জীবন যাপন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল শুনুন—একদিন তিনি প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযি.)-কে দেখতে গেলেন। হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর গৃহদ্বারে ফুল করা একটি পর্দা ঝুলানো ছিল। পর্দাটি দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর ভিতরে গেলেন না। গৃহদ্বার থেকে ফিরে আসলেন। হযরত ফাতেমা (রাযি.) বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী (রাযি.) গৃহে আগমন করে তাঁকে বিমর্ষ-বদনে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তিনি বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন এবং দরজা থেকেই ফিরে গিয়েছেন। ... নিশ্চয়ই কোন অসঙ্গতি ঘটেছে।

ঘটনা শোনে হযরত আলী (রাযি.) সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এভাবে ঘরের দরজা থেকে ফিরে আসার কারণ কি? কোন সমস্যা হয় নি তো? জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নবীর কন্যা হয়ে গৃহদ্বারে নকশীদার পর্দা ঝুলিয়েছে, এ অবস্থায় আমি সে ঘরে যেতে পারি না। তাকে গিয়ে বল, পর্দাটি যেন সরিয়ে ফেলে।

৯- একবার জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত

করতে আসলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় একটি পুরাতন ছিন্ন চাদর দেখতে পেয়ে সে বলল, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি নতুন চাদর পাঠিয়ে দিচ্ছি। মহিলা কথামত হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর গৃহে ফুলদার একটি নতুন চাদর পাঠিয়ে দিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে এসে চাদরটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই চাদর কোথা থেকে এল? হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযি.) বললেন, এক মহিলা হাদিয়ারূপে আপনার জন্য প্রেরণ করেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে বললেন, 'আমার জন্য!' অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে বললেন, আয়েশা! চাদরটি ফেরত পাঠিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ব্যবহারের চাদরটি অনেক পুরাতন হয়ে গিয়েছে। এই চাদরটি বেশ সুন্দর আছে। আপনি এটি ব্যবহার করুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা! চাদরটি ফেরত দিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রাযি.) আবারও অসম্মতি জানিয়ে বললেন, আমি তো শুধু আপনার জন্যই বলছি। মেহেরবানী করে চাদরটি ফেরত দিবেন না। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা! আমি চাইলে এই ওহোদ পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হয়ে আমার পায়ের কাছে এসে স্তুপ হত। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় দুনিয়া ত্যাগ করেছি। মুহাম্মদুররাসুলুল্লাহ্ (সা.) আর এই চাদর এক ছাদের নীচে এক ঘরে থাকতে পারে না। তুমি চাদরটি পাঠিয়ে দাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মসংযমের এই মহান আদর্শ আমাদের জন্য স্থাপন করে গিয়েছেন—যাতে আমাদের কারো পক্ষেই দরিদ্রতার ওযর করা সম্ভব না হয়।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! মৃত্যু সম্পর্কে আপনাদের ধারণা যদি এই হয় যে, অবশ্যই তা একদিন আপনাদেরকে আলিঙ্গন করবে, এবং মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে একদিন অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়াতে হবে, তাহলে বর্তমান জীবন থেকে তওবা করুন। এ জীবন গাফলত ও মুর্খতার। এই মসজিদ একথার সাক্ষ্য বহন করছে যে, মহল্লাবাসী সকলে নামাযী নয়। কারণ, মহল্লাবাসীদের সংখ্যা হিসাবে মসজিদ অনেক ছোট। মহল্লার সকলে নামাযী হলে মসজিদের আয়তন বাড়াতে হবে, সন্দেহ নেই। মসজিদ প্রচ্ছন্ন ভাষায় এই অভিযোগ জানাচ্ছে যে, মহল্লায় নামাযীদের তুলনায় বেনামাযীর সংখ্যাই অধিক।

মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবার বিশ্বাস যদি আপনাদের থেকে

থাকে, যদি মনে করেন যে, আল্লাহ্‌র ঐ হাবীবের সামনে আপনাদেরকে একদিন উপস্থিত হতেই হবে, যিনি আপনাদের জন্য রাতভর জাগ্রত থেকে কেঁদে কাটিয়েছেন, এবং আপনাদের কল্যাণ-চেষ্টাতেই যার গোটা জীবন শেষ করে দিয়ে গেছেন, তাহলে আপনাদের কী করা উচিত? অথচ আপনারা এবং আমরা তাঁর সেই আত্মত্যাগের প্রতিদান দিচ্ছি এইভাবে যে, আমাদের জীবন থেকে নামাযকে বিদায় করে দিয়েছি। আমাদের চরিত্রে নববী আখলাকের লেশমাত্রও নেই। লজ্জা ও শালীনতা শেষ। যুলুম-যিনা, সুদ-ঘুস, মিথ্যা ইত্যাকার যাবতীয় অপকর্ম, যা মিটানোর মেহনত করতে করতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তার সবই চলছে নির্বিবাদে। যেই নবী আমাদের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য নিজের পেটে কষ্টের পাথর বেঁধেছেন, এমনকি জীবনের শেষ রজনীতেও বাতি জ্বালাবার মত সামান্য তেল তাঁর গৃহে ছিল না। ফলে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) প্রতিবেশীর কাছ থেকে তেল ধার এনে ঘরে আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সেই নবী আলাইহিস্-সালামের অবাধ্যতা করে চলেছি।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের সমাধান রেখেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের মধ্যে। তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, এবং তাঁর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শই সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শ।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গোস্তাখী

কারো পতন যখন আসে চারিদিক থেকেই আসে। আজকাল না'ত পাঠের খুব চর্চা হচ্ছে। মসজিদ-মাদরাসায়, ইসলামী সভা-সমাবেশে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই 'ইসলামী সঙ্গীত' পরিবেশন করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না'ত ও তাঁর গুণচর্চা হযরত সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানেও করেছিলেন। না'ত নিতান্ত প্রশংসনীয় একটি আমল। কিন্তু আজকের না'ত, যাকে যন্ত্রসঙ্গীত বিহীন গীতিকাব্য বলা যায়, তা কোনভাবেই হযরত সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসিত সেই না'ত-এর পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু কে বুঝাবে তাদেরকে এ কথা যে, এভাবে না'ত পাঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানের বদলে অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। আফসুস তাদের জন্য, যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না'তকে গানের সুরে বেঁধে সঙ্গীতের এক নতুন ভুবন সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে। অথচ সেকালে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-ও না'ত পাঠ করেছিলেন। যা ছিল

হৃদয়ের নির্মল অনুভূতির বাঙময় প্রকাশ। যথা—

واحسن منك لم ترقط عينى

واجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبراء من كل عيب

كانك قد خلقت كما تشاء

আমার এ চোখ দু'টি আপনার চেয়ে সুন্দর ও সুদর্শন কারো দেখা পায় নি। এবং আজ পর্যন্ত কোন নারী আপনার চেয়ে অধিক সুশ্রী সন্তানের জন্ম দেয় নি। সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও আবিলতা থেকে আপনি পবিত্র। যেন আপনি যা চেয়েছেন ও যেমন চেয়েছেন, ঠিক তেমনি আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু আজ একি জুলুম শুরু হয়েছে! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবনের মেহনত ছিল যেই গানের সুরকে মিটানোর জন্য, আজ সে সুরের মুর্ছনাতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না'ত পরিবেশন করা হচ্ছে। ফাহেশা গানের সুরে পরিবেশিত সঙ্গীতকে কীভাবে না'ত বলা যেতে পারে! আর এ মূর্খতারই বা কী এলাজ হতে পারে। উম্মতের চেহারা থেকে এই কলঙ্ক-চিহ্ন কীভাবে মুছবো। কোরআনের ভাষায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণকীর্তন শুনুন—

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

وكان الله بكل شيء عليما *

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

—*সূরা আহ্যাব - ৪০*

আরো ইরশাদ হয়েছে—

إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر *

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ। —*সূরা কাউসার*

কিন্তু আফসুস! আজ না'ত-শিল্পীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পবিত্র গুণ-বন্দনাকে গান বানিয়ে ছেড়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কী সম্মান প্রদর্শন করা হয় জানি না, কিন্তু অসম্মান যে যথেষ্ট হয়, তা স্পষ্ট।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনারা আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় গ্রহন করুন। আল্লাহ্‌র কসম! গোটা মানব জাতির জন্য, এবং বিশেষত মুসলিম সমাজের জন্য এছাড়া দ্বিতীয় কোন আশ্রয়স্থল নেই। মুসলমানগণ এটমিক শক্তি অর্জন করে দেখেছে, লাভ কিছুই হয় নি। বিশ্ব দরবারে না তার প্রতিপত্তি বেড়েছে, না কারো অতিরিক্ত সমীহ আদায় করতে পেরেছে? অর্জনের খাতা একেবারেই শূণ্য। মুসলমানের শক্তি-সম্মান ও প্রতিপত্তি লুকিয়ে আছে আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের আঁড়ালে। তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে হলে প্রথমে তাঁর প্রিয়-ভাজন হতে হবে। আর তার একমাত্র উপায় হলো—আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে চলা। তখন নিশ্চয়ই এটমের চেয়েও সহস্রগুণ অধিক শক্তি মুসলমানদের হস্তগত হবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠন-প্রকৃতি

মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর বান্দাদের জীবন ব্যবস্থারূপে একমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, আল্লাহ্ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে সেই গ্রহণযোগ্য জীবনাদর্শই আপন করে নিতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ আমাদের নিকট অজানা বা অস্পষ্ট কিছু নয়। হাদীসের কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এমনকি তাঁর দৈহিক গঠন-প্রকৃতি, তাঁর আচরণের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর দৈহিক গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো এই—তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির। খুব লম্বাও নয়, একেবারে খাটোও নয়। তবে তাঁর একটি আশ্চর্য মু'জেযা ছিল এই যে, তিনি যখন লোকদের সঙ্গে চলতেন, সকলের উপর দিয়ে তাঁকেই দেখা যেত। হযরত আব্বাস (রাযি.) এত দীর্ঘাকৃতির পুরুষ ছিলেন যে, ঘোড়ার উপর বসলে তার পা দু'টি মাটির সঙ্গে লেগে থাকতো। কিন্তু তিনিও যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে চলতেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বড় দেখাত। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে, সেখানে যত দীর্ঘ মানুষই থাকুক না কেন, সকলের

উপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দৃশ্যমান হতেন। পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিল তার দেহের রঙ। প্রশস্ত ললাট। মাথার আকৃতি ছিল দেহের সঙ্গে মামানসই সুশোভন। পবিত্র চুলগুলো ছিল কোঁকড়ানো। সেই চুলগুচ্ছ বড় হয়ে কখনো কখনো কানের নীচ পর্যন্ত নেমে আসতো। চুল পরিপাটি করতেন, কিন্তু সিঁথি করার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন না। চুল পরিপাটি করার সময় হয়তো কখনো সিঁথি স্পষ্ট হয়ে ওঠতো, এ পর্যন্তই। ভ্রু দু'টি ছিল ধনুকাকৃতির। দু' ভ্রুর মাঝে ছিল সুশোভন ব্যবধান। সেখানে একটি রগ ছিল। কোন কারণে তিনি যখন উত্তেজিত হতেন, রগটি ফুলে স্পষ্ট হয়ে ওঠতো। নাকটি পাতলা সুউচ্চ। তাঁর অগ্রভাগে সর্বদা অপার্থিব এক জ্যোতি চমকাতে থাকতো। বড় ও সুদীর্ঘ চক্ষু। দেখলে মনে হতো যেন সুরমা ব্যবহার করেছেন। চক্ষু গোলকের সাদা অংশটি ছিল পরিপূর্ণ সাদা, আর কালো অংশটি ছিল মিসমিসে কালো। লোকজনের প্রতি তাঁর তাকাবার ভঙ্গি ছিল সলজ্জ। কারো প্রতি তিনি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে নজর না।

যেই নবী পুরুষদের প্রতি তাকাতে এতটা লজ্জাবোধ করতেন, আজ তার উম্মতের তরুণ যুবাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো, তাদের দৃষ্টি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়; এখানে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের কয়জনের কন্যা সেই নাপাক দৃষ্টি থেকে সংরক্ষিত আছে ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সাধারণত কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না, আর কখনো তাকালেও কারো হিম্মত হতো না তাঁর চোখে চোখ রাখার। তাঁর দন্তসারি ছিল পাতলা ও বিদ্যুতের মত চমকদার। হাসলে মনে হতো শিলাখণ্ড ঝরে পড়ছে। কখনো দেয়ালের পাশে বসলে তাঁর দাঁতের আলোকচ্ছটা দেয়ালের উপর প্রতিফলিত হত। সুন্দর পাতলা ঠোঁট ও প্রশস্ত মুখ। গণ্ডদ্বয় খুব স্ফিতও ছিল না, আবার চুপসানো মাংসহীনও ছিল না। সে দু'টির বর্ণ ছিল দুধে আলতা-গোলাপ-কলির মত মিষ্টি কোমল। চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা ও প্রশস্ত বক্ষ। চওড়া কাঁধ। বুক-পেট ছিল সমান-সমতল। গোটা দেহ ছিল লোমশূণ্য। শুধু বুকের উপর থেকে কালো লোমের একটি ক্ষীণ রেখা নাভি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। অবশিষ্ট গোটা দেহ ছিল আয়নার মত পরিষ্কার। দীর্ঘ ও মাংসল মজবুত বাহু। লম্বা আঙ্গুল। চোখের পলক দু'টি ছিল দীর্ঘ। গ্রীবা ছিল সরল, দীর্ঘ ও সুঠাম। কণ্ঠস্বর ছিল বজ্র-ভরাট ও প্রভাববিস্তারকারী। যখন তিনি নিরব থাকতেন, তাঁর চারিদিকে গাম্ভীর্য বিরাজ করতো। মোটকথা, তিনি ছিলেন নিখুঁত ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের এক অনন্য প্রকাশ। এই হলেন আমাদের আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দাওয়াতী মেহনত খতমে নবুওয়াতেরই
জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা

গোটা দুনিয়া জুড়ে তবলীগের নামে যে মেহনত চলছে, তার মূল বক্তব্য হলো—দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যেন আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শকে নিজেদের জীবনে সুদৃঢ়রূপে গ্রহন করে। তারা অনুনয় বিনয় করে মানুষকে অনুরোধ জানিয়ে বলে—আসুন, আমরা সকলে ঐ নবীর আদর্শ অনুসরণ করে চলি, যিনি জগদ্বাসীর জন্য 'রাহবার'রূপে এসেছিলেন। হাদী ও মুক্তির দূতরূপে এসেছিলেন। সাখাওয়াত, দানশীলতা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল এবং খোদাভীতি ও আল্লাহ্ ভরসার তালিম দিতে এসেছিলেন। ইবাদত, মুহব্বত, স্নেহ-প্রীতি, ক্ষমাগুণ এবং আখলাক ও স্বভাব-মাধুর্য শিখাতে এসেছিলেন। আসুন, তাঁর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি এবং সে জন্য কিছু সময় ব্যয় করি।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ!

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযমতকে দিলের মধ্যে বসানো এবং সেই আযমতের বাণী লোকের কাছে পৌছানোই তবলীগের কাজ। আপনাদের মাযহাব ও মাসলাকের পরিবর্তন সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে চাই, এবং পাশাপাশি এও চাই, যেন আমাদের নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যেও পরিবর্তন আসে। আফসুসের বিষয় হলো—আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছি অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, ইয্যত-সম্মান ও পার্থিব উন্নতি। জীবনের এই উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে হবে। আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করতে হবে এবং দুনিয়ার সর্বশেষ মানুষটি পর্যন্ত এই দাওয়াত পৌছে দেয়ার সংকল্প নিয়ে আপন পরিবেশ ছেড়ে বের হয়ে পড়তে হবে।

আল্লাহ্র কসম! তাবলীগ জামাত আমাদেরকে কোন টাকা-পয়সা দেয় না। আপনারা যদি মনে করেন যে, সেই টাকার লোভে আপনাদের মাথা খেতে এসেছি, ভুল হবে। আপনাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় বের করে আমাদের কোন পার্থিব ফায়দা নেই। এখানে এক-দেড় ঘন্টা বয়ানের পর আমরা যে যার পথে চলে যাবো। আপনাদের ঘরের আনন্দ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করবে না। কেউ আমাকে গালি দিলেও তা আমি শুনতে পাবো না। আর কেউ আমার জন্য দু'আ করলেও তা আমার জানার উপায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা

করে, ঘরের আরামপ্রদ পরিবেশ ত্যাগ করে এসে এভাবে আপনাদেরকে খোশামোদ করা নিশ্চয়ই একেবারে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন বলবেন না কেউ। জেনে রাখুন, এই মেহনতের পিছনে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আখেরী খুৎবায় বলেছিলেন, আয় আল্লাহ্! আবাদ করুন, সুখী-সমৃদ্ধ করুন, সবুজ-শ্যামলতায় ভরে দিন আমার ঐ সকল উম্মতকে, যারা আমার এই বাণী নিজে গ্রহণ করে এবং অন্যের কাছে পৌছে দেয়। নিজে জানার পর ঘরে বসে না থেকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ছুটে যায়।

আপনি যখন নবী সেই বাণী নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাবেন, আপনার মুখে দ্বীনের কথা শোনে হয়তো শ্রোতা আপনার চেয়েও অধিক আমলকারী হয়ে যাবে—এটা অসম্ভব নয়। তখন আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করে তার সেই আমলের সওয়াব আপনার আমলনামায়ও লিপিবদ্ধ করে দিতে থাকবেন। আপনার মেহনতের সার্থকতা এখানেই।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! তাবলীগের এই মহান ও অপরিহার্য দায়িত্ব আমরা লাভ করেছি খতমে নবুওয়াতের বদৌলতে। এটা তাবলীগ জামাতের নিজস্ব কোন কর্মসূচী নয়। শুধু তাবলীগ জামাতের কথায় মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ধর্না দিবে, তাদের গালমন্দ শোনবে, নির্যাতন সহ্য করবে, এবং তারপরও মানুষের জন্য দিল খুলে হিদায়াত ও নাজাতের দু'আ করতে থাকবে—এটা প্রায় অসম্ভব।

একবার আমি কোথাও যাচ্ছিলাম। দেখলাম পথের পাশে নিজেদের মাল-সামান চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে একদল লোক বসে বসে তা'লীম করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এই অবস্থা কেন? তারা বললেন, মসজিদ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বের করে দিয়েছে।

কে বা কোন্ জিনিস এভাবে তাদেরকে পথের পাশে জায়নামায বিছিয়ে তালীম করতে বাধ্য করেছে? কারো কাছে তো তাদের কোন দাবী নেই। কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশাও করে না তারা। তবে কোন্ স্বার্থে তারা এভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করছে? এটা মূলতঃ খতমে নবুওয়াতের ঐ জ্যোতির্ময় প্রভা ছাড়া আর কিছু নয়, যা তাদের হৃদয়ে এই উপলব্ধির আলো জ্বেলে দিয়েছে যে, গোটা দুনিয়ায় আল্লাহ্র বাণী পৌছানো আমাদেরই দায়িত্ব। কেউ গ্রহণ করুক চাই না করুক, এ দায়িত্ব আমাদেরই।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র সঙ্গে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করুন। তাঁর রাসূলের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুলুন। গাফলতি ও অবহেলায় জীবনের অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। সে জন্য তওবা করুন। এবং ঐ রহ্‌মান ও রহীম মালিকের কাছে ফিরে আসুন, যিনি সকাল-সন্ধ্যা আসমানের দরজা খুলে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করেন—এমন একটি সকালের আশায়, যেদিন এই ভুলা বান্দা তওবা করে তাঁর কাছে ফিরে যাবে। এবং এমন একটি সন্ধ্যার আশায়, যেদিন পথহারা বান্দারা সুপথে ফিরে আসবে। বান্দা যখনই ফিরে আসবে, তখনই তাকে তিনি নিজের রহ্‌মতের দু'বাহুর আলিঙ্গনে বেষ্টন করে নিবেন।

যমীন প্রতিদিন বলতে থাকে—আয় আল্লাহ্! অনুমতি দিন, আমি ফেটে গিয়ে সমস্ত কিছু গিলে ফেলি। সমুদ্র বলতে থাকে—আয় আল্লাহ্! অনুমতি দিন, আমি স্ফীত হয়ে সব তলিয়ে দেই। আসমানের ফিরিশতারা বলতে থাকেন, আয় আল্লাহ্! অনুমতি দিন, আমরা যমীনে অবতরণ করি এবং সব নাফরমানকে ধ্বংস করে দিই। কিন্তু যার নাফরমানী করা হচ্ছে, সেই মহান রব্বুল আলামীন জবাবে বলেন, সরে যাও। আমার বান্দাদেরকে তোমাদের চেয়ে আমিই ভাল জানি। আমি তাদের তওবার অপেক্ষায় আছি। হয়তো কখনো তারা তওবা করে ফিরে আসবে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সেই মেহেরবান মাওলার সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক রাখবেন না। তওবা করুন এবং তাঁর সামনে আনুগত্যের মাথা ঝুঁকিয়ে দিন। আমাদের নবীই সর্বশেষ নবী। কাজেই এখন গোটা দুনিয়ায় তাঁর বাণী আমাদেরকেই পৌছে দিতে হবে।

এই দায়িত্ব ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবি, দিনমজুর সব পেশার ও কালেমা-গো সকল মুসলমানের। শুধু তাবলীগওয়ালাদের নয়। আমাদের পক্ষে ঘরে বসে থাকা আর কোনক্রমেই সমীচিন নয়। দ্বীনের জন্য হযরত সাহাবায়ে কেরামের কুরবানীর ইতিহাস জানুন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের অবস্থা যাঁচাই করুন।

আল্লাহ্ পাক হযরত সাহাবায়ে কেরামের জন্য সন্তুষ্টি ও জান্নাতের ঘোষণা দেওয়ার পরও তারা ঘর-বাড়ী ছেড়ে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই মেহনত করে গিয়েছেন। যার ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের শেষ শয্যা রচিত হয়েছে। কেউ আফ্রিকায় কেউ ইউরোপে কেউ এশিয়ার দূরপ্রান্তে। অথচ আমাদের তো জানা নেই যে, মৃত্যুর পর আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে। কাজেই আমরা তো কোন ভাবেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি না!

তাবলীগের মেহনত তওবার মেহনত

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! তাবলীগ তওবা করা ও করানোর মেহনত। তাবলীগ জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি ফিরে যাওয়া ও ফিরিয়ে আনার মেহনত। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে আসুন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করুন। আর এই বাণী গোটা দুনিয়ায় পৌঁছে দেবার মেহনতকে নিজের অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করুন। মানুষ যখন এই মহান কাজকে নিজের মাকসাদ হিসাবে গ্রহণ করবে, তখন আযান হতেই যাবতীয় ব্যস্ততা ছেড়ে মসজিদের দিকে ছুটে যাবে। দোকান-পাট ও হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। কলম থেমে যাবে, কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যাবে—চল চল আসল কাজের ডাক এসেছে। টাকা-পয়সা, অর্থ-কড়ি সব এখানেই পড়ে থাকবে। এর কিছুই আমাদের শেষ যাত্রার সঙ্গী হবে না।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এ পর্যন্ত আমি যা বললাম, তার মধ্যে এমন কোন্ কাজটি রয়েছে, যা শুধু আমাদের উপর ফরয, আর আপনাদের উপর নয় ? বা এমন কোন্ কথাটি বলেছি, আপনাদের চিন্তা-ফিকিরের সঙ্গে যার যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে ? হাঁ, আমার একটি কথার সঙ্গে হয়তো আপনারা দ্বিমত পোষন করেন। সে কথাটি হলো—'ঘড়বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ুন'। আমার ধারণা—শুধু একথাটিই আপনাদের বুঝে আসে নি। কারণ, অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে তো 'সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্!!' যথেষ্ট শোনা গেল। কিন্তু বাড়ী-ঘর ছেড়ে আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার কথা বলতেই সব ঠান্ডা হয়ে গেলেন।

তাবলীগের মেহনতের ফসল

তাবলীগ জামাত'-এর দল ভারি করার জন্য আমি আপনাদেরকে ঘর ছাড়তে বলছি না ; বরং নিজের ঈমান মজবুত করার জন্য এবং অন্যকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার দাওয়াত দিচ্ছি। আজ এই ঘর ছাড়ার বদৌলতে সাত মহাদেশে আল্লাহ্র বান্দারা আল্লাহ্র পয়গাম নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এ মেহনতের বদৌলতেই 'জুনাইদ জামশেদ'-এর মত জগৎখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী—যে গোটা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে ষ্টেজে নেচে-গেয়ে বেড়াতো, আজ আল্লাহ্র রাস্তায় চার মাসের সময় লাগাচ্ছে। তিন-চার দিন পূর্বে মুলতানের সবচেয়ে বড় মাদরাসায় হাজার হাজার তলাবা-ওলামা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে দাঁড়িয়ে সে কথা বলছিল। আর সমস্ত ওলামাদের

চোখ ফেঁটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। বোখারীর ছাত্ররা অঝোর ধারায় কাঁদছিল। এক সময় যে ব্যক্তি ষ্টেজে নেচেগেয়ে বেড়াতো, আজ সে এই তবলীগের মেহনতের বদৌলতেই দায়ী হয়ে গোটা দুনিয়ায় দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

আমি নিজে তাকে ফয়সালাবাদে দেখে এসেছি। তার মুখে এখন আমার মত দীর্ঘ দাড়ি, মাথায় আমার চেয়েও বড় পাগড়ী। মসজিদে গিয়ে দেখি সে বয়ান করছে—'ভাই সকল! আমি পাগল নই। চার বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের মুখে মুখে আমি আমার গান তুলে দিয়েছিলাম। গোটা দেশবাসী আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠেছিল—'দিল দিল পাকিস্তান'। সেই রঙিন জগত ছেড়ে আজ আমি এখানে এসেছি বলে ভাববেন না যে, আমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে; বরং আমার বোধদয় হয়েছে—আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমি যে জগতে বিচরণ করে চলেছি সে জগৎ সম্পূর্ণ ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। আজ আমি হাকিকতের সন্ধান পেয়েছি। সত্য আজ আমার কাছে উদ্ভাসিত। এখন আমি আর গায়ক নই। আমার পরিচয়—এখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতী'।

বিশ্বখ্যাত গায়কের এই চেহারা নিশ্চয় কারো না কারো মেহনতেরই ফসল। তার এই কোরবানীর জন্য নিশ্চয়ই কোন না কোন একজনকে দাওয়াত নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হতে হয়েছিল। কাজেই আপনাদেরকেও দাওয়াত নিয়ে মানুষের কাছে যেতে তো হবে। যে লোক ষ্টেজে উঠত আর লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটে পুরে বেরিয়ে যেত—তার জন্য নিশ্চয়ই এটা অনেক বড় কোরবানী।

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের দেশে এবং গোটা দুনিয়াতে এমন আরো কত লক্ষ-কোটি যুবক রয়েছে—যারা তওবা করতে পারে, এবং তওবা করা যাদের জন্য অপরিহার্য। আসুন, আমরা সকলে তওবা করি। এটা কি তাবলীগ জামাতের দলীয় কোন দাবী ? আমি কি আপনাদের কাছে এটা কোন নাজায়েয আবেদন করলাম? আমাদের কি তওবার প্রয়োজন নেই? কাজেই আসুন! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আজ আমরা সকলে তওবা করি। আমার এই আবেদনটুকু অন্তত আপনারা গ্রহণ করুন। আপনাদের স্তুতি-বন্দনার যেমন আমার কোন প্রয়োজন নেই। তেমনি আপনাদের গালমন্দেরও আমি কোন পরোয়া করি না। আমি শুধু চাই যাতে আপনারা আখেরাতে কামিয়াব হয়ে যান এবং আমিও আখেরাতে কামিয়াবী লাভ করতে পারি। কবরের আযাব থেকে আমি এবং আপনারা সকলেই যেন নাজাত পেয়ে যাই। যেই জীবনে আপনারা অভ্যস্ত আছেন, এই জীবন থেকে তওবা করুন। আল্লাহ্র কসম! এই

অবস্থাতেই যদি আপনাদের মৃত্যু ঘটে, তাহলে বরবাদি ছাড়া কপালে আর কিছু নেই। আমি হাত জোড় করে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, তওবা করুন। আমার এই অনুরোধ নিশ্চয়ই নাজায়েয কিছু নয়। আমি আপনাদেরকে নতুন কোন হাদীসও শোনাচ্ছি না এবং নতুন কোন দ্বীনের প্রতিও আপনাদেরকে আহ্বান করছি না।

আমার প্রতিটি কথার পিছনেই কোরআন ও হাদীসের মজবুত দলীল রয়েছে এবং সেগুলো যথাসাধ্য আমি উপস্থাপন করেছি। মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন—

توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে মিলে তওবা করো। পঙ্কিল জীবন ছেড়ে পবিত্র জীবনের দিকে ফিরে আস। ইবাদত সংক্রান্ত অপরাধের জন্য তওবা করা তুলনামূলক সহজ। একদিকে তওবা করলেন এবং অন্যদিকে আমল শুরু করে দিলেন। নামায পড়তেন না, আজ থেকে শুরু করে দিন। পিছনের ছুটে যাওয়া নামাযগুলোও কাযা করতে থাকুন। যাকাত দিতেন না, হিসাব করে আজ থেকেই দিতে আরম্ভ করুন। অতীতে রোযা রাখেন নি, কাযা রাখতে শুরু করুন। অন্যদিকে মু'আমালাতের তওবা করাও খুব একটা কঠিন নয়।

ইবাদত ও মু'আমালাতের তওবা

সুদের জালে আটকা পড়েছেন? রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে বলুন—আয় আল্লাহ্! মাফ করে দিন। পিছনের সমস্ত অপরাধ মাফ। এবার এক টাকা, দু' টাকা, একশ', দুইশ', এক হাজার, দুই হাজার, সম্পদ থেকে এভাবে সুদের হার কমাতে থাকুন। এই অবস্থায় যদি আপনার মৃত্যুও ঘটে, তাহলে আপনি মাফ পেয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ্। কাজেই নিয়ত করুন। নিয়তই যদি না থাকে, তাহলে মাফ হবে কীভাবে? কারো হক মেরে খেয়েছেন? আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অপরাধ সঙ্গে সঙ্গে মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ্র কসম! এজন্য আর আপনার সাজা হবে না।

তবে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ক্ষমা লাভের জন্য আরো একটি বিষয় আছে—যার হক মেরেছেন, তাকে তার হক বুঝিয়ে দিতে হবে বা তার প্রাপ্য ফেরত দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে যে বস্তুটি অবৈধভাবে আপনি গ্রহণ করেছেন, তা যদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা তার মালিককে ফেরত দিন। আর না থাকলে মালিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। মালিক যদি মাফ করে দিল, তাহলে তো সমস্যা শেষ—অপরাধও

মাফ, হকও মাফ। আর মালিক যদি তার হক মাফ না করে, তাহলে তাকে তার প্রাপ্য দিতেই হবে। সুতরাং সেজন্য সময় নিন এবং আদায়ের চেষ্টা করতে থাকুন। যদি আদায় করে দিতে পারলেন, তাহলে তো সমস্যা পরিষ্কার। আর যদি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দিতে পারলেন না, তাহলে কেয়ামতের দিন নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তা আপনার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবেন।

কেয়ামতের আদালতে আপনার পাওনাদার আল্লাহ্ পাকের দরবারে অভিযোগ করে বলবে—আয় আল্লাহ্! এই ব্যক্তি আমার হক মেরেছিল, আমার সেই পাওনা আদায় করে দিন। আপনি যদি দুনিয়াতে সে অপরাধের জন্য তওবা করে থাকেন, এবং পাওনাদারের হক আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ পাক পাওনাদারকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাকে কি নিয়ে দিতে হবে? পাওনাদার তার প্রাপ্যের কথা বলবে। তখন আল্লাহ্ পাক তার সামনে জান্নাতকে মেলে ধরবেন। জান্নাতের আজিব নায-নেয়ামত দেখে লোকটি বলবে, আয় আল্লাহ্! বড়ই আশ্চর্যজনক জিনিস দেখলাম। এটা কোন নবীর জান্নাত? জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন, এটা কোন নবীর জান্নাত নয়; বরং যে ব্যক্তি এর মূল্য পরিশোধ করবে, তাকেই দেয়া হবে। লোকটি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করবে—আয় আল্লাহ্! এর মূল্য কি? রাব্বুল আলামীন বলবেন, নিজের ভাইকে মাফ করা। এখন বল, তুমি কার কাছ থেকে হক নেবে? আমার কাছ থেকে, না আমার বান্দার কাছ থেকে? তখন লোকটি বলবে, তার কাছ থেকে কি নিবো? আয় আল্লাহ্! আপনিই দান করুন।

সুদের অভিশাপ

সুদের পরিমাণ যতই বিশাল হোক, সংকল্প দৃঢ় হলে এবং নিয়ত খালেছ হলে সুদমুক্ত হওয়া মোটেও কঠিন নয়। ফয়সালাবাদের এক বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যতদূর জানি, তারা তাদের গোটা ব্যবসাকে সুদমুক্ত করেছে। সেই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আব্দুল গফুর মরহুম ইন্তেকালের পর তার ভাই ও ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে তো কম দেন নি। আপনাদের যে সম্পদ, তাতে কয়েক পুরুষ বসে খেতে পারবে। কাজেই এবার আপনারা সুদ থেকে তওবা করে ফেলুন। সুদমুক্ত হবার একটা পদ্ধতি আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি—আপনাদের ব্যবসা এখন যে পর্যায়ে আছে, একে এ পর্যায়েই রাখুন। অর্থাৎ, সুদমুক্ত হওয়ার পূর্বে ব্যবসা আর প্রসারিত করবেন না এবং নতুন কোন স্থাবর সম্পদ ক্রয় ত্যাগ করুন। আপাতত এ দু'টি কাজ করুন। ইনশাআল্লাহ্ এতেই আপনাদের ব্যবসা

সুদমুক্ত হতে আরম্ভ করবে। আর আপনারা আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'আ করতে থাকুন। এক বছর পর আবার তাদের সঙ্গে আমার দেখা হলো। ইদ্রিস সাহেব বললেন, গত এক বছর যাবৎ আমি একটি ইটও ক্রয় করি নি। ফয়সালাবাদে কোথাও কোন জায়গা-জমি বিক্রি হলে প্রথমে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নেয়া হত যে, সে জমিটির ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ আছে কি না? কিন্তু গত এক বছর যাবৎ এক টাকার সম্পদও ক্রয় করা হয় নি। আমাদের সম্পদ থেকে সুদ বাবদ এক কোটি টাকা বের করার কথা চিন্তা করেছিলাম, আল্লাহ্ পাক আমার হাতে দুই কোটি টাকা তুলে দিয়েছেন। তারপর মাত্র চার বছরেই তাদের ঐ বিশাল ব্যবসা সম্পূর্ণ সুদমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাহলে বলুন, এই জামালপুরবাসী যদি তওবা করার ইচ্ছা করে, তাহলে কি তাদের পক্ষে সুদমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়? নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু প্রথমে নিয়ত তো করতে হবে।

কৃষিকাজ হালাল রিযিকের সহজতম উপায়। কিন্তু আজকাল কৃষকরাও ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে। বড় বড় কৃষকদের সকলের মাথা এখন ব্যাংকের কাছে বাঁধা। তাদেরও তওবা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে লোন না নেবার সংকল্প করা উচিত। অতঃপর ক্রমশ নিজের সম্পদ থেকে সুদ বের করে দেবার চেষ্টা করা উচিত। তখন আল্লাহ্ পাকই তাকে সহযোগিতা করবেন।

আজকাল অনেক ব্যাংকে Saving Account নামে একটি একাউন্ট রয়েছে। সুদ যে কী করে Saving হতে পারে, আমার বুঝে আসে না। এটা তো স্পষ্ট বরবাদী ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আপনাদেরকে বোকা বানাচ্ছে। এটা আসলে Save তো নয়, বরং Shave। কাজেই Saving Account থেকে টাকা-পয়সা তুলে Carent Account -এ জমা করুন। ব্যাংকগুলোর কাছে কেন বোকা হচ্ছেন? তাছাড়া এতে আপনাদের আখেরাতও বরবাদ হচ্ছে। আমি এতক্ষণ যা বললাম, এটা কি তাবলীগ জামাতের নিজস্ব কোন প্রচারণা, না স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাবী? তাবলীগ জামাত তাদের নিজস্ব কোন আদর্শ প্রচার করে না। আমরা কত বড় বোকা যে সুদকে Saving বলছি। অথচ মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন— يمحق الله الربوا ويربى الصدقات 'আল্লাহ্ পাক সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন।'

আপনারা হোটেলে কড়াই মাজতে দেখে থাকবেন হয়তো। তাদের প্লেট ধোয়ার কায়দা হলো—পানিতে চুবিয়ে হাত দিয়ে সামান্য মেজে রেখে দেয়। আর কড়াই ধোয়ার সময় ছাই-ছোবা ইত্যাদি দিয়ে খুব করে ঘসে-মেজে ধোয়। আরবীতে একে محق বলা হয়। সুদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক শুধু একথা বলেন

নি যে, 'আমি তা মিটিয়ে দেই' ; বরং তিনি বলেছেন—'সুদকে আমি ভালোভাবে ঘসে-মেজে দুর করে দেই, আর যাকাত ও সদকাকে বাড়িয়ে দেই।

ঘরে টাকা-পয়সা এক বছর বেকার পরে আছে। আল্লাহ্ পাক বলছেন, সেখান থেকে আমাকে মাত্র আড়াই শতাংশ দাও। সে অর্থ আমি দীন-দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিব। এর বদলে দুনিয়াতে আমি তোমাকে দশগুণ অধিক ফেরত দিব, আর আখেরাতে দিব বে-হিসাব। অথচ এই সামান্য যাকাতের কথা বললে মানুষ বলে আমি নিজেই চলতে পারি না, যাকাত দিবো কিভাবে ? যাহোক, এ হলো মুআমেলাতের তওবা। আল্লাহ্ পাকের কাছে তওবা করুন এবং কাল থেকে অল্প অল্প করে যাকাত আদায় করতে থাকুন। সুদ বের করে দিন। যেদিন দেওয়া শেষ হয়ে যাবে, আপনি পরিষ্কার। যদি মাঝ পথে আপনার মৃত্যু ঘটে, তবুও আল্লাহ্ পাক আপনাকে মাফ করে দিবেন। এখন প্রথমে তওবা করুন, তারপর সাথে সাথে আল্লাহ্কে রাজি করুন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! নিজেদের তওবার পাশাপাশি গোটা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে তওবার দাওয়াত দিতে হবে। এটাই তাবলীগের মেহনত। এজন্য সকলেই সময় বের করুন এবং গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুন। আল্লাহ্ পাক সকলকে তওফীক দান করুন। আমীন।

—▣—

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

উপকারীর কাছে অবনত হওয়া স্বভাবের দাবী

যার কাছ থেকে মানুষ উপকৃত হয়, তার কাছে অবনত হওয়াই মানব স্বভাবের স্বাভাবিক ধর্ম। শুধু মানুষই নয়, আপন উপকারীর কাছে বিগলিত হওয়া প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব। এক টুকরো রুটি পেয়ে কুকুর গোটা জীবন দানকারীর আনুগত্য করে থাকে। ঘোড়া সামান্য দানাপানি পেয়ে আজীবন প্রভুকে বিশ্বস্ত সেবা দান করে থাকে। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের কাছে আনুগত্য কামনা করেন। কারণ, তিনি শুধু যে মানুষের সকল প্রয়োজন সমাধা করেন তাই নয়, বরং অনস্তিত্ব থেকে তিনিই মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন। মানুষ তার অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুক্ষণ মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী এবং অজস্র ধারায় তারা তা ভোগও করে চলেছে।

মানুষের প্রতি রাব্বুল আলামীনের ইহ্সান

মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের সর্বপ্রথম অনুগ্রহ হল তাকে অস্তিত্ব দান করা। সে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক বলেন—

মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য দ্বারা প্রস্তুত নির্যাস মাতৃগর্ভে নিষিক্ত করেছি। তারপর মায়ের গর্ভাধারের সেই অন্ধকার আধারে তোমাকে পর্দা দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছি। যাতে সেই নিকষ অন্ধকারে তুমি ভিত হয়ে না পড়। মাতৃগর্ভে তোমার জন্মপ্রক্রিয়া ও জীবনধারণের যে অভিনব ব্যবস্থা ছিল, তা কি তোমার পিতা করেছিল, না তোমার মা করেছিল, না তা ছিল একান্তই আমার অবদান? বলতো, কি মনে হয় তোমার কাছে? মাতৃগর্ভে তোমার সঙ্গে কারো যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই যখন ছিল না, কারো পক্ষে যেখানে পৌছানোই ছিল অসম্ভব, সেখানে তোমার খাদ্যের ব্যবস্থা হত কিভাবে? একমাত্র আমার গায়েবী নেযামই যে সেখানে সক্রিয় ছিল, এবং আমিই যে তোমার জন্মপ্রক্রিয়া, বৃদ্ধি ও

জীবন ধারণের সমস্ত আয়োজন অব্যাহত রেখেছি, তাতে কোন সন্দেহ আছে কি?

মাতৃগর্ভে মানব-অঙ্কুর নিষিক্ত হবার পর ফিরিশতাগণ আল্লাহ্ পাকের নিকট তার সৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। সেখান থেকে অনুমোদন পাওয়া গেলে শুরু হয় তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। অন্যথায় সে ভ্রূন বিলয় প্রাপ্ত হয়। তারপর অনুমোদিত সেই অঙ্কুরকে ঘিরে শুরু হয় ফিরিশতাদের ব্যস্ত ক্রিয়াকলাপ। তাদের সংরক্ষণ ও ক্লান্তিহীন তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে মানব-সন্তান। কিন্তু এই মহা কর্মযজ্ঞের কিছুই জানে না পিতা-মাতা। এমনকি স্বয়ং অঙ্কুরিত সেই মানব শিশুও নয়।

মায়ের গর্ভাধারে আমি তোমাকে বসতে শিখাই, খেলতে শিখাই। সেই নড়াচড়া তোমার পিতামাতাকে আশ্বস্ত করে। তোমার এই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলে তোমার অমঙ্গল আশঙ্কায় তোমার মা অস্থির হয়ে ওঠে। তোমার এই যে, ক্রমশ বেড়ে ওঠা, হাত-পা ছুড়তে শেখা, বল তো এ কার কাজ ? বল তো আর কারো পক্ষে কি এই কর্মপ্রক্রিয়া পরিচালনা করা সম্ভব ?

পিতা-মাতা যেমন অনেক সময় সন্তানকে তার প্রতি তাদের ইহ্সানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ পাকও তেমনি তাঁর পবিত্র কালামে আমাদের প্রতি তার ইহ্সানসমূহ এক এক করে উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ইহ্সান অতি সীমিত। সে তুলনায় মানুষের প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের ইহ্সান অসংখ্য ও অপরিমেয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.

'আমার ইহ্সান গণনা করে শেষ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তবিক মানুষ বড়ই নাশোকর ও জালেম।' —*সূরা ইবরাহীম - ৩৪*

মানব সন্তানের যখন ভূমিষ্ট হবার সময় ঘনিয়ে আসে, আমি পিতামাতার মনে তার জন্য স্নেহ-ভালবাসা সৃষ্টি করে দেই। যারফলে ভূমিষ্ট হয়েই সে একটি পরম স্নেহময় পরিবেশ লাভ করে। কিন্তু আমি যদি তখন তাদের হৃদয়ে সন্তানের জন্য স্নেহ-ভালবাসা সৃষ্টি না করতাম, বা তাদের হৃদয়কে স্নেহ-ভালবাসা শূন্য করে দিতাম, তাহলে সে শিশুর জন্য দুনিয়াতে বেড়ে ওঠাই কঠিন হয়ে পড়তো। আর এই কাজটি আমার পক্ষে অসম্ভবও নয়। এই দৃষ্টান্ত কারো কারো ক্ষেত্রে আমি স্থাপন করেছিও।

ফিরআউনের দরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর জননী

শিশু হযরত মূসা (আ.)-কে নদীবক্ষ থেকে উদ্ধার করে ফিরআউনের দরবারে উপস্থিত করার পর বিভিন্ন মহিলার স্তন থেকে তাঁকে দুধ পান করানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কারো দুধই তিনি পান করলেন না। অবশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর ভগ্নি বললেন, এক ধাত্রি মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাকে দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। ফলে হযরত মূসা (আ.)-এর জননীকে সংবাদ দেয়া হলো এবং তিনি দরবারে এসে উপস্থিত হলেন।

বুকে পাশান বেঁধে যেই সন্তানকে অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে নদীবক্ষে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সন্তানকে একেবারে শত্রুক্রোড়ে দেখেও স্নেহময়ী জননী স্থীর ও অচঞ্চল থাকবেন, একজন সহজ-সরল অবলা নারীর কাছে এতটা দৃঢ়তা আশা করা কঠিন। তার মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন ঘটবে না—এটা ভাবা যায় না।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক তখনকার অবস্থাটির বিবরণ দিয়ে বলছেন—

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين -

অর্থ ঃ 'সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মুসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে।'—*সূরা কাছাছ - ১০*

আল্লাহ্ পাক বলেন—ফিরআউনের দরবার ভরা লোকের সামনে আমি যদি মূসা (আ.)-এর জননীর হৃদয়কে সন্তান-বাৎসল্য-শূন্য করে না দিতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নিজের হৃদয়ের আবেগ-উৎকণ্ঠা চেঁপে রাখতে পারতেন না। কিন্তু যেহেতু আমি তার হৃদয় থেকে সন্তান-বাৎসল্য বের করে দিয়েছিলাম, তাই মূসা (আ.)-কে দেখার পরও তার অভিব্যক্তি ছিল এমন নির্লিপ্ত যে, কেউ ঘুণাক্ষরে বুঝতেও পারলো না যে, এই রমণীই শিশু মূসার জননী।

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অভিনব বিচার

ঘটনাটি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর যামানার। পুকুর পারে বসে দু'টি শিশু খেলা করছিল। হঠাৎ একটি শিশু পানিতে পরে মারা গেল। তখন ঐ মৃত শিশুর মা জীবিত শিশুটিকে নিজের সন্তান বলে দাবী করতে লাগল এবং বিষয়টি নিয়ে শিশুরটির প্রকৃত মায়ের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হল। কিন্তু তাদের কারো

কাছেই নিজেদের দাবীর পক্ষে কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছিল না। সুতরাং বিবাদ মিমাংসার জন্য বিষয়টি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নিকট উপস্থাপিত হলো। হযরত সোলায়মান (আ.) বললেন, তোমাদের দাবীর পক্ষে কারো কাছেই যেহেতু কোন সাক্ষী-প্রমাণ নেই, তাই শিশুটিকে দু' টুকরো করে উভয়ের মাঝে ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা করি। এই কথা শোনে শিশুটির প্রকৃত মা আর্তচিৎকার করে বলে ওঠলো—হযরত! আমি সন্তান চাই না, তবুও আমার সন্তানকে দ্বিখণ্ডিত করবেন না। মহিলার ব্যাকুলতা দেখে হযরত সোলায়মান (আ.) বুঝতে পারলেন যে, এই মহিলাই শিশুটির প্রকৃত মা। যে কারণে সে সন্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার নির্দেশ শোনে স্থির থাকতে পারে নি। পক্ষান্তরে এমন নির্মম নির্দেশ শোনার পরও মাতৃত্বের মিথ্যা দাবীদার মহিলাটি নির্লিপ্ত ও নির্বিকার থাকতে পেরেছে। ফলে তিনি শিশুটিকে প্রকৃত মায়ের হাওয়ালা করে দেবার নির্দেশ দিলেন। মূলতঃ মাতৃ-হৃদয়ে সন্তানের প্রতি এই বাৎসল্য আল্লাহ্ পাকেরই দান।

আল্লাহ্র কাছে অবনত হও

ভূমিষ্ট হবার পর যৌবনের উদ্যামতা লাভ করা পর্যন্ত একটি মানব-শিশু মহান রাব্বুল আলামীনের নেয়ামতরাশির যে বিশাল সমুদ্র পারি দেয়, যৌবনের সুদৃঢ় চাতালে দাঁড়িয়ে অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে তার জন্য রাব্বুল আলামীনের সামনে শুকরিয়া ও আনুগত্যের মাথা ঝুকিয়ে দেয়া উচিৎ।

দেখুন, কুকুর আপনার ছুড়ে দেয়া এক টুকুরো রুটি খেয়ে গোটা জীবনের জন্য আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। প্রচণ্ড ক্ষুধার মুহূর্তে আহাররত অবস্থায়ও তাকে ডাকা হলে আহার্য ফেলে উর্ধশ্বাসে আপনার নিকট ছুটে আসে। আপনার লাথি-গুঁতো অম্লান বদনে সয়ে যায়। আপনার ঘরের ছোট্ট শিশুটির প্রহারেও সে নির্বিকার থাকে। আর অচেনা কেউ যখন আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করে, আগন্তুক যত বড় দৈত্যাকৃতিরই হোক না কেন, নিজের জীবনের পরোয়া না করে সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অথচ যে আল্লাহ্ পাক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সকল প্রয়োজন সমাধা করেন, এমনকি যার অস্তিত্বই আল্লাহ্ পাকের দান, সে আল্লাহ্ যখন মানুষকে আহ্বান করেন, কর্মব্যস্ত মানুষ তো দূরের কথা, নিতান্ত কর্মহীন অবসর মানুষও সে আহ্বানে সাড়া দিতে চায় না। আল্লাহ্ পাক সেই 'নিমকহারাম' মানুষকে নিজের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে এতসবকিছু দান করেছি। তার প্রতিদানে তোমাদের কি আমার আনুগত্য করা উচিত নয়? يا ابن آدم خلقت الاشياء لك و خلقت لك اجلى

ওহে আদম সন্তান! এই জগত আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমি আমার জন্য। তোমাদের চারপাশে এই যে অসংখ্য নেয়ামতের সমাহার, সবই তোমাদের জন্য। চন্দ্র-সূর্য তোমাদের জন্য দিন-রাত্রির ব্যবস্থা করছে। আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করছি। যমীন বিদীর্ণ করে তাতে ফল-ফসলে শোভিত শ্যামল বাগিচা ও ফসলের মাঠ সৃষ্টি করছি। এই ব্যাপক আয়োজন শুধু তোমাদেরই জন্য। এই যমীনকে তোমাদের জন্য সমতলরূপে বিছিয়ে দিয়েছি। দুনিয়াতে তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল জল-বায়ুর। তা আমি তোমাদের জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছি। তোমাদের পশুপালের জন্য শ্যামল ঘাস ও তৃণলতার প্রয়োজন ছিল, সে আয়োজনও আমি সম্পন্ন করেছি। এই যমীন ছিল দুদোল্যমান। তাতে পর্বতশ্রেণী স্থাপন করে তাকে স্থির করেছি। আমার এতসব আয়োজন শুধুই তোমাদের জন্য।

কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে এভাবে আল্লাহ্ পাক তার নেয়ামতের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, والانعام خلقها لكم পৃথিবীতে আমি অসংখ্য পশু সৃষ্টি করেছি। তা কেন এবং কাদের জন্য জানো কি ? শুধুই তোমাদের জন্য। তোমরা সেগুলোর গোশ্ত খাবে, চামড়া দিয়ে তোমাদের প্রয়োজনীয় আসবাব তৈরী করবে। আর এভাবে তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য চলবে। তোমাদের পশুপাল যখন চারণভূমির উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে এবং সন্ধ্যায় যখন দলবেঁধে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সে দৃশ্য তোমাদের হৃদয়ে কতনা আনন্দের আবেশ সৃষ্টি করে। এই পশুশ্রেণী আমি তোমাদের খেদমতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। এদের দিয়ে তোমরা বোঝা বহন করাও। সুউচ্চ পাহাড়ে, যেখানে সড়ক নেই, পথঘাট নেই, সেই দুর্গম গন্তব্যে তোমাদের বোঝা পৌঁছে দেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ বাহন। শীতের প্রচণ্ডতা থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের দেহের উপর তোমাদেরকে কম্বল চাপাতে হয় না। সে আয়োজনও আমি সম্পন্ন করেছি—তাদের দেহে সৃষ্টি করে দিয়েছি ঘন পশমের পুরো আচ্ছাদন।

দেখুন, একই বকরী—কিন্তু পাহাড়ে যার জন্ম তার দেহে থাকে দীর্ঘ পশমের ঘন আবরণ। আর সমতলে যার জন্ম তার দেহে পশমের তেমন বাহুল্য নেই। জগত পরিচালনার এই নিপুন ব্যবস্থা আসমানওয়ালার—যিনি মানুষের জন্য যেখানে যা যেমন প্রয়োজন সবই সৃষ্টি করে দিয়েছেন যথাযথরূপে।—'আমি তোমাদের বাহনরূপে ঘোড়া-গাধা-খচ্চর সৃষ্টি করেছি, এবং ভবিষ্যতে আরো এমনসব বাহন প্রস্তুত করবো যা তোমরা জান না।' আল্লাহ্ পাকের এই সম্বোধন ছিল হযরত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে। ভবিষ্যতের যান্ত্রিক যানবাহন

সম্পর্কে তাঁদেরকে প্রচ্ছন্ন ভাষায় তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

ভবিষ্যতে গাড়ি প্রস্তুত হবে, দু'শ মাইল বেগে ছুটবে রেল।
মোটর চলবে পিচঢালা পথের বুক চিড়ে তীব্র বেগে।
সমুদ্রের বুকে ভেসে চলবে ইঞ্জিন চালিত জলজান।
আকাশে উড়বে এরোপ্লেন, মহাকাশে চলবে নভোজান।

এ সবকিছুই প্রস্তুত হবে মহান রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও ইশারায়। লৌহ আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি। পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি খনিজ পদার্থ মাটির নীচে আল্লাহ্ পাকের ইশারাতেই মজুদ হয়েছে। যদি এগুলোর কোন অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে মানুষের পক্ষে শূন্য থেকে সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল। শূন্য থেকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনেরই রয়েছে।

এক সময় মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই গাছপালা, পশু-পাখী, ফল-ফসল তথা দুনিয়ার যাবতীয় সৃষ্টি সম্ভার আল্লাহ্ পাকের নির্দেশেই সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশাল আয়োজন কাদের জন্য ? তাঁর নাফরমান মাখলুক মানুষের দুনিয়ার জীবন যাত্রাকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দময় করার জন্যই তো। মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল পানির। আল্লাহ্ পাক সেই পানি সবচেয়ে সহজলভ্য করে দিয়েছেন। তাদের পশুপালের জন্য শ্যামল ঘাস আর তৃণলতার প্রয়োজন ছিল। তারও তিনি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পৃথিবী দোদুল্যমান ছিল। পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি করে তাকে স্থির করে দিয়ে মানুষের বাসের উপযোগী করে দিয়েছেন।

কালামে পাকের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ পাক এভাবে তার নেয়ামতের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন–

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.

'চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ রয়েছে, আর অনেক উপকার রয়েছে এবং কিছুসংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক।'—*সূরা নাহ্ল : আয়াত - ৫*

রাব্বুল আলামীনের এই বিপুল আয়োজন যেই মানব-জাতির জন্য, সেই মানুষের মধ্যে যখন যৌবনের উচ্ছাস দেখা দেয় এবং সে পরিণতি ও পূর্ণতা লাভ করে, তখন যৌবন-মদ-মত্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের নাফরমানী করতে আরম্ভ করে। আল্লাহ্ পাকের আদেশ ও নিষেধ ভেঙ্গে নফস ও শয়তানের অনুসারী হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও বান্দা আল্লাহ্ পাকের নিকট যা চায় তিনি তা দান করেন। বান্দা তওবা করলে আল্লাহ্ পাক তার সে তওবা কবুল করেন।

বান্দা সে তওবা ভঙ্গ করে আবার পাপাচারী হয়ে ওঠে। সে বান্দা যদি আবার কখনো তওবা করে আল্লাহ্ পাক তার সে তওবাও কবুল করেন। আল্লাহ্ পাক বলেন—ওহে বান্দাগণ! তোমরাই বলো, উপকারীর সঙ্গে কি এমন আচরণই করা হয় যেমন তোমরা আমার সঙ্গে করছো ?

সন্তানের প্রতি পিতামাতা অসন্তুষ্ট হন কখন ? যখন সন্তান তাদের নাফরমানী করে—তখন সন্তানের প্রতি তাদের ইহ্সানের কথা এক এক করে মনে পড়তে থাকে, আর তাদের ইহ্সানের বিপরীতে সন্তানের অবাধ্যচারণ তাদেরকে ব্যথিত করে তোলে।

সে তুলনায় আমাদের প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের ইহ্সান কত ব্যাপক ও বিপুল। সামান্য এক ফোটা নোংরা পানি দিয়ে কী সুন্দর মানব অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরো কত বড় ইহসান যে, আমাদেরকে ঈমানের মত মহান দৌলত দান করেছেন। কুফর ও বেঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার চেয়ে বড় হালাকাত ও ধ্বংস আর কিছুই নেই। কারণ, কুফর বা বে-ঈমান অবস্থায় যাদের মৃত্যু ঘটে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার তাদের কোন সম্ভাবনা নেই। আখেরাতের অনন্তকালের জীবনে তাদের জন্য এমন কোন একটি দিন আসবে না, যেদিন তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে। সুতরাং মহান রাব্বুল আলামীন যে মেহেরবানী করে আমাদেরকে ঈমানের মত দৌলত দান করেছেন, তাঁর এ ইহ্সানের কোন তুলনা হয় না।

সবচেয়ে বড় সম্পদ

মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল ঈমান। অথচ আজ মানুষের কাছে সেই ঈমান সবচেয়ে বড় অবহেলার বস্তু। দু'চারশ' টাকার জিনিস কিনে মানুষ তা হিফাযতের জন্য কত না ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কাঁচা মাছ-মাংস কিনে এনে তা হিফাযতের জন্য ফ্রিজে সংরক্ষণ করে। সামান্য কয় টাকার কাপড়-চোপড় হেফাযত করার জন্য হাজার হাজার টাকার আলমারি তৈরী করে। পোশাক পরিচ্ছন্ন করার জন্য লন্ড্রি, ওয়াশিং মেশিন—কত কি আয়োজন! আমার ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়ার এই অতি সামান্য ও তুচ্ছ বস্তু হিফাযত করার জন্য আপনাদের তো আয়োজনের শেষ নেই, ফিকিরেরও কমতি নেই। কিন্তু অমূল্য সম্পদ ঈমান হিফাযত করার জন্য আপনাদের কাছে কী আয়োজন ও ফিকির রয়েছে? এর জন্য আপনারা কি চেষ্টা ও মেহনত করছেন?

চোখ দিয়ে অসঙ্গত কিছু দেখলেন, আপনার ঈমানের ক্ষতি হলো। কান দিয়ে গান শোনলেন, আপনার ঈমানের ক্ষতি হলো। যবান দিয়ে মিথ্যা বললেন,

ঈমানের ক্ষতি হলো। হারাম ও শরীয়তে ঘোষিত অবৈধ বস্তু পান বা ভক্ষণ করলেন, আপনার ঈমানের ক্ষতি হলো। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা ও প্রসিদ্ধির অসঙ্গত ব্যবহার করলেন, আপনার ঈমানের অপরিমেয় ক্ষতি করলেন। ইত্যাকার অসঙ্গত ও অবৈধ আচরণের মাধ্যমে নিজের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঈমান ধ্বংস করে দেয়ার পর আপনি যতই অর্থ-বিত্ত ও সহায়-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করুন না কেন, তাতে আপনার বিশেষ ফায়দা হবে না। এই তুচ্ছ বস্তু ও বিষয়গুলো আপনার চূড়ান্ত মুক্তি ও কামিয়াবীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না। তাই আমার অনুরোধ, নেক কাজ যতই ছোট ও ক্ষুদ্র হোক, তার প্রতি কখনো অবহেলা না করে আমলের চেষ্টা করুন। আর গুনাহ্ যতই তুচ্ছ হোক তা থেকে আত্মরক্ষা করে চলুন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন—

'ওহে আমার বান্দাগণ! তোমরা যখন কোন নাফরমানি কর, সে নাফরমানি ছোট কি বড় তার প্রতি লক্ষ্য না করে দেখ তাতে কার নাফরমানী করা হচ্ছে। সন্দেহ নেই যে, এতে রাব্বুল আলামীনের নাফরমানী করা হয়। কাজেই সেই মহান জাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাফরমানি বা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে চেষ্টা কর। এর নামই হল ঈমান।'

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাকের কত বড় ইহ্সান যে, তিনি আমাদেরকে মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারপর ঈমানের মত দৌলত দান করেছেন এবং সর্বোপরি আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ পাকের এত অনুগ্রহ ও ইহ্সানের পরও তুচ্ছ অর্থ-সম্পদ আর দুনিয়াবী ক্ষণিকের সুখ-শান্তির জন্য অসঙ্কোচে দ্বীন ত্যাগ করছি। সামান্য কিছু ডলার, আমেরিকার একটি পাসপোর্ট আর গ্রীন কার্ডের জন্য ঈমান বরবাদ করে দিচ্ছি। নির্ভাবনায় সন্তানকে সেই কুফরের আখড়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতে আমরা কী পেলাম আর কী হারালাম, যোগ-বিয়োগ করে দেখা উচিত।

একবার ইংল্যান্ড সফরে এক লোকের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, টাকা-পয়সা যথেষ্ট উপার্জন করেছি, কিন্তু ঈমান বিক্রি করে দিয়েছি। আজ সন্তানদের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যার যেমন ইচ্ছা চলছে। যেই ধন-দৌলতের জন্য নিজের জীবন পাত করেছি এবং দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস করে দিয়েছি, আজ সেই ধন-দৌলতই মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ উপার্জনের ধান্ধায় যখন অন্ধ ছিলাম, তখন এসব বিষয়ের প্রতি নজর পড়ে নি। যখন পড়লো, তখন ফিরে আসার সকল রাস্তাই বন্ধ বলে মনে হলো।'

দাওয়াত ও তাবলীগের আছর

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আল্লাহ্ পাক এমন আছর ও ক্রিয়া রেখেছেন যে, এ কাজের সঙ্গে যুক্ত হলে, যে আপন জনেরা দূরে সরে গিয়েছিলো, তারা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবে। যারা আপনার নিয়ন্ত্রণ-বলয় থেকে দূরে ছিটকে গিয়েছিলো, তারা পুনরায় আপনার নিয়ন্ত্রণ-বলয়ে ফিরে আসবে। যারা পর ছিল তারা আপন হয়ে আপনাকে ঘিরে রাখবে। যেখানেই আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত তথা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত চলবে, সেখানেই আল্লাহ্ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ নেমে আসবে। যে আপনজনদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন শীথিল হয়ে গিয়েছিলো, তারা আবার স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং অন্য সকলের জন্যও দ্বীনের দরজা খুলে দিবে। আপনাদেরকে এদেশেই যদি থাকতে হয়, এবং নিজের সন্তানদেরকেও বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতই হবে তার অন্যতম উপায়।

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এমন এক মহান কাজ যে, এর সঙ্গে যুক্ত হলে মানুষ ঈমানের আলো লাভ করে এবং ক্রমশ সে আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এর বদৌলতে অন্যদের জন্যও দ্বীন ও ইসলামের দরজা খুলে যেতে থাকে। এই দাওয়াত ও তাবলীগ ছিল আল্লাহ্ পাকের এক লাখ চব্বিশ হাজার আম্বিয়ায়ে কেরামের মেহনত। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিহাস একথার সাক্ষ বহন করে যে, তারা যখন কোন কওমের কাছে গিয়ে لا اله الا الله এর দাওয়াত দিয়েছেন, দলে দলে সে কওমের লোকজন তাদের রবের দিকে ফিরে এসেছে। কওমের পর কওম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর বাতেল শক্তি ক্রমশ নিস্তনাবুদ হয়ে গিয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী মেহনত এক 'আলমী মেহনত'। এ মেহনত গোটা জগত ও জগদ্বাসীর মেহনত। আপনারা যদি এই সুদূর ইংল্যান্ডে থেকেও এই মেহনতকে নিজেদের মেহনত হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে কামিয়াবী এখানে এসেও আপনাদের পদচুম্বন করবে। আমি যেমন আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, আপনারাও তেমনি আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই উম্মত। আমাদের নবীর পর আর কোন নবী নেই—এই বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরী নবী হওয়ার উদ্দেশ্য হল—নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যে

ব্যক্তিই নবুওয়াতের দাবী করবে, সে ব্যক্তি ভ্রষ্ট, মুরতাদ এবং কাফির। কিন্তু মানুষের কাছে ঈমান ও ইসলামের বার্তা পৌছানোর এবং তাদেরকে দ্বীনের কথা বুঝানোর যে কর্মপ্রক্রিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালে জারি ছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে সে দায়িত্ব কার কাঁধে বর্তাবে? কে আঞ্জাম দিবে এ মহান কর্মযজ্ঞ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর দুনিয়াতে দু'টি অবস্থার কোন একটি অবস্থা হওয়া উচিত ছিল। হয় কুফরীর অস্তিত্বই থাকবে না। অথবা, যারা মুসলমান হয়েছে, তারা কখনোই গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এই অবস্থাদ্বয়ের কোনটিই হয় নি। আজ গোটা দুনিয়ায় কুফুরিরই জয়জয়কার। মুসলমানরা দলে দলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে বা মুরতাদ হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে। আরবরাই যেখানে ধর্ম ত্যাগ করছে, সেখানে আমরা আজমী বা অনারবদের তো কথাই নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ভূমি ও সাহচর্য থেকে আমাদের অবস্থান তো বহু দূরে। আফ্রিফার লাখ লাখ মুসলিম পরিবার খৃষ্টান হয়ে গেছে। গত বছর অষ্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে এমন অনেক আরব-আফগান পরিবার রয়েছে, যাদের ছেলে-সন্তানরা জানেই না যে, তাদের বাপ-দাদারা মুসলমান ছিল। এভাবে বহু মুসলমানই ইসলামের পবিত্র পরিবেশ থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে।

আর আমরা যারা এখনো নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করি, তাদের অবস্থাও করুন—ঈমান ও আমলে তাদের বড়ই নড়বড়ে অবস্থা। সকল মুসলমানের ঈমান ও আমল পরিশুদ্ধ হোক। যারা ঈমান ও ইসলাম হারিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা ঈমান ও ইসলামের পথে ফিরে আসুক, যারা কখনো ঈমানের আলোময় জগতে ছিল না, তারা কুফরীর অন্ধকার জীবন ছেড়ে ঈমান ও ইসলামের আলোময় জগতে প্রবেশ করুক—এটাই ছিল নবীদের সাধনা। জগতে হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের সিলসিলা খতম হয়ে যাবার পর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আখেরী উম্মতকে এই মহান কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন—

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। কারণ, গোটা দুনিয়াবাসীর কাছে আমার পয়গাম পৌছে দেয়ার জন্য তোমাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে।—*আলে ইমরান-১১০*

তাবলীগের 'দাওয়াতী আমল' সকলের দায়িত্ব

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কোন বিশেষ দল বা জনগোষ্ঠীর নয় ; বরং উম্মতের যে ব্যক্তিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী হিসাবে স্বীকার করেছে এবং হৃদয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করেছে যে, তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না, নবীর দ্বীন ও পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাদেরই। لا اله الا الله محمدر الرسول الله –এই কালিমা আমাদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য অপরিহার্য করে। আর لانبي بعدى (আমার পর আর কোন নবীর আগমন হবে না) এই বাণীর বিশ্বাস আমাদের কাঁধে দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দায়িত্ব অর্পণ করে। এর জন্য আলেম হওয়া যেমন শর্ত নয়, তেমনি কোন বিশেষ দল বা জনগোষ্ঠীভুক্ত হওয়াও আবশ্যক নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– بلغوا عني ولو آية আমার একটি কথাও যদি কারো জানা থাকে, তা লোকজনের কাছে পৌঁছে দাও। কাজেই কোরআন-কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ একজন ব্যক্তিও দাওয়াতের কাজ করতে পারে।

আসমান থেকে দুনিয়াতে চারটি বড় কিতাব নাযিল হয়েছে, এবং ছোট পুস্তিকা নাযিল হয়েছে দেড়শ'। আর সমস্ত আসমানী কিতাবের সারসংক্ষেপরূপে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে পবিত্র কোরআন শরীফ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে তওরাতের বদলে দান করেছেন সূরা ফাতিহা, ইঞ্জিলের বদলে দান করেছেন সূরা মায়িদা, আর যবূরের বদলের দান করেছেন حم (হা-মীম)-এর সূরাসমূহ। কোরআন শরীফে حم দিয়ে শুরু হওয়া সাতটি সূরা রয়েছে। এই সাতটি সূরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক আসমানী কিতাব 'যবূর'-এর সমকক্ষরূপে দান করেছেন। মোটকথা, আসমান থেকে ইতিপূর্বে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সারসংক্ষেপ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাত্র কয়েকটি সূরার মধ্যেই দান করা হয়েছে। সেই সূরাগুলো হলো সূরা ফাতিহা, সূরা মায়িদা এবং حم (হা-মীম)-এর সাত সূরা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অবশিষ্ট কোরআন দিয়ে আল্লাহ্ পাক আমাকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছেন।

সূরা ফাতেহা কোরআনের সারসংক্ষেপ

ওলামায়ে কিরাম লিখেছেন, গোটা কোরআন শরীফের সারসংক্ষেপ হলো সূরা ফাতিহা। আর সূরা ফাতিহার সারসংক্ষেপ হলো একটি মাত্র আয়াত—

ایاك نعبد و ایاك نستعین । এখন যদি বলা হয়, সমস্ত আসমানী কিতাবের সারসংক্ষেপ হলো ایاك نعبد و ایاك نستعین তাহলে অতিরঞ্জন হবে না।

ایاك نعبد 'আয় আল্লাহ্! একমাত্র আপনারই ইবাদত করি।' ইবাদতের অর্থ কি এই যে, নামায পড়ে বাইরে গিয়ে সুদের কারবার করবো আর শরাব বেচবো। মোটেও না। হাটবাজার, অফিস-আদালত, মদীনা আর ম্যানচেষ্টার সর্বত্রই হবে আল্লাহ্ পাকের সমান আনুগত্য। আমেরিকা, পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান, দেশ বা ভূখণ্ড যাই হোক না কেন, রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই চলবে। কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের নয়। জীবনের তত্ত্ব সম্পর্কে আজ মানুষ যতই অন্ধ হোক না কেন, একদিন মৃত্যু তার চক্ষু খুলে দিবে। সেদিন মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য চরম আক্ষেপ করবে। কিন্তু সে সময়ের আক্ষেপ তার কোন উপকারই সাধন করতে সক্ষম হবে না।

ইতিপূর্বে আমি বলেছিলাম যে, ایاك نعبد হলো গোটা কোরআন শরীফের সারসংক্ষেপ। অর্থাৎ, 'আয় আল্লাহ্! আমি আপনারই আনুগত্য করি। وایاك نستعین এবং জীবন-কর্মের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আপনারই সাহায্য চাই ; অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা বা কোন ব্যক্তির কাছে নয়। আয় আল্লাহ্! আমার জীবন যাত্রার সকল আয়োজন একমাত্র আপনিই সম্পন্ন করতে পারেন।

আপনি যদি কাউকে এভাবে বলেন যে, 'আমার যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ্ পাক সমাধা করেন। কাজেই জীবনে যখন যা প্রয়োজন সবকিছু আল্লাহ্ পাকের নিকটই প্রার্থনা করা উচিত এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে চলা উচিত।' আপনার এই চারটি মাত্র বাক্য দ্বারাই গোটা আসমানী ইলমের দাওয়াত হয়ে যাবে। কোরআন, হাদীস এবং আসমানী সকল কিতাবের দাওয়াতের সারমর্ম এই কথা চারটি। এ কাজ একজন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে করা যেমন সম্ভব, তেমনি একজন অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের পক্ষেও দুরূহ নয়।

শোনতে অতি সাধারণ এই চারটি বাক্যের মধ্যে হয়তো কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। আমি বলে গেলাম, আর আপনারা শোনে গেলেন। এই শব্দগুলির কোন বিশেষ মাহাত্ম্য আপনাদের নিকট অনুমিত হলো না। কিন্তু বাস্তবে এর পিছনে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত শক্তির অনন্ত ধারা। এই আসমানী বাণী যখন ঘর থেকে ঘরে, জন থেকে জনে পৌছতে পৌছতে সকলের কাছে পৌছে যাবে, তখন বাতিলের সৌধটি আপনিই ধ্বসে পড়বে। তাদের এই স্ফীত-দেহ সুসাস্থের পরিচয় বহন করে না। রোগের কারণে যার দেহ ফুলে ওঠেছে যে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখেই বুঝতে পারবেন যে, তার এই স্ফীতি সুস্বাস্থ্যের কারণে নয়, বরং

রোগের কারণেই সে এভাবে ফুলেফেঁপে ওঠেছে। তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তার স্ফীতি দেহে দূষিত জল সঞ্চয়ের কারণে।

আপনার আমার সাধারণ চোখে একজন বদদ্বীন মানুষও হয়তো সুখী-সফল মানুষরূপে প্রতিভাত হবে। কিন্তু একজন অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন দ্বীনদার মানুষ তাকে দেখেই বুঝতে পারবেন যে, তার ভিতরের সমস্ত নেযাম বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

কোন জাতি যখন লজ্জাশরম ত্যাগ করে শালীনতা বিবর্জিত জীবন যাপন করতে থাকে, আল্লাহ্ পাক সে জাতিকে ধ্বংস করে দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে কেউ যদি দাওয়াত ও তবলীগের মেহনত করতে থাকে, আল্লাহ্ পাক তাকে রক্ষা করেন এবং তাকে দ্বীন যিন্দা করার যরী'আ হিসাবে কবূল করেন।

আপনারা বিশ্বাস করুন, কোন সম্রাট বা ক্ষমতাধর কোন রাষ্ট্রই কারো রুটি-রোজির ব্যবস্থা করতে পারে না। সুতরাং এই অর্থে কোন বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ বা আনুগত্য প্রদর্শন করা অর্থহীন। বরং আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন যে, আপনাদের মধ্যেই এমন অনেক লোক আছেন, যারা গোটা আমেরিকার হিদায়াতের যরী'আ হতে পারেন। আসলে আপনারা নিজেরা নিজেদের মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন না। আপনাদের ধারণা— আমেরিকা আপনাদের রুটির ব্যবস্থা করছে। কিন্তু জেনে রাখুন, আল্লাহ্র কসম! আপনাদের উসীলাতেই বরং আমেরিকা খেয়ে-পড়ে বেঁচে আছে। পৃথিবীর বুক থেকে যখনই মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, (ونفخ في الصور) তখনই আল্লাহ্ পাক কিয়ামত কায়েম করে দিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

لا تقوم الساعة حتي يقال على الارض الله الله -

জগতে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র নাম স্মরণকারী একজন লোকও বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পৃথিবীকে তার আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করে রাখবে। চন্দ্রালোকে চরাচর মায়াময় হয়ে ওঠবে। দিন-রাতের পালাবদল অব্যাহত থাকবে। গাছে গাছে হাওয়ার মাতামাতি থাকবে। সমুদ্রবক্ষে ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকবে। বাগানে বাগানে ফুলের কলিরা হেসে লুটোপুটি খাবে। কিন্তু যখনই পৃথিবী মুসলমান শূন্য হয়ে যাবে, আল্লাহ্র কসম! আমার আল্লাহ্ গোটা সৃষ্টি জগতকে ডিমের খোশার মতই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—

إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكب انتشرت * وإذا البحار فجرت * وإذا الشمس كورت * واذا النجوم انكدرت * واذا الجبال سيرت * واذا العشار عطلت * واذا الوحوش حشرت * واذا البحار سجرت * واذا النفوس زوجت * واذا الموؤدة سئلت * بأى ذنب قتلت * واذا الصحف النشرت * واذا السماء كشطت * اذا الجحيم سعرت * واذا الجنة ازلفت * علمت نفس ما احضرت * فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس * والليل اذا عسعس * والصبح اذا تنفس * انه لقول رسول كريم *

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীসমূহ উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো ? যখন আমলনামা খোলা হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে এবং জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি উপস্থিত করেছে। আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, শপথ নিশাবসান ও প্রভাত আগমন কালের, নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী। —*সূরা তাকবীর ও ইনশিকাক*

এই হল কিয়ামতের বিবরণ। এখন শুধু মুসলমানদের মৃত্যুর অপেক্ষা। মুসলিম জাতির বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ পাক গোটা জগৎকে খানখান করে দিবেন। সূর্য-চন্দ্র, বহমান বাতাস, এই মহাশূন্য সবকিছু এমনভাবে বিনাশ করে দেয়া হবে যেন এককালে তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আজ শুধু মুসলমানদের উসিলাতেই এই সৃষ্টিজগৎ টিকে আছে। কাজেই নিজেদের মান সম্পর্কে সচেতন হোন। তুচ্ছ কিছু ডলারের জন্য নিজেদের ঈমান ও আমল বিক্রি করে দিয়ে আমেরিকার গোলাম হয়ে যাবেন না। নিজেদের

জীবনে মহান রাব্বুল আলামীনের দাসত্বকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করে নিন।

আমি এ বিষয়টির অনেকটা এভাবে তুলনা দিয়ে থাকি যে, মনে করুন কয়েকশ' লোকের বরযাত্রী চলেছে। বর চলছে সকলের মাঝখানে। তাকে ঘীরে চলছে সহযাত্রীদের দল। হঠাৎ বর সহযাত্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইছে যে, বিয়ে-বাড়ীতে তার আহারের ব্যবস্থা হবে কি না ? বরের এই প্রশ্ন শোনে সহযাত্রীরা তাকে পাগল ছাড়া আর কি ভাবতে পারে বলুন ? বরের উসিলায় যেখানে সকলে খেতে পাবে, সেখানে বর যদি আর সকলকে নিজের আহার প্রাপ্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, সে পাগলই বটে। বর ছাড়া বিয়ে বাড়ীতে বরযাত্রীদের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি বর ছাড়া সেখানে তাদের কোন আপ্যায়ন-আহারেরও ব্যবস্থা হতে পারে না।

সুতরাং আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আপনাদের উসিলাতেই ইউরোপ-আমেরিকা বেঁচে আছে। এশিয়া, আফ্রিকা তথা গোটা দুনিয়ার প্রাণীকুল আপনাদের উসিলাতেই খেতে পাচ্ছে। দুনিয়া থেকে যেদিন আপনাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে, সেদিন সৃষ্টি জগতে এই দুনিয়ার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। কাজেই আপনারা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হোন এবং হীনমন্নতা ত্যাগ করুন। আপনাদের নিকট অর্থ-সম্পদ নেই তো কি হয়েছে? এতে আপনাদের মান ও মর্যাদার সামান্যও কমতি হবে না।

মাহ্বুবে খোদার আযমত

আল্লাহ্ পাকের নিকট আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এমনই সুমহান যে, তিনি বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে নিজের কথায় দৃঢ়তা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর হাবীবের প্রাণের কসম করে বলতেন, لعمرك –'আয় নবী! আপনার প্রাণের শপথ!' আমাদের উর্দু ভাষায়ও কথা প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির জানের কসম খাওয়ার প্রচলন আছে। আল্লাহ্ পাকও তেমনি তাঁর হাবীবের জানের কসম খেয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং প্রিয় হাবীবকে আমন্ত্রণ জানিয়ে জমিন থেকে উঠিয়ে তাঁর মহান আরশে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের সম্মুখ থেকে কুদরতী সমস্ত পর্দা হটিয়ে দিয়ে মুখোমুখী হয়ে বলেছিলেন– يا حبيبي يا محمد ادن مني 'আয় আমার প্রিয় মুহাম্মদ! আপনি আমার আরো নিকটে আসুন।' তারপর তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন জান্নাতের চাবির মত এক মহা মূল্যবান উপহার। তাঁকে সকল নবীর সর্দার বানিয়ে তাদের ইমামতি করালেন এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে অন্য সকল নবী ও উম্মতের জন্য জান্নাত হারাম করে দিলেন। তাঁর উসিলায় তাঁর উম্মতগণও এমন মর্যাদা

লাভ করলো যে, তাদের জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে আর সকল উম্মতের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ। এত যার মর্যাদা, অনাহারের কষ্ট দূর করার জন্য তাঁকে পেটে পাথর বাঁধতে হয়েছিলো। তাঁর সঙ্গী-সাথীরাও দুঃসহ দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। কাজেই আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আপনাদের নিকট যদি ডলারের পর্যাপ্ত সংগ্রহ না থাকে তাতে কী হয়েছে! ধন-সম্পদ বা অর্থ-বিত্ত না থাকা অপমান ও যিল্লতি নয়। আমাদের প্রকৃত যিল্লতী হলো আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যচারণে। সুতরাং সেই লাঞ্ছনাকর জীবন থেকে তওবা করুন। নি'চয় আল্লাহ্ পাক থেকে অধিক দয়ালু আর কেউ নেই।

তওবার বরকত

একটি ঘটনা দিয়ে আমার আলোচনার সমাপ্তি টানছি। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের জামানায় বনী ইসরায়ীলে এমন অপদার্থ এক যুবক ছিল, যার সীমাহীন লাম্পট্য ও অপকর্মের দরুন জনসাধারণ যারপরনাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছিলো। ফলে তারা সেই যুবককে নগর থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

মন্দ মানুষকে মন্দ বলা সাধারণত তাকে মন্দের দিকে আরো অধিক ঠেলে দেয়। তাই মন্দ লোককে তিরস্কার ও তার সঙ্গে কঠোরতা না করাই ছিল নবীদের তরীকা। তাকে বরং ভালবেসে কোমল সম্ভাষনে সত্যের প্রতি আহ্বান জানালে তার পক্ষে সত্য গ্রহণ করে নেয়া সহজ হয়। কঠোরতা দিয়ে মানুষকে আনুগত্য স্বীকার করানো দূরহ। মানব-স্বভাব সাধারণত ভালবাসা ও কোমলতার কাছেই আনুগত্য স্বীকার করে।

মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলতেন, অনেক দ্বীনদার লোকই বদদ্বীনী বিস্তারে সহায়তা করছে। কারণ, পথহারা কারো সঙ্গে নফরত ও ঘৃনার সম্পর্ক তাকে আরো বিপথে ঠেলে দেয়। সে দ্বীন থেকে আরো দূরে সরে যায়। আর ভালবাসা মানুষকে কাছে টানে এবং আনুগত্যে সহায়তা করে।

যাহোক, নগরবাসীরা যুবককে নগর থেকে বের করে দিল। শুরু হলো এক নিরুপায় যুবকের নির্বাসিত জীবন। নগরের বাইরে বিরাণ বনের প্রান্তে অসহায় ভাবে দিন কাটতে লাগলো তার। আত্মীয়-পরিজনহীন নির্বান্ধব পরিবেশে তার জীবন অতি সঙ্কুচিত হয়ে এলো। আহার্যের ব্যবস্থা নেই। অসুস্থ দেহের জন্য চিকিৎসার আয়োজন নেই। ফলে ক্রমশ তার প্রাণশক্তি নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে সে মৃত্যুর পথে যাত্রা করলো। যুবক নিজের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পদধ্বনি শোনতে পেয়ে আশেপাশে তাকিয়ে কারো উপস্থিতি কামনা করলো। কিন্তু কারোরই দেখা

পেল না। অবশেষে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললো—

'আয় আল্লাহ্! আমি যদি জানতে পেতাম যে, আমাকে সাজা দিলে আপনার রাজত্বের বিস্তার হবে, আর মাফ করে দিলে তা সঙ্কুচিত হবে, তাহলে আপনার নিকট মাফ চাইতাম না। কিন্তু আয় আল্লাহ্! আমাকে শাস্তি দিয়ে যদি আপনার রাজত্বের কোন বৃদ্ধি না ঘটে তাহলে মেহেরবানী করে আমাকে আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং আমাকে মাফ করে দিলে যদি আপনার রাজত্বের বিস্তার না ঘটে, তাহলে আমাকে মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ্! সকলে আমাকে ত্যাগ করেছে। আজ এই নির্জনে, নির্বান্ধব পরিবেশে আমি মৃত্যুমুখে পতিত। গোটা জীবন আপনার নাফরমানী করে কাটিয়েছি। আমার এই কঠিন মুহূর্তে দয়া করে লোকদের মত আপনিও আমাকে ত্যাগ করবেন না। এই কাতর মিনতি জানিয়ে যুবক মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

আল্লাহ্ পাক সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা আলাইহিস্সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করে বললেন—অমুক বনভূমিতে আমার এক বন্ধু ইন্তেকাল করেছে, তার গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করুন। আর গোটা নগরে এই মর্মে ঘোষণা করে দিন যে, যারা ক্ষমা পেতে চায়, তারা যেন আমার সেই বন্ধুর জানাযায় শরীক হয়। তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে আমি মাফ করে দিব।

ঘোষণা শোনে গোটা নগর ভেঙ্গে পড়লো এবং সকলে সেই বনভূমির প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে লোকজন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো যে, মৃত ব্যক্তিটি নগর থেকে বিতাড়িত সেই লম্পট যুবক। সকলে হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট নিবেদন করে বললো, আয় আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এ কী বলছেন? এই যুবক তো নগরের সেরা লম্পট ছিলো। তার লাম্পট্যে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা তাকে নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। অথচ আপনি বলছেন, আপনার রব তাকে বন্ধু হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ফলে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ পাকের নিকট নিবেদন করলেন—'আয় আল্লাহ্! লোকজন বলছে, এই ব্যক্তি আপনার দুশমন। অথচ আপনি তাকে বন্ধু হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। এর রহস্য কী ? জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন, লোকজন ভুল বলে নাই। আর আমার কথাও অসত্য নয়। যুবক তার গোটা জীবন আমার দুশমন হিসাবেই ছিল। কিন্তু মৃত্যুর সময় সে তার অসহায়ত্ব অনুভব করতে পেরে চারিদিকে তাকিয়ে যখন আত্মীয়-স্বজনদের কাউকে দেখতে পেল না, তখন সে কাতরভাবে আমার দয়া ভিক্ষা করলো। তখন তার এই অসহায় অবস্থায় অপরাধের জন্য তাকে পাকড়াও করতে আমার লজ্জা হলো। আমার ইজ্জতের কসম! সে যদি তখন গোটা দুনিয়াবাসীদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতো, আমি সকলকেই ক্ষমা করে দিতাম।

কিন্তু সে খুবই সঙ্কীর্ণ এক প্রার্থনা জানালো।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের সম্পর্ক সেই উদার রবের সঙ্গে। কাজেই সেই রবের কাছে তওবা করুন। দুনিয়ার জীবনে মুসলমান হ'ে এবং দ্বীন ও ঈমানের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ্ পাকের করুণা প্রার্থনা করুন। ইনশাআল্লাহ্! আল্লাহ্ পাক আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতই মনোহর করে দিবেন। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে আমলের তওফীক দান করুন। আমীন।

—▣—

আল্লাহ্‌র সাক্ষী

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . يايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور -

وقال النبى صلى الله عليه وسلم الا فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال صلى الله عليه وسلم -

আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! এই নিখিল বিশ্বে দৃশ্য-অদৃশ্য যাকিছু রয়েছে সবই মহান রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি। এই যে আমি, আপনি জগতে মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছি, এর জন্য আমাকে না আপনাকে, কাউকেই কোন পরিশ্রম করতে হয় নি। না এ জন্য মানব জাতির কাউকে কখনো কোন আন্দোলন করতে হয়েছে। এই দেহ এবং প্রাণ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে নিজ ইচ্ছাতেই দান করেছেন। পথের পাশে নর্দমায় এই যে কিড়ার দল কিল্‌বিল্ করছে, তাদের একটি আমিও যেমন হতে পারতাম, তেমনি আপনাদের পক্ষেও হওয়া অসম্ভব ছিল না। অপর দিকে আল্লাহ্ পাকও এই দিকে ইঙ্গিত করে মানব জাতিকে লক্ষ্য করে কঠোর ভাষায় বলেছেন— وننشئكم فيما لا تعلمون 'তোমাদের কল্পনারও অতীত আকৃতিতে তোমাদেরকে পরিবর্তন করে দিব।' এর তফসীর প্রসঙ্গে আলেমগণ লিখেছেন, নাফরমান বান্দাকে আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে কুকুর, বানর, কীট-পতঙ্গ যা ইচ্ছা বানিয়ে দিতে পারেন। গোটা সৃষ্টিকুল তাঁর ইচ্ছার দাস, তিনি রাজাধিরাজ ; সকলেই তাঁর ক্ষমতাধীন। কত বৈচিত্রময় তাঁর সৃষ্টি— কোন বৃক্ষ-পাতায় এমন মৌ মৌ গন্ধ যে, সেই সুগন্ধে গোটা আঙ্গিনা আমোদিত হয়ে ওঠে। কত বৃক্ষ এমন আছে, যার দুর্গন্ধে কাছে যাওয়াও দুষ্কর। আবার কত বৃক্ষ ফুলের গন্ধে মন-মাতানো।

গোলাপ ফুল মনোহারী বর্ণ আর মন-মাতানো গন্ধে মুগ্ধকর।

চামেলী ফুলে শুভ্র বর্ণের ছোঁয়া।
অপূর্ব সাজে ঝুলে থাকা গাছে গাছে আঙ্গুর থোকা।
রঙ-বর্ণের আপেল ভরা বাগান।
সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পাহাড়।

শ্যামল আঁচল বিছানো পৃথিবী আর বিপুল বৈচিত্র ভরা তাঁর এই সৃষ্টিজগত অনন্ত কুদরতের অকল্পনীয় বিকাশ। দিন কয়েকের এই পৃথিবীতে বিপুল বস্তু-সম্ভারের অপূর্ব আয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবী চলতিপথে ক্ষণিকের যাত্রা বিরতির একটি ষ্টেশন ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ষ্টেশনে যাত্রীরা ওঠে-নামে, আগত গাড়ীর অপেক্ষায় কিছু মানুষ বসে থাকে। মৃত্যু গাড়ীতে আরোহণ করে কেউ কেউ চলে যায়। নতুন যাত্রীরূপে কারোবা আগমন ঘটে। যে পৃথিবীর স্থিতি অতি স্বল্পকাল, তাকেই আল্লাহ্‌ পাক কত না সুন্দর সাজে সাজিয়েছেন। সমুদ্রের মনোহারী রূপ, অথৈ সাগরের তলদেশে অপূর্ব এক জগত। পর্বত-শৃঙ্গের প্রান্ত হতে উদিত সূর্য একরূপ, আর আদিগন্ত বিস্তৃত মরু-প্রান্তে সূর্যের উদয়-অস্ত মোহময় অন্য এক রূপের অবতারণা করে। চারণভূমিতে বিচরণরত পশুপাল, নিশিপ্রান্তে কুলায় প্রত্যাগত পাখীর ঝাঁক, আর প্রভাতে আহারের খোঁজে বেরিয়ে পড়া পাখীরা দর্শকের হৃদয়ে ভিন্ন এক মুগ্ধতার আবেশ সৃষ্টি করে। কুকিলের কুহুতান, বুলবুলির সুর-কাব্য, ময়ূরের মেখলা পেখম মেলে সুখের নৃত্য। বনে বনে হরিণের তটস্ত ছুটে চলা। বাঘের ভয়াল থাবা আর পিলে চমকানো হুঙ্কার। ফনা তোলা সাপের ফোঁসফোসানি। মায়ের বুকে অমৃত-ধারা। পাহাড়ের কোল বেয়ে বয়ে চলা ঝর্ণাধারা। ফুলেফুলে শুভিত বাগান। ফসলপূর্ণ সবুজ মাঠ—পৃথিবীর এ এক চিত্তহারী রূপ।

তুষার ঢাকা পাহাড়ের শুভ্র চূড়া, বর্ষার ঝড়োঝড়ো ক্লান্ত বেলা, ছলো ছলো ঝর্ণার উচ্ছল ছুটে চলা। ক্ষণিকের অতিথিশালার এই যে অপরূপ রূপ-সম্ভার; ষ্টেশনের এমন ঝলোমলো সাজ যে, অতিথী পথিকের মন সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে তার গন্তব্য ভুলে যায়। তাহলে ভেবে দেখুন, যে ঘরের সৃষ্টি ও সৌন্দর্য বিন্যাসকে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর সৃষ্টি কুশলতার অনন্য বিকাশ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং যে গৃহ প্রতিদিন পাঁচবার নিয়মিত সজ্জিত করা হয়, তার রূপ কেমন মোহময় হতে পারে ?

জান্নাতের ঘর

যে ঘরের নির্মাণ সৌকর্যে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর 'খালিক' তথা স্রষ্টা গুণের অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়েছেন, যে ঘরে না মাটি, না পাথর, না চুন-সুরকি, না কাটা না

কীলকের ছোঁয়া আছে, সেখানে অসুন্দর ও পীড়াদায়ক কিছুর অস্তিত্ব থাকার প্রশ্ন ওঠে না। বাঘ-ভালুক, সাপ-বিচ্ছু, ময়লা-আবর্জনা, দুর্গন্ধ-নর্দমা সেখানে অকল্পনীয় বিষয়। যে ঘর সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচবার করে সজ্জিত করা হচ্ছে, যে ঘর ফিরিশতাদেরকে দিয়ে নয়, বরং আল্লাহ্ পাক নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তা যে সৌন্দর্য্যের অপূর্ব লীলাভূমি হবে তাতে সন্দেহ কী ?

একজন রুচিশীল অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের নকশা, অতঃপর দক্ষ মিস্ত্রির হাতের ছোঁয়া, এ দু'য়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠতে পারে এক অপূর্ব নিলয়ের অবকাঠামো। আপনারা ভেবে দেখুন—যেখানে যমীন হলো স্বর্ণের, মাটি মিশকের, আর ঘাস হলো জাফরান। এখানে সেখানে প্রবাহিত ঝর্ণা, নদী-নালা-খাল-বিল। শ্যামল প্রান্তরে মেশকের টিলা, আম্বরের পাহাড়। সুতরাং সেই মনোরম পরিবেশে আল্লাহ্ পাক এক বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিজেই তার নকশা করলেন। ইট তৈরী করলেন স্বর্ণ-রৌপ্য, যমর্‌রদ ও ইয়াকূত দিয়ে। তারপর নিজেই গেঁথে তুললেন ইটের পর ইট দিয়ে মনোরম এক সৌধ। সেই সৌধটির মনোহারিত্ব প্রকাশের ভাষা মানুষের মুখে না-ই থাকবার কথা। অনুভবেও মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাক অতঃপর নিজের অনন্ত শিল্প গুণের অপরূপ প্রকাশ ঘটিয়ে তা সাজিয়ে তুললেন; পর্দা, গালিচা আর বিচিত্র সব ফার্নিচার দিয়ে। তারপর সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এবং আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচবার তার সৌন্দর্য বর্ধনের ব্যবস্থা করলেন।

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমনই মহান এক সৃষ্টিকর্তা যে, দুর্গন্ধময় নোংরা এক ফোটা পানির প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দানের ফলে তা এমন আকর্ষণীয় আকৃতি লাভ করে যে, গোটা সৃষ্টিকুল তার প্রতি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আর সে আল্লাহ্ যখন নূরের আকৃতি সৃষ্টি করবেন তা কেমন আকর্ষণীয় হতে পারে ভেবে দেখুন। নিরেট পাথরের প্রতি যাঁর দৃষ্টিপাত হলে তা মর্মর ও পোখরাজ হয়ে যায়। কয়লার প্রতি যাঁর দৃষ্টি পতিত হলে তা হিরায় পরিণত হয়। সামান্য বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে যিনি মুক্তা সৃষ্টি করেন। সেই আল্লাহ্ পাক যখন জান্নাতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন—যেখানে সব কিছুই নূরের তৈরী। স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের নূর থেকে যাদের উৎপত্তি—সেই নূরের তৈরী ঘর, সেই নূরেরই দেহ ও যৌবন। সেই নূর হতে বিচ্ছুরিত শক্তি, বাহন ও ভ্রমণের যাবতীয় আয়োজন। সেই নূরের বিচ্ছুরণে সৃষ্ট শ্যামল ভূমি। ঘাসের গালিচা। ফলে-ফুলে শোভিত বৃক্ষ ও বাগান। পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণার কল্‌কল্-ছল্‌ছল জলধ্বনি। সুপেয় পানির ধারা। নানাবিধ পানপাত্র আর সুদৃশ্য আসন। মোটকথা, সেই অভিন্ন নূর হতে উৎসারিত জান্নাতের সকল আয়োজন

কত যে মনোহর হবে, তা অনুভব করার ক্ষমতা মানুষের কল্পনা শক্তিরও নেই।

দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক কাউকে সৌন্দর্য দান করেছেন, কাউকে অসুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে সম্মান দান করেছেন, কাউকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন। একই উৎস থেকে সৃষ্ট কয়লা তুচ্ছ বস্তু, আর হীরা মহামূল্যবান পদার্থ। তেমনি গোটা মানব জাতীর মধ্যে আখেরী উম্মতকে আল্লাহ্ পাক অনন্য মর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে এই উম্মতই সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী এবং এরাই আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি।

সকল উম্মতের সেরা উম্মত

হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ্ পাকের খুব প্রিয় নবী। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক। একদিন তিনি আল্লাহ্ পাককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আয় আল্লাহ্! মানব জাতির মধ্যে আমার উম্মতের চেয়ে উত্তম কোন উম্মত রয়েছে কি?' তার এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন, হে মূসা! আমার একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি আর আমার মাঝে যে পার্থক্য, সেই সৃষ্টির তুলনায় আমি যতটা সুমহান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মর্যাদা অন্য সকল উম্মতের উপর তেমনি সুমহান। পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মাখলুকের সঙ্গে মহান রাব্বুল আলামীনের মর্যাদাগত পার্থক্য যেমন অসীম, উম্মতে মুহাম্মদিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাও তেমনি অন্যান্য উম্মতের সঙ্গে বিস্তর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ্ পাকের খুবই প্রিয় নবী। তিনি যখন একবার রাব্বুল আলামীনকে দেখার আবেদন করেছিলেন, জবাবে আল্লাহ্ পাক খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তা নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন— لن تراني 'আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না।' তা সত্ত্বেও তিনি দেখার আবেদন জানিয়ে বলতে লাগলেন, 'আয় আল্লাহ্! আমি আপনাকে দেখতে চাই'। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন দৃঢ়তার সঙ্গে নিষেধ করার পর দেখতে চাওয়ার আবেদন শুধুমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষেই সম্ভব ছিল। আমরা তা কিছুতেই পারতাম না। ঘনিষ্টতার এই সম্মান আল্লাহ্ পাক শুধু তাঁকেই দান করেছিলেন।

আল্লাহ্ পাকের দর্শন অসম্ভব বলে জানিয়ে দেয়ার পর হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম বলতে লাগলেন, আয় আল্লাহ্! তাহলে ঐ উম্মত আমাকে দান করুন। আল্লাহ্ পাক বললেন, তাও সম্ভব নয়। ঐ উম্মত তো আমার মাহ্‌বুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। হযরত মূসা (আ.) তখন বললেন,

আয় আল্লাহ্! তাহলে অন্ততঃ তাদেরকে দেখিয়ে দিন। তাঁর আবেদনের জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন, 'দেখতেও পাবে না। কারণ, তারা তোমার কয়েক হাজার বছর পর পৃথিবীতে আগমন করবে।' হযরত মূসা (আ.) তখন বললেন, 'আয় আল্লাহ্! অন্ততঃ তাদের কণ্ঠস্বর আমাকে শুনিয়ে দিন।' ফলে হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে গমনের পর আল্লাহ্ পাক উম্মতে মুহাম্মদীকে ডেকে বললেন, يا امة محمد (হে উম্মতে মুহাম্মদী!) সে আহ্বানের জবাবে গোটা উম্মত সমস্বরে اللهم لبيك ، اللهم لبيك لبيك (আয় আল্লাহ্! আমরা উপস্থিত, আমরা উপস্থিত) বলে ওঠলো। সেই আওয়াজ শুনে হযরত মূসা (আ.) বলতে লাগলেন, আয় আল্লাহ্! তাদের এই সমস্বর ধ্বনি কতই না সুন্দর। কী মধুর তাদের কণ্ঠস্বর। আল্লাহ্ পাক তখন বললেন, হে মূসা! এরা আমার এমন বান্দা যারা হাত ওঠানোর পূর্বেই আমি তাদের দু'আ কবুল করবো। যারাই তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে, তাদের চোখ আমি সোজা করে দিব। তাদের সঙ্গে যারা মন্দ আচরণ করার চিন্তা করবে, আমি তাদের বদলা নিব।

এখন কারো মনে যদি এই প্রশ্ন হয় যে, আজ উম্মতে মুহাম্মদিয়ার উপর এই যে বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে, একের পর এক আল্লাহ্র দুশমনদের অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হচ্ছে, তারপরও তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধের ঢাল নেমে আসছে না। এর রহস্য কি? এই প্রশ্নের জবাব হলো, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতি ছিল আখেরাতের ক্ষেত্রে। তিনি তার দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন মৃত্যুর পর। এ সম্পর্কে কোরআনের বিবরণ হল এই—

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون * وما أرسلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون * هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون *

অর্থ ঃ 'যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করতো, এবং তারা যখন তাদর কাছ দিয়ে গমন করতো তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করতো। তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে

ফিরত। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয় নি। আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, কাফেররা যা করতো, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?'

—*সূরা তাতফীফ ৩২-৩৬*

কাজেই আল্লাহ্ পাকের প্রতিশোধ গ্রহণের এই প্রতিশ্রুতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দু'একটি ঘটনা হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে, কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শত্রুদের অপকর্মের প্রতিশোধ ব্যাপকভাবে আল্লাহ্ পাক আখেরাতেই গ্রহণ করবেন। আজ আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত কাফির-মুশরিকদের হাতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আর কাফেররা এ নিয়ে আনন্দ-উল্লাশ করছে। কিন্তু জেনে রাখুন, এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ্‌র এই দুশমনরা একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, এবং মুমিন-মুসলমানরাও আখেরাতের উদ্দেশ্যে পারি জমাবে। সেদিন মুসলমানগণ আয়েশ করে সম্মানের সিংহাসনে উপবেশন করে আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে, আর কাফিরদের সেই উপহাস ও নির্যাতনের জবাব দিতে থাকবে। পক্ষান্তরে কাফির-মুশরিকরা জাহান্নামের যন্ত্রণাময় আযাবে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে। কাজেই আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতির ভুল অর্থ গ্রহণ করে আপনারা হতাশ হবেন না। দুনিয়াতে বহু সাহসী বীর আল্লাহ্‌র দুশমনদের হাতে শাহাদত বরণ করেছেন। অথচ জালিমরা আনন্দ-উল্লাসেই দুনিয়ার জীবন কাটিয়ে গিয়েছে। এই জালেমদের অপকর্মের প্রতিশোধ আল্লাহ্ পাক আখেরাতেই গ্রহণ করবেন।

আখেরী উম্মতের সম্মান

আল্লাহ্ পাক এ উম্মতকে সকল উম্মত থেকে ভিন্ন, উত্তম ও অধিক মর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের কৃত পুণ্যকর্মের প্রতিদান ও তাদের নেক আমলের ছওয়াব তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। যখন কালামে পাকের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়—

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها -

একেকটি সৎকর্মের প্রতিদান আমি দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিব।

—*সূরা আন'আম ১৬০*

অন্য সকল উম্মতকেও 'একে দশ' প্রতিদান দেয়া হত। উপরোক্ত আয়াতে

আল্লাহ্ পাক আখেরী উম্মতের জন্যও একই ব্যবস্থা ঘোষণা করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করলেন, يا الله زد امتي 'আয় আল্লাহ্! আমার উম্মতকে আরো বাড়িয়ে দিন এবং অন্য উম্মতের চেয়ে তাদেরকে বেশী দান করুন।' ফলে আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত নাযিল করে বললেন— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে করয দান করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে কয়েকগুণ অধিক প্রতিদান দান করবেন।' কিন্তু সেই প্রতিদান কত গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন তা উহ্য রাখলেন। তবে দশগুণের চেয়ে যে অধিক তাতে সন্দেহ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আবেদন জানিয়ে বললেন, يا الله زد امتي 'আয় আল্লাহ্! আমার উম্মতকে আরো বাড়িয়ে দিন।' ফলে আল্লাহ্ পাক তৃতীয় আয়াত নাযিল করে বললেন—

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم *

'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।' —*সূরা বাক্বারা ২৬১*

'হে নবী! আপনার উম্মতের কোন ব্যক্তি একটি নেকী করলে তার সওয়াব আমি তাকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিব।' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতেও তৃপ্ত হলেন না। আবারও বললেন, زد امتي 'আয় আল্লাহ্! আমার উম্মতকে আরও বাড়িয়ে দিন।' সেই আবেদনের জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন, 'হে আমার নবী! আপনার আবেদন মঞ্জুর করা হলো—আপনার উম্মতের নেক আমলের সওয়াব গুণিতক হারে নয়, অংকের হিসাবেও নয় ; বরং انما توفي الصابرون اجرهم بغير حساب 'আপনার উম্মতের ধৈর্যশীলদের প্রতিদান বিনা হিসাবে, অসংখ্যগুণে দান করবো। তাদের সওয়াব অংকের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। যত ইচ্ছা তারা গ্রহণ করতে পারবে।' মোটকথা, আখেরী উম্মতের মর্যাদা আল্লাহ্ পাক এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে দিলেন যে, সে পরিমাণ মর্যাদার অধিকারী হওয়া আর কোন উম্মতের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া এ উম্মতের উপর মহান রাব্বুল আলামীনের আরো একটি ইহসান হলো, তাদের জন্য তিনি অল্প পরিশ্রমে অধিক প্রতিদানের ব্যবস্থা

করেছেন। দুনিয়ার জীবন হলো পরিশ্রমের ক্ষেত্র। আমাদের এ শ্রমকাল মাত্র ষাট-সত্তর কি আশি বছর পর্যন্ত প্রলম্বিত। আর পূর্ববর্তী উম্মতের অনেকে চার-পাঁচশত বছর পর্যন্ত জীবন লাভ করেছিল। তবুও তারা মর্যাদায় এ উম্মতের ত্রিশ-চল্লিশ বছর জীবন প্রাপ্ত একজন মানুষের সমকক্ষ হতে পারবে না।

আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের আরও একটি অনুগ্রহ হলো, তিনি আমাদেরকে সর্বশেষ উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করে কিয়ামতের জন্য ইন্তেযারের কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। আপনি ষ্টেশনে পৌছে যদি জানতে পারেন যে, গাড়ী আরও আধ ঘন্টা লেটে আসছে। তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আপনার জন্য চরম বিরক্তিকর বিষয় হবে। আর যদি গিয়ে দেখতে পান যে গাড়ী আসছে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরম স্বস্তিদায়কই হওয়ার কথা। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে পৃথিবীর জীবন-পরিক্রমার একেবারে শেষ প্রান্তে সৃষ্টি করে কিয়ামতের ইন্তিযারের কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। সর্বশেষ উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ পাক অন্যান্য উম্মতের উপর আমাদেরকে আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের নাফরমানী ও পাপাচারের ইতিহাস আমাদের নিকট প্রকাশ করে দিলেও আমাদের অপরাধ-কর্মসমূহ কিন্তু এমন একটি স্থায়ী পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন যে, সে সম্পর্কে আর কারো পক্ষেই অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের পর আর কোন উম্মতেরই আগমন ঘটবে না। বনী ইসরায়ীলীদের নাফরমানী ও অপকর্ম সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে, এবং তারা যে সকল অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবে নিপতিত হয়েছিল, সে সম্পর্কেও আমরা অবহিত হতে পেরেছি। কওমে নূহ, কওমে সাবা, কওমে লূত, ফেরআউন, সকলের নাফরমানীর বিবরণই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের পাপচার ও নাফরমানীর কথা অন্য কারো জানার পথ আল্লাহ্ পাক চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের পদস্খলনের কথা জানার জন্য এ পৃথিবীতে আর কোন জাতির আগমন হবে না। শুধু তাই নয় ; বরং আমাদের পাপাচার প্রকাশ হয়ে লোকের সামনে আমাদেরকে লজ্জিত হবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন আরো গভীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সেই ব্যবস্থাটি হলো—কাল কিয়ামতের দিন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে আবেদন জানিয়ে বলবেন, 'আয় আল্লাহ্! আমার উম্মতের বিচারের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন।' জবাবে আল্লাহ্ পাক তার কারণ জানতে চাইবেন। তিনি বলবেন, আমি চাচ্ছি—তাদের পাপের কথা অন্য কারো সামনে প্রকাশ হয়ে যেন তাদেরকে লজ্জিত হতে না হয়। তাই সকলের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে আমি

তাদের বিচার-কার্য সমাধা করতে চাই। আল্লাহ্ পাক বলবেন, 'আয় আমার মাহবুব! আপনি যদি তাদের হিসাব গ্রহণ করেন, তাহলে তাদের গোনাহ্ আপনার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে। ফলে তারা নিশ্চয়ই আপনার সামনে লজ্জিত হবে। আমি তো তাদেরকে আপনার সামনেও লজ্জিত করতে চাই না। তাই আমি নিজেই পর্দার আড়ালে এক সতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় তাদের হিসাব গ্রহণ করে নিব।

আমার একথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, যাতে আপনারা মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট এ উম্মতের সঠিক মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। জান্নাতের নেতৃত্বও এ উম্মতেরই হাতে দান করা হয়েছে। হযরত হাসান ও হোসাইন (রাযি.)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সর্দার হিসাবে ঘোষণা করে বলেছেন— والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة 'হাসান ও হোসাইন হবে জান্নাতী যুবকদের সর্দার।' হযরত ফাতেমা (রাযি.) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি জান্নাতী রমণীদের নেত্রী। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আসমানে কোন নারীর বিয়ে পড়িয়েছেন—এমন সৌভাগ্য শুধু হযরত যয়নব (রাযি.)-ই লাভ করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন এ উম্মতেরই নারী সমাজের অন্যতম একজন। মাত্র দু' রাকাত নফল নামায পড়ে হজ্বের সওয়াব লাভ করার মত সৌভাগ্য আর কোন উম্মতের ছিল না। এ সৌভাগ্য একান্তই এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য। ফজর নামাযের পর কোন কথা না বলে নিরবে নামাযের স্থানে বসে থেকে সূর্য উদিত হয়ে মাকরূহ্ ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পর দু' রাকাত নফল নামায পড়লে এক হজ্ব ও এক ওমরার সওয়াব লাভ হয়ে থাকে। এই উম্মত এমনই সৌভাগ্যশালী যে, পিতার দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকালেও হজ্বের সওয়াব লাভ করে থাকে।

তার চেয়েও মজার বিষয় হলো—আখেরী উম্মতের লোকেরা যতই বয়োঃবৃদ্ধ হতে থাকে, ততই তারা আল্লাহ্ পাকের প্রিয় হয়ে ওঠে। কোন ব্যক্তি যখন সত্তর-আশি বছরের বয়সে উপনীত হয়, আল্লাহ্ পাক ফিরিশতাদের ডেকে বলেন, আমি এই ব্যক্তিকে ভালবাসি। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসতে থাকো। বার্ধক্যের দরুন যদিও মানুষ আমলের ক্ষেত্রে কমজোর হয়ে পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তার প্রতি অধিক অনুগ্রহ ও মহব্বতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকেন। আর সেই মানুষ যখন আশি বছর পার হয়ে বার্ধক্যের একেবারে চূড়ান্তে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ পাক বলেন—

والله ليس اعذب رجلا او امرأة المثانين السنة -

আমার জাতের কসম! আশি বছর বয়সের বৃদ্ধ মুসলমান নারী-পুরুষকে

আমি আযাব দেব না।

দুর্বল-দেহ আশি বছরের বৃদ্ধের পক্ষে যখন ফরয ইবাদতগুলোই সঠিকভাবে আদায় করা দুরহ হয়ে পরে, তখন আল্লাহ্ পাক তার রিটায়ারমেন্ট হিসাবে পেনশন নয়, বরং মূল প্রাপ্যের চেয়েও অধিক প্রতিদান দিতে আরম্ভ করেন। এটা শুধু এই উম্মতের জন্যই আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুদান।

শুভ্রকেশ-বৃদ্ধদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকসাম (রহ.) ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিস। সমকালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও স্বভাবে তিনি ছিলেন বেশ রসিক। তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে তাঁর সঙ্গে জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওহে বদকার বৃদ্ধ! দুনিয়াতে তুমি এই এই অপরাধ করেছিলে। এভাবে আল্লাহ্ পাক আমার গুনাহের বিবরণ দিতে লাগলেন। তখন আমি বললাম, আয় আল্লাহ্! দুনিয়াতে আপনার সম্পর্কে যেমন শোনে এসেছি, আজ আমার সঙ্গে আপনার আচরণ তো তেমন দেখতে পাচ্ছি না।

ইলমের শান দেখুন! স্বয়ং আল্লাহ্‌র সঙ্গেই তিনি বিতর্ক আরম্ভ করলেন—আয় আল্লাহ্! আমার সঙ্গে আজ যেমন কঠোরতা করা হচ্ছে, দুনিয়াতে তো আপনার সম্পর্কে আমি এমন শুনি নি। তখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন শোনেছ? আমি বললাম—

حدثني عبد الرزاق عن المعمر عن الزهرى عن عروة ابن زبير عن عائشة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم أن جبرائيل قال : قال الله تعالي اني استحيي أن اعذبه عذاب شيبة في الاسلام و أني شيبة في الاسلام -

আয় আল্লাহ্! আপনার সম্পর্কে যে কথা শোনেছি তা পূর্ণ দলিলের সাথে আপনার সামনে উপস্থাপন করছি—আমাকে আব্দুর রায্যাক বলেছেন, তাকে মু'আম্মার বলেছেন, তাকে যুহ্‌রী বলেছেন, তাকে হযরত যোবায়ের (রাযি.) এর পুত্র ওরওয়া বলেছেন। তাকে বলেছেন তার খালা হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি.)। তিনি আপনার হাবীব থেকে নকল করেছেন। আর আপনার হাবীবকে

বলেছেন জিবরায়ীল (আ.)। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, 'কোন মুসলমান যখন বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে তখন আমি তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করি'। আয় আল্লাহ্! আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মুসলমান অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সেই আমি আপনার নিকট এসেছি।

জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন—

صدق عبد الرزاق و صدق معمر و صدق زهرى و صدق عروة و صدقت عائشة و صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم و صدق جبرائيل قال : و انا اصدق القائلين -

যথার্থ বলেছ। আব্দুর রাজ্জাকও সত্য বলেছে, যুহরীও সত্য বলেছে, ওরওয়াও সত্য বলেছে, আয়েশাও সত্য বলেছে, আমার মাহ্বুবও সত্য বলেছে, জিবরায়ীলও সত্য বলেছে। আর আমি সকল সত্যবাদীদের সেরা সত্যবাদী। আজ তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা। সেখানে গিয়ে যত ইচ্ছা আনন্দ-স্ফুর্তি করতে থাকো।

এটা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ। এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ পাক জান্নাত সহজলভ্য করে দিয়েছেন। একটু হিম্মত আর কিছু পরিশ্রমই জান্নাতকে আপনার হাতের মুঠোয় এনে দিবে।

উম্মতের সাক্ষীর ভূমিকা

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের এই বিশেষ অনুগ্রহের আচরণ কেন? এর জবাবে বলবো, তার অন্যতম কারণ হলো—আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যাকে ভালবাসে স্বভাবতই তার সন্তানরাও তার সে ভালবাসার অংশ লাভ করে থাকে। প্রেমিকের কাছে প্রিয়ার সন্তানরাও প্রিয় হয়ে থাকে। আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয় 'মাহ্বুব' ছিলেন, তাই তাঁর বরকতে তাঁর উম্মতও সে ভালবাসার অংশ লাভ করেছে।

এই উম্মত মহান রাব্বুল আলামীনের বিশেষ অনুগ্রহ লাভের আরও একটি কারণ হলো—এই উম্মতকে এমন একটি মহৎ কাজ ও মেহনতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যা কেবল হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। ইতিপূর্বে নবীগণ ছাড়া আর কেউ এ কাজের দায়িত্ব লাভ করেন নি। হযরত

আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামগণের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ মহান কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। সেই দায়িত্ব ও মেহনতের উসিলাতেই আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সমস্ত উম্মতের উপর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, সে দায়িত্বটি কি? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন—

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

ويكون الرسول عليكم شهيدا -

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী সম্প্রদায় করেছি—যাতে তোমরা সাক্ষদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষদাতা হন তোমাদের জন্য। —*সূরা বাক্বারা - ১৪৩*

এ উম্মতের মর্যাদা প্রকাশের ক্ষেত্রে এ আয়াতটির ভূমিকা যত গভীর সে তুলনায় كنتم خير امة اخرجت للناس .... আয়াতটির ভূমিকা ততটা গভীর নয়। আমাদের তাবলীগী ভাইগণ অবশ্য শুধু শেষোক্ত আয়াতটির সঙ্গেই পরিচিত আছেন, এবং তারা শুধু সে আয়াতটিরই চর্চা করে থাকেন। কিন্তু আমি ইদানিং উপরোক্ত আয়াতটির চর্চাও আরম্ভ করেছি। শুধু শাব্দিক অর্থ থেকে উপরোক্ত আয়াতটির বক্তব্যের গভীরতা যেমন উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি এ আয়াতে যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, সাধারণ দৃষ্টিতে সে কথাও বুঝা যায় না। কিন্তু একটু ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি সহজ হয়ে ওঠবে।

আয়াতে আমাদেরকে امة وسطا বা মধ্যবর্তী উম্মতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মধ্যবর্তী উম্মত হবার রহস্য হলো—এই যমীন ও আসমান যেন একটি চাকার দু'টি অংশ। চাকার মধ্য অংশে একটি দণ্ড থাকে। সেই দণ্ডকে কেন্দ্র করেই চাকা ঘুরে থাকে। সেই চাকা গরুর গাড়িরই হোক চাই যাতার চাকাই হোক। গ্রামে গরু চালিত একটি যাঁতার প্রচলন ছিল। গরুর সাহায্যে যাঁতা ঘুড়ানো হত, আর সেই যাতায় গম পিষ্ট হয়ে আটা হয়ে বের হত। যাই হোক, চাকা বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রেরই হোক বা হস্ত চালিত যাঁতারই হোক, সর্বক্ষেত্রেই চাকার ঘুর্ণন চলে মধ্যবর্তী দণ্ডটি অবলম্বন করে। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগেও চাকার মাঝখানে স্থাপিত দণ্ডটির পূর্ব ভূমিকার সামান্য ব্যত্যয় ঘটে নি। তার কার্যকারিতায়ও কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় নি। তার শক্তি তেমনি স্বমহিমায় উদ্ভাসিত রয়েছে। চাকার মধ্যস্থিত সেই দণ্ডটি যতক্ষণ স্বস্থানে স্থির থাকবে, ততক্ষণই চাকা ঘুরবে। নতুন পুরাতন, হস্তচালিত, যন্ত্রচালিত সকল চাকাতে সেই দণ্ডের গুণেই প্রাণের সঞ্চার হবে। কিন্তু যখনই সে দণ্ডটি

আপন স্থান থেকে সরে যাবে বা ভেঙ্গে পড়বে, তখনই চাকার গতি স্থির হয়ে যাবে। দণ্ডটি বাঁকা হয়ে গেলে চাকাও এঁকেবেঁকে চলতে আরম্ভ করবে।

ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাক বলছেন, হে আমার মাহবুবের উম্মতগণ তোমরা আসমান ও যমীনরূপী দু' চাকার মধ্যবর্তী দণ্ড স্বরূপ। তোমাদেরকে অবলম্বন করেই এই আসমান ও যমীনের গতি-প্রকৃতি স্বাভাবিক রয়েছে। কিন্তু যখনই তোমাদের স্থানচ্যুতি ঘটবে, তখন এ চাকা দু'টির স্বাভাবিক প্রকৃতিতেও বিপর্যয় ঘটবে। আজকের দুনিয়ায় যা নিরন্তর ঘটে চলেছে।

হিংসা-হানাহানি

যুলুম-অত্যাচার

হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ

সুদ-ঘুসের অভিশাপ

যিনা-চুরি-ডাকাতি—বিপর্যের আর কী অবশিষ্ট রয়েছে!

এর কারণ হলো, নিজেদের সঙ্গত অবস্থান থেকে তোমাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। তোমাদের সঙ্গত অবস্থান থেকে তোমরা যখন দূরে সরে যাবে, তখনই এ মহা জগতে চরম বিপর্যয় ঘটবে। দু' চাকার মধ্যবর্তী দণ্ডটি সরে গেলে যেমন চাকা চলৎশক্তি হারিয়ে মুখ থুবরে পড়ে যায়, তেমনি এই যমীন ও আসমান পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। ওহে আমার মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতগণ! এই দুনিয়া থেকে তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে এবং তোমাদের মৃত্যু ঘটলে এই আসমান ও যমীনও ধ্বংস হয়ে পরস্পরের উপর আছড়ে পড়বে।

যমীন ধ্বংস হয়ে যাবে।

আসমান ভেঙ্গে পড়বে।

সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

চন্দ্র টুকরো টুকরো হয়ে আছড়ে পড়বে।

নদী-নালা আর সমুদ্রের বুকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকবে। পাহাড়-পর্বত তুলার মত উড়তে থাকবে। মানুষ পতঙ্গের ন্যায় বাতাসে ভাসতে থাকবে। সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। ফিরিস্তাগণও মৃত্যুবরণ করবেন। হযরত জিব্রায়ীল (আ.), হযরত মীকায়ীল (আ.), হযরত ইসরাফীল (আ.) ও হযরত আযরায়ীল (আ.) বড় বড় এই চার ফিরিস্তারও মৃত্যু হয়ে যাবে। আরশ বহনকারী ফিরিস্তাগণও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। মোকটথা, একমাত্র রাব্বুল আলামীনের মহান অস্তিত্ব ছাড়া অন্য সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই মহাবিশ্ব, বিশ্বের সুনিপুণ সৃষ্টিসম্ভার—পরম মমতায় একদিন যা সৃষ্টি

করেছিলেন রাব্বুল আলামীন, আবার একদিন তা ধ্বংস করে দিবেন তাঁর সেরা সৃষ্টি 'আশরাফুল মাখলুকাত' মানুষের জন্য। আল্লাহ্ পাক বলেন—'হে আমার হাবীবের উম্মতগণ! আমার এই অকুল সৃষ্টি-জগত, এই আসমান ও যমীন তোমাদের উসীলাতেই টিকে আছে। তোমাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটির মৃত্যু হবার পর আমি কেয়ামতের ডংকা বাজিয়ে দিবো।' কাজেই একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মানব-দানবসহ গোটা বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা আখেরী উম্মতের উসীলাতেই হচ্ছে। অতীত পৃথিবীতে যারা দম্ভ করেছে এবং বর্তমান দুনিয়ায়ও যে যত আস্ফালনই করুক না কেন, তাদের জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনের সমাধান, এমনকি তাদের বেঁচে থাকা, দেহে প্রাণের স্পন্দন আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উসীলাতেই হচ্ছে। দিবসে সূর্যের আলোক বিচ্ছুরণ, রাতের আকাশে চাঁদের মায়াময় জ্যোৎস্না, আঁধার-আলোর এই যে পালাবদল, শুধুই আখেরী উম্মতের উসীলায়। এই উম্মতের পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটার পর আল্লাহ্ পাক তাঁর গোটা সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে দিবেন। আমাদের এই ঈর্ষনীয় মর্যাদা একান্তই আল্লাহ্ পাকের দান।

একই চেহারার গোলগাল ডিম। একটি ফেটে ভয়ঙ্কর কুমির বের হচ্ছে আর একটি ফেটে বের হচ্ছে সুদর্শন ময়ূর। দুনিয়াতে আমরা যে মানুষরূপে সৃষ্টি হয়েছি সে ক্ষেত্রেও আমাদের নিজেদের কোন ভূমিকা নেই। আর আমাদেরকে যে মধ্যবর্তী উম্মতরূপে সৃষ্টি করে সুমহান মর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের উকিলের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, তাতেও আমাদের কোন হাত নেই। আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের 'মধ্যবর্তী উম্মত'রূপে ঘোষণা দানই শুধু আমাদেরকে সাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে।

আল্লাহ্‌র উকিল ও শয়তানের উকিল

আমরা গোটা জগতকে একটি আদালত কক্ষ হিসাবে মনে করতে পারি। সে আদালত কক্ষে একটি সঙ্গিন মকদ্দমা নিয়ে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে যুক্তিতর্ক চলছে। উভয় পক্ষই জোড়ালো যুক্তির মারপেঁচে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। পক্ষদ্বয়ের একজন হলেন মহান রাব্বুল আলামীনের উকিল—যাদের ধারাবাহিকতা হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ হয়ে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। আর অপরপক্ষ স্বয়ং শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গের দল। আল্লাহ্‌র উকিল ঐশী বাণী ও সুদৃঢ় যুক্তির আলোকে পেশ করছেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্ববাদের আদর্শ। আর

শয়তানের উকিল অস্বীকার করছে মহান রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব। তাদের অভিমত হলো—ان هي الا حياتنا الدنيا—পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর মাধ্যমে মানব জীবনের চির সমাপ্তি ঘটবে। কোন অদৃশ্য স্রষ্টার ইঙ্গিতে নয় ; বরং কালের প্রবাহই সবকিছুর অবশান ঘটিয়ে থাকে।

মহান রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তিতর্কে শয়তানপক্ষ যখন কিঞ্চিৎ কোনঠাসা, তখন মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তারা মহান রাব্বুল আলামীনের একক ক্ষমতায় অসংখ্য পুত্র-কন্যার অংশিদার উপস্থাপন করে। তারা তখন বলে—এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক একজন নন, বরং এর পিছনে রয়েছে একাধিক অস্তিত্বের সমন্বিত শক্তি। পবিত্র কোরআনের ভাষায় তাদের সে বক্তব্য ছিল এমন—

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب

'সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে।' —*সূরা সোয়াদ ৫*

এ কেমন অবিশ্বাস্য কথা! এই মহা বিশ্বের 'ইলাহ্' মাত্র একজন। শয়তানের উকিল তার যুক্তি পেশ করে বলছে—এই নিখিল বিশ্বের মহা কর্মযজ্ঞ এক আল্লাহ্র পক্ষে আঞ্জাম দেয়া কী করে সম্ভব হতে পারে ? একই খোদা বৃষ্টিও বর্ষন করবেন, নদ-নদীর পানি প্রবাহের ব্যবস্থাও করবেন, মানুষও বানাবেন এবং তাদের আহারের ব্যবস্থাও করবেন, জল-স্থল ও অন্তরিক্ষের অসংখ্য প্রাণী, এই আসমান ও যমীন এবং অগণিত মাখলুক এক স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই মহা কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব অপরিহার্য।

অন্যদিকে আল্লাহ্র উকিল বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কোন শরীক নেই। وحده لاشريك له তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর দ্বিতীয় দাবী হলো—হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র উকিল। মানব সমাজে তিনি যে বাণী প্রচার করেছেন তার সারমর্ম হলো—তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন উজ্জ্বল ও আলোকিত হবে। পক্ষান্তরে শয়তানের উকিল বলে—অর্থ-সম্পদ দিয়েই মানুষের জীবনের উন্নতি সাধন হয়। টাকা আছে তো সব আছে, টাকা নেই তো মানুষের জীবন শূন্য। এই মামলার তৃতীয় বিষয় হিসাবে আল্লাহ্র উকিলের বক্তব্য হলো—দুনিয়া অবিনশ্বর নয়। একদিন এই দুনিয়ার সবকিছুরই অবসান হবে। চিরস্থায়ী জগত হলো আখেরাত। সে জগতের কখনো বিনাশ বা ধ্বংস নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে

শয়তানের উকিলের বক্তব্য হলো—'মিথ্যা, সব মিথ্যা। দুনিয়ার কখনো বিনাশ নেই। সময় যেভাবে চলে এসেছে কোন এক অজানা কাল থেকে, তেমনি চলতে থাকবে অনন্তকাল। أأنا لمردودون فى الحافرة 'আমরা কি উল্টো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই।' কেউ কি কবর ছেড়ে ওঠে এসেছে কোন দিন। এ নগরের তিন হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোন পর্বে কেউ তার মৃত্যুর পরের গল্প শোনাতে মাটি ফুঁড়ে ওঠে আসে নি। কাজেই মৃত্যুই যে সব কিছুর অবসান ঘটায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের মৃত্যুর পরের জীবনকে সুখ-দুঃখে ভরিয়ে তোলার মত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। নাজ-নেয়ামতের লোভনীয় জান্নাত বা দুঃখে ভরা জাহান্নাম সবই অলিক। إذا كنا عظاما نخرة 'আমাদের অস্থিসমূহ পচেগলে যাওয়ার পরও কি আমাদের পুনর্জন্ম হবে! স্রেফ মিথ্যে। মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই। হিসাব-কিতাবের জুজু নির্জলা কল্পকাহিনী। 'আল্লাহ' বলে কেউ নেই। জান্নাত-জাহান্নাম অসুস্থ মস্তিষ্কের অলিক কল্পনা।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য

অবশেষে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের পক্ষে বিভিন্ন প্রমানাদি সহকারে আদালত কক্ষে আবির্ভূত হয়ে বললেন—আয় আল্লাহ্! আমি এই ভর মজলিশে আপনাকে এবং আপনার আরশ বহনকারী ফিরিশতাগণকে সাক্ষী রেখে স্পষ্ট ভাষায় বলছি—

.... আপনার কোন শরীক নেই।
.... আপনার স্ত্রী নেই।
.... সন্তান নেই।
.... মন্ত্রী নেই।
.... পরামর্শদাতা নেই।
.... আপনি ছাড়া আর কোন খোদাও নেই।
.... আপনার কোন সঙ্গী নেই, সমকক্ষ নেই।
.... আপনার কোন পাহারাদার নেই, নিগাহ্‌বানও নেই।
রাজত্ব আপনার।
ক্ষমতা আপনার।
শক্তি ও সামর্থ্য আপনার।

সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। যাবতীয় সৌন্দর্য ও রূপ-মাধুর্যের আপনিই মালিক। মহান রাব্বুল আলামীনের না শুরু আছে, না কোন শেষ। না তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রান্তরেখা রয়েছে, না বিশালতার কোন দিগন্ত। তাঁর মহান

অস্তিত্বকেও স্থানের সীমা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না।

তাঁর গুণাবলী অশেষ অফুরন্ত।

তাঁর শক্তি অন্তহীন।

স্থানের ক্ষুদ্রতায় তিনি সংকুলিত হন না। না কালের বন্ধনী তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে। তাঁর স্থিতির জন্য আরশ-কুরসীর প্রয়োজন নেই। না তাঁর সত্ত্বায় রয়েছে আলো বা আঁধারের প্রভাব। কোন ফিরিশতারও তাঁর প্রয়োজন নেই। সমস্ত কিছু থেকে তিনি বেনিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন—

واشهد ان وعدك الحق ...

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। এই দুনিয়া একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সকলকে আপনিই মৃত্যু দান করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একদিন গোটা মানব সমাজকে আপনার মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জাযা ও সাজা এবং প্রতিফল ও প্রতিদানের মুখোমুখি হতে হবে। আপনার জান্নাত-জাহান্নাম সত্য। কবর থেকে আপনিই একদিন আমাদেরকে পুনর্জীবিত করে ওঠাবেন। শত-সহস্র কোটি মানুষ, অসংখ্য প্রাণী সকলকেই আল্লাহ্ পাক পুনরায় জীবন দান করবেন।

গোটা পৃথিবীতে কত মশা-মাছি আছে, এবং আজ পর্যন্ত পৃথীবিতে কত মশা-মাছির সৃষ্টি হয়েছে, তার কোন্‌টা কোথায় মরে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে তার খবর কে রাখে! কিন্তু মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণীকেই পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করবেন।

بلى قادرين على أن نسوي بنانه

পরন্তু আমি তার অঙ্গগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।

—সূরা ক্বিয়ামাহ্-৪

এই বাণীর মর্ম পূর্বকালের তুলনায় বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার যুগে বুঝতে পারা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে।

শয়তানের সাক্ষীরা বলে, যে মানুষ মরে পঁচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তার পুনর্জন্ম অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমাদের এই পঁচে-গলে যাওয়া দেহ পুনরায় যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করতে আমি সক্ষম।

আজ তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে? ঠিক আছে, কাল কেয়ামতের দিন তোমাদের Fingar Print (অঙ্গুলি ছাপ) মিলিয়ে দেখে নিও। যেহেতু একজনের

আঙ্গুলের ছাপ অন্যজনের সঙ্গে মিলে না, তাই তোমাদের দেহের নিজস্বতা প্রমাণের জন্য তা হবে একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কাজেই তোমাদের আজকের অঙ্গুলি রেখার সঙ্গে কাল কেয়ামতের দিনে তোমাদের অঙ্গুলি রেখাগুলি মিলিয়ে দেখে নিও যে তা যথার্থই তোমাদের আঙ্গুল কি না।

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه

তোমাদের কি ধারণা—পঁচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া তোমাদের দেহের হাড়-মাংস পুনঃসৃষ্টি করার মত কেউ নেই ? জেনে রেখ, আমি এমন এক রব্, যিনি তোমাদের দেহের বিলয়প্রাপ্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও তোমাদেরকে ফেরত দেব। কিন্তু মানুষ এমনই জালেম যে, আমার সামনেই তারা আমার নাফরমানীতে ডুবে আছে। আমার সামনেই সরাব পান করছে। পরনারীর দিকে তাকাচ্ছে। যিনা করছে, মিথ্যা বলছে আর মেয়েরা বেপর্দা অবস্থায় বাইরে বের হচ্ছে।

নাচগান এবং দ্বীন ও ঈমান ধ্বংসকারী বিজাতীয় নানাবিধ রুসম-রেওয়াজ আজ গোটা মুসলিম সমাজের ঘরে ঘরে স্থান করে নিয়েছে। আমার ভাই ও বন্ধুগণ! যে বিধর্মীরা আপনাদের সন্তানদেরকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মেরেছে, মাথা গোজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে ভিটেছাড়া করেছে। তারপরও নির্লজ্জ আত্মমর্যাদাহীনের মত তাদের রুসম-রেওয়াজ দিয়ে নিজেদের ঘরের পবিত্র পরিবেশকে গান্ধা করে তুলছেন! আপনাদের দুধের বাচ্চাকে যারা মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে অসহায় মায়ের দু'চোখের সামনে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে, আজ তাদেরই শয়তানী আচার-অনুষ্ঠান আপনাদের কাছে বরণীয় হয়ে গেলো! এরচেয়ে বুদ্ধিহীন বোকামী আর কী হতে পারে!

দুনিয়াতে তো চাকর-বাকররা মনিবের চোখে ফাঁকি দিয়ে, আড়ালে-আবডালে কাজে অলসতা করে থাকে। কিন্তু তোমরা একেবারে আমার সামনেই চরম ধৃষ্টতা দেখিয়ে নাফরমানী করে চলেছো—নাচ-গানের আসর, শরাবের মাহ্‌ফিল, বেহায়ায়ী, বেপর্দেগী, লাম্পট্য ও নির্লজ্জতা, কি নয় ? তোমাদের কি ধারণা তোমাদের এইসব অপকর্ম আমি দেখতে পাই না ? তোমাদের রব্ কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ? ঠিক আছে, অপেক্ষা করো।...

فاذا برق البصر তোমাদের চোখগুলো যখন ঠিকরে বের হবে। দম বন্ধ হয়ে যাবে। সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। আসমান ও যমীন ভেঙ্গে পড়বে। আর তোমরা সকলে আমার সামনে আনিত হবে। সেই দিনটি আর খুব বেশী দূরে নয়। সেদিন যতই পালাতে চাইবে, আত্মগোপন করে নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে, সক্ষম হবে না। সেদিন তোমার সকল অপকর্মই আমি এক এক করে

তোমার সামনে প্রকাশ করবো। তখন যতই ওজর করো না কেন, তোমার কোন ওজরই গৃহীত হবে না।

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এই পয়গাম নিয়েই দুনিয়াতে এসেছিলেন এবং এর পক্ষে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। আল্লাহ্‌র আদালতে তারা এই মকদ্দমাই লড়ে গিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন তাওহীদ এবং রিসালাত ও আখেরাতের দাবীদার। গোটা জীবন সেই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের দাওয়াতই ছিল তাঁদের ধ্যান ও জ্ঞান। পক্ষান্তরে শয়তানের উকিল আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে একাধিক প্রভূর অস্তিত্বের দাবী করে। রিসালাত এবং জান্নাত-জাহান্নামকে অস্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস মানব জীবনের দুনিয়াতেই উদ্ভব এবং দুনিয়াতেই তাদের শেষ।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী

আদালতে কেস এখন শেষ পর্যায়ে। স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে উভয় পক্ষের প্রমাণ যথেষ্ট উপস্থাপিত হয়েছে। এবার সর্বশেষ প্রমাণ দাখিলের পালা। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে, চূড়ান্ত ফয়সালা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্যর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এপর্যায়ের সাক্ষী যে উপস্থাপন করতে পারবে, ফায়সালাও তার অনুকুলেই প্রদত্ত হবে।

সুতরাং আল্লাহ্ পাক সাক্ষী উপস্থাপনের জন্য বলবেন—আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র নবীর রিসালাতের সত্যতার পক্ষে সাক্ষী তলব করবেন। ফলে সাক্ষী উপস্থাপন করা হবে। সেদিনের সেই মহান আদালতে সাক্ষী হবার সৌভাগ্য কারা লাভ করবে ? কাদেরকে সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হবে ? জেনে রাখুন, তারা এই আখেরী উম্মত ছাড়া আর কেউ নয়। এই উম্মতে মুহাম্মদীকেই সাক্ষীরূপে সেদিন উপস্থাপন করা হবে। شهداء علي الناس আল্লাহ্ পাকের সকল নবী-রাসূলদের পক্ষে তারাই সাক্ষী হবে।

উপরোক্ত আয়াতাংশে শুধু আখেরাতের সাক্ষী নয় ; বরং দুনিয়াতেও আমাদেরকে সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হয়েছে। দুনিয়াতেও আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দেবার দায়িত্ব দিয়ে বলা হয়েছে—গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে আল্লাহ্ পাকের ওয়াহ্‌দানিয়াত তথা একত্ববাদের পয়গাম পৌঁছে দাও। মানুষের কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত এবং জান্নাত-জাহান্নামের সত্যতার বাণী পৌঁছে দাও। তোমাদের আজকের এই সাক্ষ্যর উপরই আগামী দিনের ফয়সালা হবে। গোটা দুনিয়ায় এই আওয়াজ পৌঁছে দাও যে, শয়তানী তা'লীম চরম ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়। একমাত্র রাব্বুল

আলামীনের তা'লীমই হলো ন্যায় ও সঠিক। এই বিষয়গুলো প্রচার করার জন্যই মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে নির্বাচন করেছেন। এই বিষয়টি বুঝানোর জন্যই মূলতঃ একটি কাল্পনিক আদালত আমি আপনাদের সামনে দাঁড় করিয়েছি। কাজেই আমার কথার ভুল অর্থ করে কেউ এমন বুঝবেন না যে, আমি আপনাদেরকে কোর্টে গিয়ে 'আল্লাহ্ একজন' বলে হাঁক দিতে বলেছি।

আমি শুধু এইটুকু বলতে চেয়েছি যে, এই পৃথিবী একটি আদালত কক্ষ সদৃশ। সেই আদালত কক্ষে উপস্থিত গোটা মানব জাতির নিকট আমাদেরকে এই বাণী পৌঁছে দিতে হবে যে, তারা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর দাওয়াতী কার্যক্রমের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কাজেই সেই সাক্ষীর যথার্থ দায়িত্ব পালনার্থে তাদেরকে لا اله الا الله محمد رسول الله -এর দাওয়াত দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষ তাদের সেই দাওয়াতের দায়িত্ব কীভাবে পালন করবে ? আমি তো বুঝাবার জন্য পৃথিবীকে একটি আদালত কক্ষ হিসাবে উল্লেখ করেছি। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর মানুষ তো কোন একটি কক্ষে বন্দী নয় ; বরং গোটা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের কাছে দাওয়াত পৌছাবার জন্য তাদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কড়া নেড়ে তৌহীদের বাণী প্রচার করতে হবে। شهداء বা সাক্ষীর দায়িত্ব ঘরে বসে থাকলে পুরণ হবে না। বরং সোয়া লক্ষ আম্বীয়া আলাইহিমুস্‌সালামের সুন্নত অনুসরণ করে মানুষের ঘরে-ঘরে, দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে বলতে হবে—'হে লোকসকল! এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করো। একমাত্র তিনিই এই যমীন ও আসমানের মালিক। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্রই তার রাজত্ব। মহান আরশ, ফিরিশ্‌তাকুল, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু তারই সৃষ্টি। আগুন-পানি, বাতাস, লুকায়িত মনি-মানিক্য সবকিছুরই মালিক এক আল্লাহ্।

انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه

যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর।

—*সূরা আন'আম-৯৯*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন—গাছের ফল পরিপক্ক করে তোলা আমার দায়িত্ব। তাতে মনোহারী রঙের প্রলেপ দেয়াও আমারই দায়িত্ব। সেই ফলে স্বাদের বৈচিত্র আনা, কে খাবে তা নির্দিষ্ট করা এবং তার মুখে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করাও আমারই দায়িত্ব। এতে বুঝা গেল যে, মানুষের রিযিকের গোটা ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ পাক নিজ দায়িত্বেই রেখেছেন।

এদিকে আমরা ভেবে রেখেছি যে, আমাদের পুরুষদের কাজ হলো, দোকান-পাট বা কল-কারখানায় যাওয়া। আর মেয়েদের কাজ হলো, কাপড় ধোঁয়া, নাশতা বানানো। দুপুরের খাবার, বিকালের চা আর রাতের খাবার। তারপর ক্লান্ত শ্রমিকের মত শয্যা গ্রহণ। নিজেদের সাজানো এই ব্যস্ততার মাঝে আমরা আমাদের আসল দায়িত্বই ভুলে গিয়েছি। আমরা ভুলে গিয়েছি যে, আমাদের ভূমিকা এক 'রাজ-সাক্ষী'র।

মনের করুন দেশের প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ডেকে তার কয়েকটি মামলায় সাক্ষী দিতে বললেন। তাতে আপনার অনুভূতি কেমন হবে? নিশ্চয় যথেষ্ট আনন্দময়। অতএব, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আপনাকে দায়িত্ব দিয়ে বলেছেন--ওহে উম্মতে মুহম্মদী! তোমরা আমার 'ওয়াহ্দানিয়াত' তথা একত্ববাদের সাক্ষ্য দাও, তখন আপনার অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত? এ জন্যই আমি বলেছি যে, كنتم خير امة আয়াতটি وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس আয়াতের চেয়েও এ উম্মতের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আমাদের আলোচনা শুধু শেষোক্ত আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অধিক গুরুত্ববহ হওয়া সত্ত্বেও প্রথমোক্ত আয়াতটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি কমই আকর্ষিত হয়।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—ওহে আমার মাহ্বুবের উম্মতগণ! তোমরা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং সোয়া লক্ষ আম্বিয়ায়ে কেরাম যেই মহান বাণী প্রচার করেছেন, তাদের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে বলো—আল্লাহ্ একজন। ইসলাম আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা। হাশর ও জান্নাত-জাহান্নাম সত্য। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের মত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দাও, রিসালাতের সাক্ষ্য দাও, জান্নাত-জাহান্নামের সত্যতার সাক্ষ্য দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আওয়াজ গোটা মানব সমাজের নিকট পৌঁছে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবসর নেই।

পৃথিবীতে মানব-ধারার আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহ্ পাক একদিন গোটা মানব সমাজকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'বল, আমি কি তোমাদের রব্ নই?' জবাবে আমরা সমস্বরে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, আপনিই আমাদের একমাত্র রব্। যেই ওয়াহ্দানিয়াত একবার আমরা স্বীকার করেছিলাম, আমাদের বিশ্বাসে তা-ই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লক্ষাধিক আম্বিয়া আলাইহমুস্সালাম মেহনত করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয় 'হাবীব', সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সবচেয়ে বড় মুফতী ও সবচেয়ে বড় উকীল আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাওহীদ ও রুবুবিয়্যতের শিক্ষা দিয়ে বলেছেন—গোটা দুনিয়ার মানুষের দুয়ারে

দুয়ারে গিয়ে তাদেরকে এই কথা বলো যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। অস্তিত্বে তিনি এমনই একক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী যে, শুধুমাত্র তাঁর কাছে চাইলেই কেবল মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে। একমাত্র তাঁর ইবাদতের মাধ্যমেই মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। সেই আল্লাহ্ কখনো দান করে ক্লান্ত হন না। যিনি অসীম দয়ালু ও অবিনশ্বর। একমাত্র তিনি ছাড়া আর সবকিছুরই বিনাশ আছে। তাঁর রাজত্ব অনন্তকালের। তিনি ছাড়া আর সকলেরই ক্ষমতার দম্ভ একদিন শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু একদিন সকলের লম্ফঝম্ফ স্থির করে দিবে। তাঁর কাছে কোন নাফরমানই তার নাফরমানী নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে না। আবার কোন ফরমাঁবরদারের ফরমাঁবরদারীও গোপন থাকে না। আলো-আঁধার, উর্ধ্ব-অধঃ সবই তাঁর নিকট সমান। মনের গোপন চিন্তা পর্যন্ত তাঁর কাছে গোপন থাকে না। আলোকে উদ্ভাসিত আর আঁধারে আচ্ছাদিত সবই তিনি দেখতে পান। মানুষ তথা গোটা সৃষ্টিজগত একান্তই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তকদীরের কলম তাঁর হাতে। ফয়সালা একমাত্র তিনিই করেন। সে ফয়সালার অন্যথা করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি যা চান তাই করেন। আর যা চান না, তা কোনভাবেই হয় না।

তিনি দয়ালু,
মেহেরবান,
বড়ই করুণাময়,
ক্ষমাশীল,
দানশীল,
অনুগ্রহকারী।

এই সাক্ষ্য—যা আমি দিলাম, তাতে বুঝা গেল যে, দাওয়াতের এই মহান দায়িত্ব তাবলীগ জামাত নামের কোন বিশেষ দল বা জনগোষ্ঠীর নয় ; বরং এ দায়িত্ব গোটা মানব-সমাজের, সকল নারী-পুরুষের।

لتكون شهداء على الناس

অর্থ ঃ যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে।—*সূরা বাক্বারা- ৪৩*

আমাদের এই অপরিহার্য দায়িত্বের কথা আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। তবলীগ জামাতের ইহ্সান যে, তারা আমাদেরকে বিস্মৃতির সেই ঘুম-ঘোর থেকে ডেকে তুলেছে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে হবে। অতীতে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য শুধু মানুষ নয়,

বরং গাছ-পালা, মৃতপ্রাণী এবং জড়-পাথরও দিয়েছিল। সেসব ঘটনার বিবরণ হাদীসের কিতাবসমূহে রয়েছে। একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পাথর খণ্ডের নিকট গিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি বলে ওঠলো— السلام عليك يا رسول الله হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অনুরূপভাবে লতা-পাতা এবং বৃক্ষ কর্তৃক তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেবার ঘটনাও কিতাবে বিবৃত আছে। তেমনি একটি ঘটনা আজ আপনাদের শোনাব।

এক বৃক্ষের সাক্ষ্য প্রদান

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি আমাকে নবীরূপে স্বীকার করো ?' লোকটি জবাবে বললো, 'না'। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদূরে বিদ্যমান একটি খর্জুর বৃক্ষের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'ওই যে বৃক্ষটি দেখতে পাচ্ছ, যদি এর একটি ডাল এখানে এসে আমার নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেয়, তবে কি তুমি আমার নবুওয়াত স্বীকার করবে?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করবো'। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। গোটা বৃক্ষটিকে নয়, শুধু একটি শাখাকে। সঙ্গে সঙ্গে শাখাটি বৃক্ষের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন গোছো মানুষের মত গাছ বেয়ে নেমে এল নীচে। তারপর সটান হেটে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাখাটিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, من انا (বল তো আমি কে?)। জবাবে শাখাটি বললো—

اشهد انك رسول الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে একে তিনবার শাখাটিকে এই প্রশ্ন করলেন। প্রতিবারই জবাবে শাখাটি বলল, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর, এইভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দানের পর বৃক্ষশাখাটি কি সেখানেই পড়ে রইল ? না ; বরং তা পুনরায় ফিরে গেল নিজের জন্মস্থানে। কিন্তু কে নিল তাকে ফিরিয়ে ? যিনি এনেছিলেন সেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি শাখাটিকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, তোমার পূর্বস্থানে ফিরে যাও। ফলে শাখাটি পুনরায় হেঁটে হেঁটে গিয়ে গাছ

বেয়ে ওঠে নিজের জায়গাটিতে এমনভাবে স্থাপিত হলো, যেন তা কখনোই নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হয় নি।

বৃক্ষশাখা ও লতাপাতা যেমন তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিয়েছে, তেমনি নির্বোধ প্রাণীরাও সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিল না।

গোসাপের সাক্ষ্য দান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে আরো আশ্চর্য একটি ঘটনা শুনুন। একদিন জনৈক গ্রামবাসী একটি গোসাপ শিকার করে বাড়ীর পথে ফিরছিলো। পথিমধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার দেখা হলে তিনি তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কথার এক পর্যায়ে লোকটি তার হাতের মৃত গোসাপটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ছুড়ে দিয়ে বলল, এই গোসাপটিকে বলুন। এটি আপনার নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিলে তবেই আমি আপনার নবুওয়াত স্বীকার করবো, অন্যথায় নয়। লোকটির কণ্ঠে ছিল নিসংশয়তা—একেতো নির্বোধ প্রাণী, তার উপর মৃত। এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মুখে পতিত প্রাণীটির প্রতি শুধু একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাতেই আল্লাহ্ পাকের কুদরত সক্রিয় হয়ে উঠল—একটি নির্বাক মৃত প্রাণীর দেহে ফিরে এল সবাক প্রাণের সাড়া।

যে নবীর সামান্য দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলে মৃত প্রাণী প্রাণ ফিরে পায় আমরা সেই নবীর জীবনাদর্শকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। আমাদের প্রতি যে নবীর অনুগ্রহের কোন শেষ নেই, যিনি আমাদের কল্যাণ চিন্তায় গোটা জীবন অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন, নিজের দেহ মোবারককে রক্তে রঞ্জিত করেছেন, আমাদের প্রতি তাঁর এই মহান আত্মত্যাগের এ কেমন প্রতিদান দিচ্ছি! আধ টুকরো রুটি খেয়ে নির্বোধ কুকুর যেখানে মনিবের জন্য জীবন বাজি রাখতে দ্বিধা করে না, সেখানে আমাদের সবচেয়ে বড় দরদী বন্ধুর সঙ্গে আমরা সীমাহীন বেওয়াফায়ী করে চলেছি। তায়েফের পথে পথে ছড়ানো পাথর-খণ্ড আর পর্বতশ্রেণীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, সেখানকার পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডদের হাতে প্রহৃত রক্তাক্ত নবী তাদের প্রতি কতটা মমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উপত্যকার দু'প্রান্তের দুই পাহাড় যেখানে তাঁর সামান্য অনুমোদনে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে সকল পাষণ্ডকে মুহূর্তে পিষে দিতে পারত, সেখানে দরদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরম মমতায় সকলের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন।

মমতাময় সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়ে আজ আমরা ক্ষমা করতে ভুলে গিয়েছি। পরস্পরের ভুল-ত্রুটিকে মাফ করার মত ধৈর্য্য আমাদের নেই। প্রতিশোধ গ্রহণে চরম অক্ষম ব্যক্তিটিও আর কিছু না পারলেও অন্ততঃ বদদো'আর ভাষায় আক্রমন করতে ছাড়ে না। যেই নবীর হাতে প্রতিশোধ গ্রহণের যাবতীয় আয়োজন সহজলভ্য থাকা সত্ত্বেও শত্রুর প্রতি মমতায় বিগলিত হতেন, আফসোস! আমরা সেই নবীরই উম্মত!

যে নবীর নিপীড়িত অবস্থা দেখে তায়েফের পর্বতশ্রেণী বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছিল এবং আসমানের ফিরিশ্‌তারা পর্যন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল ; সেই রক্তাক্ত নবীকে যখন আল্লাহ্ পাক তাঁর শত্রুদের সম্পর্কে বললেন, 'আপনি চাইলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিব' ; জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয় আল্লাহ্! তা হবে না। হিদায়াত এদের ভাগ্যে যদি নাও ঘটে, এদের উত্তর-পুরুষদের ললাট সেই সৌভাগ্য-চন্দ্রিকা নিশ্চয় চুম্বন করবে। তাদের নিক্ষিপ্ত পাথর-খণ্ডে আমার দেহ রক্তাক্ত হওয়ায় যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তাতে আমারও সন্তুষ্টি রয়েছে।

সেই দরদী নবীর সঙ্গে আজ আমরা বেওয়াফায়ী করে চলেছি! অথচ নবীর আদর্শ অনুসরণ করা আমাদের নিজেদের যেমন দায়িত্ব ছিল, তেমনি আর সকলের নিকট সেই আদর্শের দাওয়াত পৌছে দেওয়াও ছিল আমাদের সমান কর্তব্য। এই দায়িত্ব বিশেষ কোন ব্যক্তি, দল বা জনগোষ্ঠির নয় ; এ দায়িত্ব সকল মুসলমান নারী-পুরুষের।

কুকুর তো আধ টুকরো রুটি খেয়ে গোটা জীবন দাতার দরজার পাশে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের ২৩ টি বছর আমাদের জন্য চোখের অশ্রু বিসর্জন দিলেন, কষ্টের পাথর বুকে বেঁধে আহাজারি করলেন, রাতের পর রাত সিজদায় পরে কাঁদলেন, আর নির্যাতনের কঠিন যাতনায় গোটা জীবন বিপর্যস্ত হয়ে রইলেন ; তাঁর আদর্শ ত্যাগ করে আমরা তাঁর প্রতি এ কেমন বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের পরিচয় দিচ্ছি!

ক্রন্দনরত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযি.) মাঝে মাঝে নবীজীর বেচইনী ও অস্থিরতা দেখে কাঁদতেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সিজদা দেখে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে ভেবে মাঝে মাঝে আমি ভীত হয়ে পড়তাম।

সেই নবীর রিসালাত এবং মহান রাব্বুল আলামীনের তাওহীদের বাণী প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আফসোস! আজ আমরা নিজ হাতে

তাঁর প্রদীপ্ত করে যাওয়া আদর্শের বাতিখানা নিভিয়ে দিচ্ছি। তাঁর রেখে যাওয়া ইসলামের বুনিয়াদ ও সুরম্য সৌধের একেকটি ইট খুলে খুলে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি।

যাইহোক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য দৃষ্টি পড়তেই জীবন ফিরে পেয়ে গোসাপ ঘাড় উঁচু করে এক অভিনব সম্বোধন করে বললো—

لبيك و سعديك يا زين من وفأ يوم القيمة

'হে কেয়ামতকে সৌন্দর্যদানকারী! আমি উপস্থিত।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাপটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

من تعبد

তোমার রব কে ?

জবাবে গোসাপটি বলল—

من في السماء عرشه و في الارض سلطانه وفي البحر

سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه -

আমার রব্ ঐ সত্ত্বা যার আরশ আকাশের উপর,
দুনিয়ার উপর যার রাজত্ব,
সমুদ্রের বুকে যার পথ,
জান্নাতে যার রহমত এবং
জাহান্নামে রয়েছে শাস্তি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন—من انا আমি কে ? জবাবে গোসাপটি বলে উঠলো—

اَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -

আপনি রাব্বুল আলামীনের রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আপনাকে যে স্বীকার করবে সে কামিয়াব। আর যে স্বীকার করবে না সে নাকাম ও ব্যর্থ।

সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য

মহান রাব্বুল আলামীন গোটা মানব জাতীর উপর সাক্ষীর সম্মান দিয়ে আমাদের কাঁধে যে গুরু দায়িত্ব চাপিয়েছেন আমাদেরকে সে দায়িত্ব অবশ্যই

পালন করতে হবে। আল্লাহ্ পাকের ওয়াহ্দানিয়াত এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দাওয়াত গোটা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সমস্ত মুসলমানের হৃদয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার বীজ বপনের মেহনত করতে হবে। মালি তার বাগানে ফল ও পুষ্পের বীজ শুধু বপন করতে পারে, অঙ্কুরিত করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু বীজ বপন করার ক্ষেত্রে নিজের সমস্ত আন্তরিকতা ও সামর্থকে সে উজাড় করে দিয়ে থাকে। মাটির দিকে ঝুঁকে বীজ বপন করতে করতে তার কোমর বাঁকা হয়ে যায়। দেহের সমস্ত রস-রক্ত ঘাম হয়ে ঝরতে থাকে। তবেই না সে বাগানে শ্যামল বসন্তের ঢেউ খেলা করে। কালো মাটি সবুজ হিল্লোলে নেচে ওঠে।

কিন্তু আফসোস! মানব-বাগিচার মালিরা আজ ঘুমিয়ে আছে। গোটা বাগান উজাড় হয়ে গেছে। সেদিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, সে জন্য তাদের মনে সামান্য বেদনাও নেই। বাগানের একটি চারাগাছ মরে গেলে, একটি ফুল ঝরে পড়লে মালির ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না। অথচ এদিকে গোটা মানব-বাগিচাটিই যে উজাড় হয়ে গেছে, সে জন্য মালিদের মনে কোন দুঃখ নেই। ফুল-পুষ্প শোভিত শ্যামল বাগানের প্রতি যে মালির আকর্ষণ নেই, সে আবার কেমন মালি!

چمن میں تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا
ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں اک شور تھا غل تھا
کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی
بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا

পুষ্প-পল্লবে বাগিচা যখন সুশোভিত ছিল, তখন বুলবুলি ও পাখীদের গীত-কলরবে তা ছিল মুখরিত। কিন্তু নার্গিস ফুল যখন তার ফুটন্ত শোভা বিস্তার করলো তখন বাগিচায় কিছু গুল্মকাটা ছাড়া তার সঙ্গী আর কেউ ছিল না। মালি তাকে কেঁদে কেঁদে স্মৃতিগাঁথা শোনালো—এখানে ফুলেরা হেসে লুটোপুটি খেত, এখানে ফুটত গোলাপ-কলি।

বাগানের শ্যামল রূপের প্রতি স্বয়ং মালিই যদি নিরাগ্রহ ও উৎসাহহীন হয়ে পড়ে, তাহলে বাগানের শ্যমলিমা কীভাবে আশা করা যেতে পারে। দুনিয়ার কর্ম-ব্যস্ততা থেকে যখন মানুষের অবসরই মেলে না, তখন কে হবে আল্লাহ্র সাক্ষী। অথচ দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে গিয়ে আল্লাহ্ পাকের ওয়াহ্দানিয়াত

বা একত্ববাদ এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দিতে হবে। এই সাক্ষ্যদানই হলো তাবলীগ। দুনিয়ার প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে এই দাওয়াত দিতে হবে। নিরন্তর ছুটে চলা স্রোতের ন্যায় অবিরাম। নগর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে—দুনিয়ার সর্বত্র পায়ের চিহ্ন এঁকে দিতে হবে। দূরদেশের সুদূর প্রান্তে দ্বীনের দাওয়াত দিতে দিতে আমাদের জীবনাবসান হবে। আর অক্ষয়-অমর হয়ে থাকবে আমাদের সেই মেহনত-কৃতি।

যে ধুলোকণা আপনার পদস্পর্শ পাবে, বাতাসের যে হিল্লোল আপনাকে ছুয়ে যাবে, তারা সকলেই আপনার হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে—আয় আল্লাহ্! এখান দিয়ে, এই পথে আপনার পয়গাম নিয়ে এই ব্যক্তি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ছুটে গিয়েছিলো।

মোহ্‌তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে, এই দুনিয়া ধ্বংসশীল, আর আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়া একদিন বিনাশ হয়ে যাবে, আর আখেরাত অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। এই দুনিয়া মিথ্যা আর আখেরাত সত্য। এই দুনিয়া লাঞ্ছনা ও অপমানের স্থান। আখেরাত সম্মান ও ইয্যতের স্থান। দুনিয়াতে চিন্তা ও পেরেশানী সার্বক্ষণিকভাবে মানুষকে ঘীরে থাকে। আর আখেরাতে মানুষ নিশ্চিন্ত-নিরাপদ ও আনন্দময় জীবন লাভ করবে। এই দুনিয়া বিচ্ছেদের ঘর। আখেরাত মিলনের ঘর। এখানে শুধু হিংসা, হানাহানি, আর আখেরাতে শুধু প্রেম-ভালবাসা। এখানে যুদ্ধ, ওখানে শান্তি। এখানে ভয়, ওখানে নিরাপত্তা। এখানে রোগ-ব্যাধি মানুষকে জর্জরিত করে, আর আখেরাত স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এখানে বার্ধক্য মানুষকে কাবু করে ফেলে। ওখানে যৌবন চিরঞ্জীব হয়ে বেঁচে থাকে। এখানে দরিদ্রতা মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। আর ওখানে ধন-সম্পদ ও নাজ-নেয়ামত মানুষকে প্রাচুর্যময় করে তোলবে। এই দুনিয়া কাঁদামাটির আর আখেরাত স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। দুনিয়াতে যেমন রাজা-বাদশা, উজীর-নাজির, আমীর-গরীব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। আখেরাতেও তেমনি থাকবে এক রাজসভা। রাজ-সিংহাসনে আল্লাহ্ পাক উপবিষ্ট থাকবেন। ডানে-বায়ে থাকবে তার বান্দা-বান্দিরা। সেখানে মানুষ নবীদের প্রতিবেশী হয়ে থাকবে। সেখানে থাকবেন আম্মাজান হযরত খাদিজা (রাযি.), আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.), আম্মাজান হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযি.), আম্মাজান হযরত উম্মে সালমা (রাযি.)। থাকবেন আম্মাজান হযরত হাওয়া ও মারইয়াম (আ.), আরো থাকবেন হযরত হাজেরা (রাযি.)-সহ অসংখ্য মহীয়সী রমণীগণ।

আম্মাজান হযরত হাজেরা (রাযি.) এই উম্মতের জন্য যেই কুরবানী করে

গিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়। স্বামী বিহনে তিনি তার প্রায় গোটা যৌবনই কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের সোনালী সময়টি কেটেছে মক্কার রুক্ষ পাহাড়-পর্বত আর টিলা-উপত্যকায়। স্বামী যে-ই হোক, যদি স্ত্রীর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক থাকে, তাহলে বিচ্ছেদ নিশ্চয় কষ্টদায়ক হয়। স্বদেশ ছেড়ে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত স্বামী ছেড়ে মক্কার কালো পাহাড়ের পাদদেশে তার যৌবন প্রখর বেলা থেকে বিকেলে গড়ালো, তারপর ক্রমশ সন্ধ্যা নেমে এল, এবং সেই উষর মরুর কোলেই তিনি তাঁর নশ্বর দেহ সমর্পণ করলেন।

আখেরাতের সেই শাহী মজলিসে আম্মাজান হযরত হাজেরা (রাযি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হবে। শুধু তিনিই নন, বরং সেদিন সকল মহীয়ষী রমনীদেরই সাক্ষাত পাওয়া যাবে। হযরত আম্বিয়া (আ.)গণের সঙ্গেও দেখা হবে। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সমস্ত কুদরতী পর্দা হটিয়ে দৃশ্যমান হয়ে বলবেন—

سلام قولا من رب الرحيم

আমার বান্দারা! তোমাদের রবের সালাম গ্রহণ কর।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এই সাক্ষ্য নিয়ে আমাদেরকে মানুষের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে গিয়ে আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলতে হবে। মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবনের কথা বলতে হবে। বলতে হবে—এই দুনিয়া ধোঁকার ঘর, মাকড়সার জালের মত ক্ষণভঙ্গুর আশ্রয়। মাছির পরের মত নিতান্ত মূল্যহীন। এই ধোঁকার জগত কারো স্থায়ী নিবাস নয়। এখানে স্থায়ীভাবে কেউ থাকেও নি, থাকবেও না। কাজেই বুঝেশুনে নিজেকে সামলে চলো।

لاتموتن الا و انتم مسلمون

মৃত্যু আসার পূর্বেই নিজেকে খাঁটি মুসলমানরূপে গড়ে তোল। এই সত্যের সাক্ষ্য, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য, জান্নাত-জাহান্নাম ও আখেরাতের সাক্ষ্য প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। অপরিহার্য-ভাবেই আমাদেরকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর সন্তানদের মাঝে সে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা তৈরী করতে হবে মায়েদের। এ মহান দায়িত্ব উম্মতের কাঁধে পূর্বেও যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শুধু শেলাই-ফোঁড়াই আর ঘর-কন্যার কাজের মধ্যে মানুষের জীবনকর্ম সীমাবদ্ধ নয়। এর বাইরেও জীবনের আরও একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে।

সাক্ষী সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক

প্রদত্ত সাক্ষ্যর গ্রহণযোগ্যতার জন্য সাক্ষ্যদানকারীর সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক। কোনভাবে যদি সাক্ষ্যদানকারীর মিথ্যাবাদীতা প্রমাণিত হয় তাহলে তার সাক্ষ্যর কোন মূল্য থাকে না। কাজেই আখেরী উম্মতের প্রদত্ত সাক্ষ্যর সত্যতা প্রমাণের জন্য তাদের নিজেদের সত্যবাদী সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক। এখন সেই কাজটি কীভাবে সম্ভব ? তাদের সত্যতার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে ? আদালত কক্ষে দণ্ডায়মান সাক্ষী সম্পর্কে স্বয়ং এসপি সাহেব যদি বলেন যে, এ লোক আমার জানাশোনা, তার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা যায়। তাহলে পুলিশ তার সম্পর্কে সন্দেহও প্রকাশ করে না এবং তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করাও আবশ্যক মনে করে না। তেমনি এই আখেরী উম্মত রাব্বুল আলামীনের আদালত কক্ষে যখন সাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তখন গোটা দুনিয়ার বাতিল ও শয়তানী-শক্তি বলে ওঠলো, এরা কারা ? এরা সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে তার প্রমাণ কি? তখন আল্লাহ্ পাক আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বললেন, আয় আমার হাবীব! এরা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, আপনি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে বলে দিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এরা সত্যবাদী। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, ওহে শোনেছো তোমরা! আরশ-ফরশ, লৌহ-কলম, আসমান-যমীন, উত্তর-দক্ষীণ, পূর্ব-পশ্চিম কোথাও এদের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। আমার হাবীব যখন তাদের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, তখন আমিও তাদের সত্যতার ঘোষণা দিচ্ছি, এবং আদালত মুলতবী ঘোষণা করছি। রায় আগামী কাল শোনানো হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের পর রায় ঘোষনার জন্য ভিন্ন দিন ধার্য করাই সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ্‌র আদালতেও সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের পর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে আদালত মূলতবী ঘোষণা করা হয়েছে। কাল কেয়ামতের দিন রায় ঘোষণা করা হবে। হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামগণ যে যার কবরে চলে গিয়েছেন। আমরাও আমাদের কবরে চলে যাব। কাফির-মুশরিকদেরও শেষকৃত্য হয়ে যাবে। তারপর সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে।

হযরত নূহ (আ.)-এর সাক্ষী

কাল কেয়ামতের দিন দ্বিতীয় বারের মত রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। আল্লাহ্‌র আদালতে আল্লাহ্ পাক উপস্থিত হবেন। ফিরিশতারা দলে দলে আসবেন। জান্নাত-জাহান্নাম উপস্থিত করা হবে। পুলসিরাত কায়েম করা হবে। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামগণও উপস্থিত হবেন। সমস্ত উম্মতগণকেও

একদিকে এনে হাজির করা হবে। আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এসে উপস্থিত হবেন। আমরাও সেখানে উপস্থিত হবো। প্রথম বিচার হবে হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মতের। তাদেরকে ডাকা হবে। হযরত নূহ (আ.)-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে—বলুন, আপনি আমার পয়গাম পৌঁছিয়েছিলেন কি না? তিনি জবাবে বলবেন, আয় আল্লাহ্! আমি আমার দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য মেহনত করেছি। আল্লাহ্ এবার তাঁর উম্মতদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, ওহে! তোমরা বল, নূহ (আ.) আমার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলেন কি না? তারা বলবে, না, তিনি আমাদের নিকট কোন পয়গাম পৌঁছান নি। আল্লাহ্ পাক তখন হযরত নূহ (আ.)-কে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ! তোমার উম্মত তো অস্বীকার করছে। তোমার দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি? হযরত নূহ (আ.) বলবেন, আমার এই তিন ছেলে সাম, হাম ও ইয়াফিস আমার সাক্ষী। এরা আমার প্রয়গাম অনুযায়ী কালিমা পড়ে ঈমান এনেছিলো। আর এই সকল নারী-পুরুষরা, যারা আমার দাওয়াত অনুযায়ী ঈমান এনেছিলো, আমি এদেরকে আমার সাক্ষীরূপে পেশ করছি। যেহেতু এরা আমার সমসাময়িক সময়ের লোক। তাই এরা আমার জীবনাচার, আমার কর্মপদ্ধতি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আমি ৯৫০ বছর পর্যন্ত আপনার নামে সকলকে ডেকেছি ...

قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا ۞ وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِي اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞

অর্থঃ সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি ; কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে

প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন।—*সূরা নূহ ঃ আয়াত-৫-১১*

হযরত নূহ (আ.) বলবেন, আয় আল্লাহ্! এই আমার তিন ছেলে, যারা ছিল আমার কর্ম জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী। আর আয় আল্লাহ্ আখেরী নবীর উম্মতগণকে ডাকুন। আমি আপনার পয়গাম প্রচার করেছি কি না, তারাই সে সাক্ষ্য দিবে। ফলে রাব্বুল আলামীনের আদালতে সাক্ষীরূপে আমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। নারী-পুরুষ, আলেম-জাহেল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনি-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সকলেই উপস্থিত হবে। শুধু গাড়ী হাঁকানো সাহেবই নয় ; ফুটপাথে বসে জুতা পালিশকারী আপাত তুচ্ছ ব্যক্তিটিও সেদিন এই সম্মানের মুকুট মাথায় পড়বে। শুধু আরাম কেদারায় বসে থাকা মালকিনই নয় ; বরং বাড়ী বাড়ী গিয়ে বাসন মাজা আর ঘর মোছার কাজ করেন যে সকল ভগ্নিরা, তারাও সেদিন আকাশ ছোঁয়া এ সম্মানের অধিকারিনী হবেন। সকলেই সেদিন সাক্ষীরূপে উপস্থিত হবে। আমাদের নিকট সাক্ষ্য তলব করা হবে। ফলে আমরা বলবো, আয় আল্লাহ্! আপনার নবী হযরত নূহ (আ.) স্বীয় কওমের মাঝে আপনার পয়গাম প্রচার করেছেন। তখন তারা সকলে বলে ওঠবে, এরা কীভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে ? এরা তো আমাদের সমকালীন নয়। আমাদের সময় কী ঘটেছিলো তা তো তারা দেখেও নি, জানেও না। তাদের একথার জবাবে বলা হবে, ওহে আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ! এরা তো বলছে, তোমরা সেকালে ছিলে না। সুতরাং কীভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছো? জবাবে আমরা বলবো, আপনি আমাদের নিকট আপনার সত্য নবীকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর নিকট আপনি আপনার সত্য কিতাব নাযিল করেছিলেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম বলবেন, আয় আল্লাহ্! আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সে ঘটনা শুনিয়েছেন। সাহাবা-পরবর্তী লোকেরা বলবেন, আমাদেরকে আপনার হাবীবের সঙ্গী-সাথীরা বলেছেন। এভাবে তাদের পরবর্তী লোকেরা বলবে, আমাদেরকে পূর্ববর্তী লোকেরা শুনিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমরা বলবো, আমাদেরকে আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা শুনিয়েছেন। আমাদের পরবর্তী লোকেরাও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কথা বলবে। এভাবে সাক্ষীর ক্রমধারা সর্বশেষ মুসলমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আপনার পবিত্র কালাম এবং আপনার সত্য নবীর পবিত্র জবানীতে যা বিবৃত হয়েছে, তারই প্রেক্ষিতে আমরা এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী নূহ (আ.) আপনার পয়গাম প্রচার করেছিলেন। তখন

রাব্বুল আলামীন বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্য কবুল করে নিলাম।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! সেই সাক্ষ্য প্রদান পর্যন্তই আমাদের দায়িত্ব। তারপরই আমাদের ছুটি। তারপর আমাদের সামনে থাকবে শুধু জান্নাতের অবারিত দ্বার। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়া আর অনন্ত আনন্দের মাঝে হারিয়ে যাওয়া। থাকবে শুধু পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের আনন্দময় লগ্ন। এছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই, কোন দায়িত্ব নেই, নেই বিধিনিষেধের কোন বন্ধন। মুক্তি এবং অনন্তকালের জন্য অফুরন্ত ছুটি।

শৈশবে স্কুলে যখন ছুটির ঘন্টাটি বাজতো, লাফিয়ে লাফিয়ে টেবিল টপকে আমরা বাইরে ছুটে যেতাম। ক্লাশরুমের বন্দীদশা থেকে মুক্তির আনন্দে উল্লাসে ফেটে পরতাম। পড়ালেখায় মনোযোগী ছেলেরা তো বসতো সামনের দিকে। আমাদের মত বিত্তবানদের ছেলেরা সব বসতাম পিছনের দিকে, আর অপেক্ষায় থাকতাম—'কখন বাজবে ছুটির ঘন্টা'। ঘন্টার প্রথম টুং শব্দটি শোনামাত্রই 'হাই জাম্প'—'ছুটি ছুটি' বলে চিৎকার দিতে দিতে সকলের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পড়তাম বাইরের আঙ্গিনায়।

খোদাভীরুদের পুরস্কার

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের এই সাক্ষ্য-প্রদান-পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ছুটি ঘোষণা করা হবে। আল্লাহ্ পাক বলবেন—

كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية *

বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।—*সূরা হাক্কাহ্-২৪*

স্বামী সোহাগভরে স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে পান-পেয়ালা। স্ত্রীও প্রেমের আবেশ-মাখা পেয়ালা তুলে ধরবে স্বামীর মুখে। খাদেম, ফিরিস্তা আর হুর-গিলমানের দল মালিক আর মালকিনের জন্য পাত্রে সাজানো থরে থরে খাদ্যসম্ভার আর পানপেয়ালা নিয়ে প্রস্তুত থাকবে চারিদিকে। কোন পাত্রে পাখীর ভুনা মাংস, কোনটাতে সুমিষ্ট সতেজ ফল। শুধু খাদেম আর হুর-গিলমান দিয়েই নয়, বরং সেদিন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক নিজ হাতে স্বীয় বান্দাদেরকে অপূর্ব সব পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করবেন। আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য সেই মুহূর্তটি কতইনা লোভনীয় ও চিত্তহারী হবে। তারা সেদিন সবুজ মসনদে এবং মহামূল্যবান

রেশমের চাদরে ঢাকা বিছানায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এই হল আমাদের কাজ। এটা রায়বেন্ড, যাকারিয়া মসজিদ বা তাবলীগওয়ালাদের নিজস্ব কোন কর্মসূচী নয়। এই মেহনত একান্তই আসমানী কিতাবের নির্দেশ—

لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।—*সূরা বাক্বারা-১৪৩*

কাজেই দাওয়াতের এই মেহনত এখন আমাদের অপরিহার্য্য দায়িত্ব। তাওহীদ ও রিসালাত এবং আখেরাতের দিকে মানুষকে ডাকতে হবে আর সমস্ত ব্যস্ততা থেকে মানুষের মনোযোগকে আখেরাতমুখী করতে হবে। এই চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার উপর মানবজাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব প্রতিটি মায়ের। বুকে পাথর বেঁধে সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় বের করে দিন। স্ত্রীদের উচিত নিজের সমস্ত আবেগ ও ভালবাসাকে গৃহের নির্জন কোন প্রকোষ্ঠে দাফন করে স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় বের করে দেয়া। এর বিনিময়ে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাকে অতি স্নেহের সঙ্গে ডেকে বললেন— جنت عدن يدخلونها আস, আজ তোমার জন্য আমার জান্নাতুল ফিরদাউসের দ্বার অবারিত। তোমার পিতা-মাতা এবং স্ত্রী-সন্তানদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং স্ত্রী-সন্তান সকলেই তোমার সঙ্গী হবে। তোমার জীবন থেকে মৃত্যুর চির অবসান হয়েছে। বার্ধক্য আর কখনো তোমার এ দেহে ছায়াপাত করবে না। রোগ-ব্যাধি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কলহ-বিবাদ, বিপদ-আপদ আর কখনো তোমার শান্তির জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে আসবে না। আজ হতে তোমার জীবনে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

আমার ভাই ও ভগ্নিগণ! আপনাদের কাছে আমার করজোড় অনুরোধ—আজ থেকে আপনারা নিজেদের নিয়ত ও হাইসিয়ত পরিবর্তন করে ফেলুন এবং নিজেদেরকে আল্লাহ্ পাকের আদালতের সাক্ষীরূপে মনে করুন। মূলতঃ আমরা সকলে দুনিয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি হিসাবেই এসেছি। আমাদের পরিচয় শুধু চার সন্তানের জননী বা দোকান-ইন্ডাষ্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী ও গাড়ী-বাড়ির মালিকরূপে নয়। বরং আমাদের পরিচয় আরো বৃহৎ আরো মহৎ কিছু। সে পরিচয়টা কি? তা হলো,

আমরা আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর (আ.)-এর সাক্ষী। আমাদেরকে সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামের নায়েব ও প্রতিনিধি হয়ে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে। এ হল আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে হবে এবং মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই মেহনতের উদ্দেশ্যে আজ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলকেই নিয়ত করতে হবে। রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

—▣—

নবী নামের মাহাত্ম্য

نحمده و نصلى على رسوله الكريم . اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم .

আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! এই পৃথিবী আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি। কোন কিছুর স্রষ্টা বা প্রস্তুতকারকের পক্ষেই কেবল বলা সম্ভব যে সে বস্তুটির পিছনে কী পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয়েছে এবং এর মূল্য কী ও কত হওয়া উচিত। এই পৃথিবীর স্রষ্টা যেহেতু মহান রাব্বুল আলামীন, তাই তাঁর পক্ষেই কেবল এই পৃথিবীর সঠিক মূল্য ও মান নির্ধারণ করা সম্ভব। তিনি তাঁর সৃষ্টি পৃথিবীর মূল্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে বলেছেন—'এই পৃথিবীর মূল্য আমার নিকট মাছির একটি পরের সমানও নয়'।

لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقي منها كافرا شربة .

আল্লাহ্ পাক বলেন, এই পৃথিবীর মূল্য আমার নিকট যদি (ক্ষুদ্র, তুচ্ছ) একটি মাছির পরের পরিমাণও হতো, তাহলে আমি কাফেরদেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতাম না।

অথচ বাস্তব হলো, পৃথিবীতে কাফিরগণ বিপুল প্রাচুর্য ও বিলাস-সামগ্রির মাঝে অবগাহন করে চলেছে। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন—

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون * ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكؤون * وزخرفا

'যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা মেহেরবান আল্লাহ্কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের

জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালঙ্ক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম।' —*সূরা যুখরুফ - ৩৩-৩৪*

যদি দুর্বল-ঈমান মুসলমানদের দ্বীন ত্যাগ করার আশংকা না থাকত তাহলে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের গৃহের দেয়াল, ছাদ, দরজা-জানালা এবং গৃহের আসবাব-পত্র স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মাণ করে দিতেন। হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে, 'আর তাদের দেহগুলো লৌহ দিয়ে নির্মাণ করতাম।' অর্থাৎ, তারা নিরোগ দেহের অধিকারী হতো এবং বার্ধক্য ও জড়া কখনো তাদের দেহে ছায়াপাত করতো না।

কিন্তু মুসলমানদের উপর দয়া করে মহান রাব্বুল আলামীন তা করেন নি। কারণ, তাহলে সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী কিছু মুসলমান ছাড়া বাকি সকলেরই পদস্খলন ঘটতো। বিশেষত, বর্তমান ব্যবস্থাপনায়ও যখন মুসলমানগণ প্রবল ঢলের মুখে শুকনো খড়কুটোর মত বদদ্বীনীর দিকে ভেসে যাচ্ছে ; তখন, যদি তাদেরকে কাফিরদের স্বর্ণ-রৌপ্যের বাড়ি-ঘরের বিপরীতে শূন্য হাতে পর্ণ কুটিরে বাস করতে হতো, তাহলে ঈমানদার মুসলমান খুঁজে পাওয়াই মুসকিল হতো। কাজেই দয়ালু আল্লাহ্ পাক সুখ-দুঃখ ও বিত্ত-বৈভব মুসলিম-মুশরিক উভয়ের মাঝেই ভাগ করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট এতটাই তুচ্ছ ও মূল্যহীন বস্তু যে, মুসলমানদেরকে কানাকড়ি পরিমাণও না দিয়ে সমস্তই যদি কাফির-মুশরিকদেরকে দিয়ে দেয়া হত, তবুও মুসলমানগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। কারণ, খাঁটি ঈমানের বদৌলতে সেই কপর্দকহীন শূন্য-হাত মুসলমানগণ আল্লাহ্ পাকের নিকট এতটাই মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠতো যে, আল্লাহ্ পাক বলেন—

يا موسي ان لي عبادي اسئلني الجنة لاعطيتهم برافها .

হে মূসা! আমার বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করলে গোটা জান্নাতই আমি তাদেরকে দিয়ে দিবো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনাহার

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, জান্নাতী রমনীদের একটি ওড়না গোটা দুনিয়ার সমস্ত খনিজসম্পদ থেকেও অধিক মূল্যবান। পৃথিবীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত খনিজসম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে, বর্তমানে যে খনিজসম্পদ মজুদ আছে এবং ভবিষ্যতে যা ব্যবহৃত হবে, সব মিলিয়ে ভূগর্ভে বিদ্যমান সম্পদের অতি সামান্য

পরিমাণই ব্যবহৃত হবে। এই সমুদয় খনিজসম্পদ থেকেও একটি ওড়নার মূল্য বহুগুণ বেশী হবে। অতএব, ভেবে দেখুন, গোটা জান্নাতের মূল্য কত হতে পারে! কিন্তু তা সত্ত্বেও মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন—যদি কেউ আমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করে, তাহলে সানন্দে তাকে আমি গোটা জান্নাত দিয়ে দিবো। কিন্তু যদি দুনিয়া প্রার্থনা করে, তাহলে কাপড় নেড়ে দেবার মত সামান্য একটি লাঠি দিতেও আমি সম্মত নই। তবে এটা এজন্য নয় যে, সে ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে হীন, অপদস্থ ও সম্মানহীন। বরং এ না দেবার কারণ হলো, আমি তাকে আখেরাতে সম্মানিত করতে চাই।

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খেজুর বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.)। গাছে ঝুলন্ত খেজুরের পরিপক্ক কাঁদি থেকে যে দু'চারটে খেজুর নীচে ঝড়ে পড়ে, সেগুলো সাধারণত কেউ কুড়াতে আসে না। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো কুঁড়িয়ে ঝেড়েমুছে খেতে লাগলেন, এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.)-কে বললেন, তুমি খাচ্ছো না যে? তিনি বললেন, لا اشتهى। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার চাহিদা নেই। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

بل انا اشتهى , هذه الصبح رابعة ما ذقت شيئا

'আমার কিন্তু যথেষ্ট ক্ষুধা রয়েছে। আজ চারদিন হতে চললো, এক লোকমা আহার্যও আমার পেটে পড়ে নি।'

এই পৃথিবীতে, এই নিখিল বিশ্বে আল্লাহ্ পাকের নিকট নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কে আছে ? কেউ নয়। বলুন তো, নিজের প্রিয় ব্যক্তিকে কষ্টে ফেলে কেউ কি আনন্দ অনুভব করতে পারে, না তা কখনো সম্ভব!

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে, চাই সে কাফের হোক বা মুসলমান, সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের চেয়েও সত্তর গুণ অধিক ভালবাসেন। তাহলে সে আল্লাহ্ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় 'হাবীব' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কী পরিমাণ ভালবাসতে পারেন! সেই আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি চারদিন যাবত কিছুই খেতে পাই নি। কিন্তু আমি যদি চাইতাম, তাহলে আল্লাহ্ পাক গোটা দুনিয়ার সমস্ত খাজানা আমার হাতের মুঠোয় এনে দিতেন। ঐ রোম আর পারস্যের সমুদয় ধন-সম্পদ আমার পায়ের কাছে এনে ফেলতেন।'

কিন্তু হে আব্দুল্লাহ্! আমি তা চাই না। তবে এমন একটা সময় আসবে,

যখন মানুষের অবস্থা এমন সচ্ছল হবে যে, কয়েক বছর পর্যন্ত জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় আয়োজন তার হাতে থাকবে, কিন্তু তারপরও আরো কীভাবে উপার্জন করা যায়, সে চিন্তায় মানুষ ব্যস্ত হয়ে থাকবে। তাদের একীন ও বিশ্বাস বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু শোন, আমি আগামি কালের জন্যও কিছু জমা করে রাখি না।

দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন

এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্ পাকের নিকট মাছির একটি পরের সমানও নয়। যদি সে পরিমাণও হত, তাহলে কোন কাফির-মুশরিককে এক ঢোক পানিও পান করতে দেয়া হতো না। আর সত্য কথা বলতে কি, মুসলমানদের পদস্খলনের আশংকা যদি না থাকতো, যদি তারা সকলেই মজবুত ঈমানের অধিকারী হতো, তাহলে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে তাদেরকে কিছুই দিতেন না। আল্লাহ্ পাক বলেন—

وان كل ذلك لما متاع الحيوة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين

'এই পৃথিবী দু'দিনের খেলাঘর মাত্র। আর আমার নিকট প্রকৃত পরিণাম খোদাভীরুদের জন্য।'—*সূরা যুখরুফ-৩৫*

এই পৃথিবীর যিনি স্রষ্টা, পৃথিবীর প্রকৃত পরিচয় তাঁর চেয়ে অধিক আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সেই মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর পরিচয় সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে বলেছেন—وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور এই দুনিয়া স্রেফ ধোঁকা। ধোঁকা কাকে বলে ? যা নয় তাই দেখতে পাওয়া। সুতরাং, আমাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার যে মনোলোভা ছবি পরিদৃষ্ট হচ্ছে, চারিদিকে যৌবনের যে জলতরঙ্গ দেখতে পাচ্ছি ; আল্লাহ্ পাক বলেন—না, সব মিথ্যা, সব তোমাদের দৃষ্টিভ্রম। অষ্ট্রেলিয়ার এই যে মনোরম শ্যামল প্রান্তর, আকাশ ছোঁয়া সৌন্দর্য, শক্তি, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য্য, সব তোমাদের চোখের ভুল। দুনিয়াতে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, সম্মান-অসম্মান যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্ পাক বলেন—এটা তোমাদের দৃষ্টিভ্রম। জাল টাকার মত এর কোনই মূল্য নেই। প্রকৃত পক্ষে এই দুনিয়া মাছির পর, ধোঁকার ঘর, আর মাকড়সার জাল ছাড়া আর কি। কেউ যদি মাছির পর দিয়ে নিজের ঝোলাটি ভরে নেয়, তাকে কি আপনারা সৌভাগ্যশালী ও বিত্তবান বলবেন! না সে ব্যক্তিটি নিরেট পাগল বলে আপনাদের নিকট বিবেচিত হবে ?

রাব্বুল আলামীনের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের মত মহামূল্যবান দৌলত দান করেছেন। আমাদের উপর এটা তাঁর অনুগ্রহের এক অবিরাম বর্ষণধারা। গোটা দুনিয়ার কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের উসিলায় বেঁচে আছে। ইহুদী-খৃষ্টান তথা সকল বিধর্মীরা এই মুসলমানদের উসিলাতেই দুনিয়াতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। দুনিয়ার বুকে যদি মুসলমান না থাকতো, কোন মানুষ থেকে যদি ঈমানের আলো বিচ্ছুরিত না হতো, তাহলে এই আসমান-যমীন ভেঙ্গে পড়তো। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله.

পৃথিবীতে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানও জীবিত থাকবে—সে মুসলমান যে স্তরেরই হোক না কেন, চাই নামায-রোযার সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকুক, হালাল-হারাম সম্পর্কেও তার কোন ধারণা না থাকুক ; শুধুমাত্র কালিমা ছাড়া দ্বীনের আর কোন বিষয়ের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই, এমন একজন মুসলমানও যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন কেয়ামত কায়েম হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ্! এখনো আমাদের অতটা অধঃপতন ঘটে নি। কমবেশ কিছু না কিছু আমল আমাদের দ্বারা হয়ে থাকে। এই মুসলমান যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন এই সূর্য আলোক বিকিরণ করে জগতকে আলোকময় করে রাখবে। চন্দ্র আপন কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। বাতাস বইবে। আকাশে মেঘেরা ভেসে বেড়াবে। বৃষ্টি হবে। শস্য-শ্যামল পৃথিবী আপন প্রাচুর্যে প্রাণময় হয়ে থাকবে। ঋতুর বদল হতে থাকবে। শীত-গ্রীষ্ম, হেমন্ত-বর্ষার পালাবদল চলতে থাকবে যথানিয়মে। প্রাণের স্পর্শে এই পৃথিবী প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু যেদিন সেই ক্ষীণ ঈমানের মুসলমানটিরও বিদায় ঘটবে, সেদিন আল্লাহ্ পাকের নিকট এ জগতের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। এই জগত-স্রষ্টার নিকট একজন মুসলমানের মর্যাদা এতটাই গভীর। কাজেই নিজেদের সেই মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। জেনে রাখুন, পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রটি থেকে নিয়ে প্রবল-পরাক্রান্ত আমেরিকা পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আপনাদের উসিলাতেই খেতে পাচ্ছে। দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীই মুসলমানদের উসিলায় রিযিক লাভ করছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর আল্লাহ্ পাকের নিকট এই দুনিয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। দুনিয়ার কারো সঙ্গেই আল্লাহ্ পাকের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। ঈমানের বিচারেই বান্দার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কের গভীরতা বিবেচিত হয়। ঈমানের সেই মহামূল্যবান দৌলত আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বিনা প্রার্থনায় দান করেছেন। আমাদের একজন হত দরিদ্র ব্যক্তিও প্রকৃত বিচারে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ে বহুগুণ ভাগ্যবান। কারণ সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় লাভ করেছে। মুসলমানদের একজন গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিও আইনষ্টাইনের মত বিজ্ঞানীর চেয়ে বেশী সমজদার। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের সমজ সে ব্যক্তির অন্তর গ্রহণ করতে পেরেছে। পশ্চিমা বিশ্বের সব বিজ্ঞানীদের চেয়ে একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মুসলমানকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করা যেতে পারে। কারণ, আখেরাতকে সে জেনেছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে মেনেছে। যে ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় লাভ করেছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর আখেরী নবী হিসাবে স্বীকার করেছে, তার চেয়ে বড় বুদ্ধিমান দুনিয়াতে আর কে হতে পারে। এই কাঁদামাটির তৈরী দেহ আর বছর কয়েকের একটি জীবনের পিছনে নিজের যাবতীয় শ্রম, সাধনা ও সময় ব্যয় করে দেয়ার মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কতটা পাওয়া যায় জানি না, কিন্তু নির্বুদ্ধিতা যে ষোলআনাই আছে তাতে সন্দেহ নেই।

একবার গাশ্‌তে গিয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠলো, মিয়া! মানুষ এখন চাঁদে পৌছে গিয়েছে, আর আপনারা এখনো নামায-রোযা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জবাবে আমাদের এক সাথী বললেন, জানোয়ার হয়ে চাঁদে বিচরণ করার চেয়ে মানুষ হয়ে যমীনে অবস্থান করা অনেক শ্রেয়।

প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির পিছনেই স্রষ্টার একটা উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ্ পাকও আমাদেরকে একটি উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করেছেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, আমরা কি নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছি, না মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার এই সুন্দর আকৃতি নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে নি। তাছাড়া আল্লাহ্ পাকও আমাদেরকে কেমন অবয়বে সৃষ্টি করবেন সে বিষয়ে আমাদের পিতামাতার কাছেও পরামর্শ গ্রহন করেন নি। তিনি আমাদেরকে পাকিস্তানে আর আপনাদেরকে অষ্ট্রেলিয়ায় সৃষ্টি করেছেন। আরবদেরকে আরবী, অনারবদেরকে অনারবী, পুরুষকে পুরুষ আর নারীকে নারী, রঙ-বর্ণ আর

চেহারা-অবয়বে এই যে বৈচিত্রতার সমাবেশ ; কারো নাক উঁচু, কারো নাক নীচু, কেউ কালো কেউ সাদা, কেউ মোটা কেউ পাতলা—আল্লাহ্ পাক কি কাউকে জিজ্ঞাসা করে বানিয়েছেন? মোটেও না। একান্তভাবেই তিনি নিজে যাকে যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে—

هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء

আল্লাহ্ পাক মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের চেহারার গঠন, দেহের অবয়ব এবং বর্ণ-বৈচিত্র, সব তারই ইচ্ছার প্রতিফলন। মানব সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ্র একক কর্তৃত্ব বিরাজমান, মানব সৃষ্টির পরও জীবন চলার জন্য রয়েছে সেই মহান রব্বের প্রদত্ত এক জীবন বিধান। গোটা পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে একত্রিত করে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন একটি বাক্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না, যাতে আমাদের জীবনের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। যে মানুষ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্ধকারে বাস করে, তার কাছে এমন বিদ্যা কী করে আশা করা যেতে পারে, যে বিদ্যা মানুষকে চূড়ান্ত মুক্তির পথ দেখাবে! আজকের মানুষ লোহা-লক্কর আর তুচ্ছ পদার্থ-চিন্তায় এমন বিভোর হয়ে পড়েছে যে, সে নিজের পরিচয় এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে। অথচ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তো এটাই ছিল যে, 'আমি কে এবং আমার এই নশ্বর জীবনের উদ্দেশ্য কী ?'

জীবনের উদ্দেশ্য

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের এই অস্তিত্ব এবং দুনিয়াতে জন্মলাভের পিছনে আমাদের নিজেদের যে কোন ভূমিকা নেই, এ সত্য অনস্বীকার্য। আমরা একান্তই আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি। তিনি অতি অল্প সময়ের জন্য আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, এবং এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমাত্র ঐশী মাধ্যমই আমাদেরকে সুনিশ্চিতরূপে অবহিত করতে পারে। কোন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা দার্শনিক-গবেষকের পক্ষে আমার-আপনার জীবনের উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহ্ পাক মেহেরবানী করে আমাদের জীবনের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আসমানী কিতাব ও আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করে দিয়েছেন। জীবনের সেই উদ্দেশ্য সফল করে তোলার মধ্যেই রয়েছে আমাদের কামিয়াবী ও

চূড়ান্ত সাফল্য। অর্থ-সম্পদের অঢেল সমাবেশ বা দরিদ্রতার কষাঘাত, কোনটা দিয়েই জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা বিবেচিত হয় না। বরং সে জীবনই সফল যে জীবন মহান রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আর যে জীবন আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে বিমুখ হয়ে নফ্স ও শয়তানের বন্দনায় লিপ্ত হয়, সে জীবন যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। আজকের মানুষের চোখে বিপুল অর্থবিত্ত আর গাড়ী-বাড়ীর মালিক হতে পারাই জীবনের চরম সাফল্য বলে বিবেচিত হয়। আর বিত্তহীন মানুষ তাদের চোখে একজন ব্যর্থ মানুষেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু জীবন সম্পর্কে আমাদের এই ব্যাখ্যা মোটেও আল্লাহ্-প্রদত্ত নয়, এটা মানুষের মনগড়া।

মহান রাব্বুল আলামীন মানুষের সফল জীবনের যে চিত্র এঁকে দিয়েছেন, তা হল তাঁর আদেশ-নিষেধ ও নবী-আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারীর জীবন। এ জীবন ও আদর্শের সঙ্গে যার জীবনের যত ব্যবধান থাকবে, সে ততই ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। সে জীবনের পরিণতি সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন—

أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا
فيها ذلك الخزي العظيم ۞

'তোমাদের কি একথা জানা নেই, যে ব্যক্তি আমার ও আমার রাসূলের সঙ্গে দুশমনী করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জলিত হতে হবে? আর এটাই প্রকৃত ব্যর্থতা এবং এটাই চরম লাঞ্ছনা ও অপদস্ততা।'—*সূরা তওবা-৬৩*

অধিকাংশ মানুষ যদিও এই ধারণাই পোষণ করে যে, ধন ও দরিদ্রতাই মানুষের সম্মান ও লাঞ্ছনার অন্যতম উপাদান। কিন্তু রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমান ব্যক্তির আপাত সম্মান যতই থাক, পরিণামের বিচারে প্রকৃত লাঞ্ছিত ব্যক্তি সে-ই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে নববীতে বসে বসে নামাজ পড়ছেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) এসে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বসে বসে কেন নামাজ পড়ছেন? জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পেটের দিকে ইশারা করে বললেন, 'ক্ষুধা! ক্ষুধায় এত কাতর হয়ে পড়েছি যে, এই পা দু'টির উপর দাঁড়াতে আমি ভরসা পাচ্ছি না।'

আমার-আপনার দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচী অনুযায়ী যে ব্যক্তির কাছে ক্ষুধা নিবারণের মত এক টুকরো রুটির সংস্থান নেই, তার চেয়ে অপদস্ত ও হীন ব্যক্তি আর কেউ নয়। অথচ দেখুন, ক্ষুধা-কাতর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব এমনই মহান যে, তাঁর সামান্য অঙ্গুলি ইশারায় সুদূর আঁকাশের চাঁদ পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। যেখানে গিয়ে সৃষ্টিজগতের যাবতীয় ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটে, আল্লাহ্ পাকের অন্যতম বৃহৎ সৃষ্টি হযরত জিব্রায়ীল (আ.)-এর জিসমানী ও রূহানী (দেহ ও আত্মার) শক্তি যেখানে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে, আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী ও জিসমানী শক্তির যাত্রা সেখান থেকে শুরু হয়। আরশের সামান্য নূরের চমকে হযরত মূসা (আ.) যেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব এমনই মহান যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর সমস্ত কুদরতী পর্দার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে অপার্থিব ভাব বিনিময়ে লিপ্ত হয়েছেন। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সুতীব্র তাজাল্লীর সামনে অবিচল ও স্থির থেকেছেন।

ঈমানের দৌলত

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে এ সত্য সম্পর্কে অবগত করতে চাই যে, বিপুল অর্থ-সম্পদ আর গাড়ী-বাড়ীর মালিক হওয়ার চেয়ে আল্লাহ্ পাকের একত্বে ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাসী ঈমানদার হওয়াই আমাদের জন্য অধিক সৌভাগ্যজনক। আদ্না থেকে আদ্না একজন মুসলমানের জন্যও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু মোবারক থেকে অশ্রু ঝরেছে। কাজেই কোন মুসলমানকেই হীন মনে করা উচিত নয়। আল্লাহ্ পাকের নিকট মুসলমানের মর্যাদা এতটাই সুউচ্চ যে, কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া তাঁর নিকট বাইতুল্লাহ্ ভেঙ্গে ফেলার চেয়েও কঠিন অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।

মুসলমানের ঈমান যতই দুর্বল হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শাফায়াত করবেন। মুসলমান ও ঈমানদারের চেয়ে মূল্যবান কোন কিছুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। গোনাহ্গার ঈমানদারগণ যতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক নবী-সিদ্দীকগণকে লক্ষ্য করে বলতে থাকবেন—তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব, জাহান্নাম থেকে মুসলমানদেরকে বের করে আনো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সুপারিশে অসংখ্য মানুষ জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এভাবে বিভিন্ন অলী-বুজুর্গ, শহীদ-সিদ্দীক ও নেক বান্দাদের সুপারিশেও বহু সংখ্যক ঈমাদনদার জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তারপর সকলের সাধ্য শেষ হয়ে যাবার পর মহান রাব্বুল আলামীন নিজেই স্বীয় কুদরতী হাত দিয়ে জাহান্নাম থেকে অসংখ্য মানুষকে বের করে আনবেন। এভাবে তিনবার তিনি মুজরিম ও গোনাহ্গার মুসলমানদেরকে বের করে আনবেন। ফলে জাহান্নাম থেকে অসংখ্য মানুষ বের হয়ে আসবে। কিন্তু তারপরও অতি স্বল্প এবং ক্ষুদ্র একবিন্দু ঈমানের অধিকারী এক অপরাধী জাহান্নামে থেকে যাবে। তার ঈমানের পরিমাণ এতই ক্ষুদ্র হবে যে, সে পরিমাণকে এটমের কোটি ভাগের একভাগ বলা যেতে পারে। সে 'ইয়া মান্নান, ইয়া মান্নান' বলে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকবে। সেই ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ হযরত জিবরায়ীল (আ.)-এর কানে পৌছাবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে বলবেন, 'আয় আল্লাহ্! এখনো জাহান্নাম থেকে একজন ঈমানদারের ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে'। ফলে আল্লাহ্ পাক হযরত জিবরায়ীল (আ.)-কে সেই অপরাধী ঈমানদারকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনতে বলবেন। আদেশ পেয়ে হযরত জিবরায়ীল (আ.) জাহান্নামের দ্বার রক্ষীর নিকট এসে বলবেন, 'একজন ঈমানদার এখনো ভিতরে আছে। তাকে বের করে দাও।' দারোয়ান মালেক তাকে বের করে আনার জন্য ভিতরে যাবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর শূন্য হাতে ফিরে এসে বলবেন, জাহান্নাম তার পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সে লোকটি যে এখন কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

জাহান্নামের একেকটি পাথরের আকৃতি গোটা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়-পর্বতের চেয়েও বড় ও ভারি হবে। সেখান থেকে একটি পাথর এনে যদি দুনিয়ায় রাখা হয়, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়-পর্বত গলে লাভার মতে বয়ে যেতে থাকবে। জাহান্নামের গায়ে যদি শুঁই পরিমাণও একটি ছিদ্র হয়ে যায়, তাহলে সেই ছিদ্রপথে যে আগুন বের হয়ে আসবে, তাতেই গোটা দুনিয়া পুরে ছাই হয়ে যাবে। জাহান্নামে সাজাপ্রাপ্ত কোন মানুষকে এনে যদি দুনিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তার একটি মাত্র প্রশ্বাসেই সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করবে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! জাহান্নাম শব্দটি যদিও সহজ-উচ্চারণযোগ্য, কিন্তু সেই স্থানটি অতীব ভয়াবহ একটি জগত। দু'চারটি চর-থাপর, কয়েক ঘা বেত্রাঘাত কিংবা কিছু কিল-ঘুষি দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত অপরাধীদেরকে জান্নাতে পৌছে দেয়া হবে, এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্ পাক অসীম দয়ালু সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে জাহান্নামের বিষয়টি অতটা সহজ

মনে করার কোন কারণ অবশ্যই নেই। কারো উপর জাহান্নামের ধোলাই একবার আরম্ভ হলে তার জন্য বিষয়টি যথেষ্ট ভয়াবহ হবে।

যাই হোক, হযরত জিবরায়ীল (আ.) ফিরে এসে নিবেদন করবেন, আয় আল্লাহ্! ঐ লোকটি যে কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আল্লাহ্ পাক বলবেন, যাও, অমুক স্থানে অমুক পাথরখণ্ডটির নীচে পড়ে আছে। হযরত জিবরায়ীল (আ.) গিয়ে পাথরখণ্ড সরিয়ে দেখতে পাবেন, তাকে ঘীরে সাপ-বিচ্ছুর দল কিলবিল করছে। সেইসব সাপ এমনই ভয়ঙ্কর যে, সেগুলোর একেকবারের দংশনে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে হবে। হযরত জিবরায়ীল (আ.) লোকটিকে এক ঝটকায় তুলে নিবেন। ফলে তার শরীর থেকে সাপ-বিচ্ছুগুলো ঝরে পড়বে। অতঃপর লোকটিকে এনে 'নহরে হায়াত'-এ নিক্ষেপ করবেন।

জাহান্নামের উপর পুলসিরাত শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই স্থাপন করা হবে। কাল কেয়ামতের দিন মুসলমানরা এই পুলসিরাত অতিক্রম করেই জান্নাতে যেতে হবে। আল্লাহ্র নেককার বান্দারা সেই পুল অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছে যাবেন, আর পাপীষ্ঠরা জাহান্নামে ধরাসায়ী হবে। অন্যদিকে কাফিরদেরকে সরাসরি জাহান্নামে ছুড়ে দেয়া হবে। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها

কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং তারা সেখানে পৌঁছানোর পর জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে।

—*সূরা যুমার-৭১*

পুলসিরাত স্থাপন করা হবে মুসলমানদের জন্য, যাতে তাদের ঈমানের বিশুদ্ধতার পরিচয় লাভ করা যায়। অনেক মুসলমান এমনই বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হবে যে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় নীচ থেকে জাহান্নাম তাদের ডেকে বলতে থাকবে—'আল্লাহ্র ওয়াস্তে তুমি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও, তোমার ঈমানের নূর আমাকে শীতল করে দিচ্ছে।' আর কিছু কিছু মুসলমান এমন থাকবে যে, পথের দু'দিক থেকে ভয়ঙ্কর শাড়াশি তাদেরকে ছোবল দিতে থাকবে আর সেই কাটার আঘাতে তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে। তারা এতই হীনবল ও বিপর্যস্ত থাকবে যে, দু' কদম চলতে না চলতেই পরে যাবে। আবার ওঠে চলতে চেষ্টা করবে। টালমাটাল দেহ নিয়ে আবার মুখ থুবরে পড়বে। এভাবেই তারা পুলসিরাত অতিক্রম করবে।

নীচে জাহান্নামের ভয়াবহ তর্জনগর্জন আর নিজের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে সেই দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমান লোকটি বিচলিত হয়ে ব্যাকুলভাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলতে থাকবে—'আয় আল্লাহ্! আমাকে পার করে দিন। আয় আল্লাহ্! আমাকে পার করে দিন।' জবাবে আল্লাহ্ পাক তাকে বলবেন, যদি আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে তোমার পার হবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ব্যাকুল হয়ে সে জিজ্ঞাসা করবে, 'আয় আল্লাহ্! বলুন কিসের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ? আল্লাহ্ পাক বলবেন, তোমার সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে নাও, তাহলেই আমি তোমাকে পার করে দেবো। লোকটি আরো অস্থির হয়ে বলবে, আয় আল্লাহ্! আমি আমার জীবনের সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে নিবো, আপনি আমাকে পার করে দিন। ফলে আল্লাহ্ পাক তাকে পুলসিরাত পার করে দিবেন। ওপারে গিয়েই সে সামনে জান্নাতের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে পাবে। আর পিছনে শুনতে পাবে জাহান্নামের ভয়াবহ তর্জনগর্জন। এবার আল্লাহ্ পাক তাকে তার পাপের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে বলবেন। কিন্তু লোকটি জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত চিত্তে ভাববে যে, পাপের কথা স্বীকার করে নিলে হয়তো আল্লাহ্ পাক পুনরায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দিবেন! ফলে সে বলবে, আয় আল্লাহ্! আমি তো কোন অপরাধ করি নি। জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়েও সে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে চেষ্টা করবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, ঠিক আছে, আমি কি স্বাক্ষী উপস্থাপন করবো ? লোকটি ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখবে। দেখতে পাবে, অদূরে জান্নাতবাসীরা জান্নাতে আর জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌঁছে গিয়েছে। তার আশেপাশে সাক্ষী দেবার মত কেউ নেই। কিন্তু হঠাৎই আল্লাহ্ পাক তার যবান বন্ধ করে দিয়ে তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দিতে বলবেন। ফলে তার হাত-পাসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলে উঠবে এবং তাদের দ্বারা কৃত বিভিন্ন পাপের বিবরণ দিতে আরম্ভ করবে। পরে লোকটিকে পুনরায় বাকশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে। তখন সে কাকুতি-মিনতি করে বলবে, আয় আল্লাহ্! জীবনে আমি আরো অনেক বড় বড় গুনাহ্ করেছি। মেহেরবানী করে আমাকে আপনি মাফ করে দিন। আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। ফলে পরম দয়ালু আল্লাহ্ পাক তাকে বলবেন, 'যাও, তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। অনুমতি পেয়ে আত্মহারা হয়ে লোকটি জান্নাতের দিকে ছুটে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তার সামনে জান্নাতকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যে, তার কাছে মনে হবে গোটা জান্নাত যেন লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। লোকটি চারিদিকে তাকিয়ে কোথাও নিজের জন্য সামান্য জায়গা দেখতে পাবে না।

এই অবস্থা দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সে ফিরে আসবে। তার অবস্থা দেখে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, 'ওহে কী হলো তোমার! যাচ্ছো না কেন ? অভিমান ভরা কণ্ঠে লোকটি বলবে, 'আয় আল্লাহ্! আমি যাবো কোথায় ? আপনি কি সেখানে আমার জন্য কোন জায়গা রেখেছেন ?'

আল্লাহ্ পাক তার এই অভিমান-ক্ষুব্ধ অনুযোগের জবাবে বলবেন, 'ওহে শোন! যেদিন আমি দুনিয়া সৃষ্টি করেছি, সেদিন থেকে দুনিয়ার একেবারে শেষ দিনটি পর্যন্ত যা সৃষ্টি করেছি, তার দশগুণ পরিমাণ যদি তোমাকে দান করা হয়, তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে ? এই কথা শোনে অবিশ্বাসের কণ্ঠে লোকটি বলে ওঠবে—

اتستهزأ بى وانت رب العالمين

'গোটা জগতের রব হয়েও কি আপনি আমার মত এক ক্ষুদ্র বান্দার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ?' আল্লাহ্ পাক বলবেন, 'অবিশ্বাসের কিছু নেই। এই দানের বস্তু আমার কাছে মোটেও বড় কিছু নয়। যাও, আমি তোমাকে দুনিয়া ও তার দশগুণ সমপরিমাণ দান করলাম।'

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! ঈমান বড়ই মূল্যবান সম্পদ। আল্লাহ্ পাক এই সম্পদ আমাদেরকে না চাইতেই দান করেছেন। তদ্রূপ নামাযও আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের এক মহা অনুগ্রহ। নামাযের একেকটি সিজদা গোটা আসমান-যমীনের চেয়েও অধিক মূল্যবান।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

'কেউ নফল রোযা রাখার পর তাকে যদি গোটা দুনিয়া পূর্ণ করে স্বর্ণ দান করে বলা হয়, এগুলো তোমার রোযার প্রতিদান ; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণও তার রোযার প্রতিদান হতে পারে না।' এ হল একটি মাত্র নফল রোযার মূল্য। সুতরাং, ফরয রোযার মূল্য যে কী পরিমাণ হবে তা কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। আর নামায তো রোযার চেয়েও অনেক বেশী মর্যাদাবান।

যাইহোক, ঐ আদনা দরজার জান্নাতী যখন জান্নাতের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হবে, খাদেম দরজা খুলে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়াবে। লোকটি খাদেমের সৌন্দর্য দেখে এমনই বিমোহিত হবে যে, তার সামনে মাথা ঝুকিয়ে দিবে। লোকটির এরূপ কাণ্ড দেখে খাদেম বলে ওঠবে, আপনি একি করছেন মালিক! জবাবে লোকটি বলবে, আপনি কি ফিরিস্তা নন? খাদেম বলবে, না জনাব! আমি তো বরং আপনার সামান্য একজন খাদেম মাত্র। আপনার অতি তুচ্ছ চাকর।

ফটকের ভিতর পথের উপর গালিচা বিছানো থাকবে। আর তার অভ্যর্থনার জন্য পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে অসংখ্য খাদেম-খাদেমা ও সেবক-সেবিকার দল। লোকটিকে স্বাগত জানিয়ে তারা বলবে, 'হে আমাদের মালিক! আপনার এত বিলম্ব হলো কেন ?' লোকটি বলবে, 'ওহে তোমরা তো জান না, আমি এতক্ষণ বিপদের কী ভয়ঙ্কর ঝড় অতিক্রম করে এসেছি। শেষ পর্যন্ত এখানে যে এসে পৌছাতে পেরেছি, সে জন্য শোকরিয়া জ্ঞাপন করো।' এভাবে স্বাগত সম্ভাষন শুনতে শুনতে লোকটি জান্নাতের আরো ভিতরে এগিয়ে যাবে। সেখানে এক প্রশস্ত ময়দানের মাঝখানে তার বিশ্রামের জন্য তখত বিছানো থাকবে। তাকে সেখানে উপবেশন করানো হবে। একযোগে আশি হাজার খাদেম তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাদ্যবস্তু ও পানীয় এনে উপস্থিত করবে। আর সে আরাম করে বসে অবর্ণনীয় আনন্দ ও ফুর্তির সঙ্গে আহার করতে থাকবে। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করতে সে মোটেও ক্লান্তি বা অরুচি বোধ করবে না। তার দাঁতও ক্ষয়ে যাবে না বা মুখও ব্যাথা করবে না। আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে তার আহারপর্ব চলতে থাকবে। প্রতিটি লোকমাই তার মুখে নতুন স্বাদের আমেজ সৃষ্টি করবে। শরবত যত পান করবে ততই তা আরো মধুর মনে হবে। দুনিয়াতে তো আহার কালে পেট যত ভরে ওঠে খাদ্যের স্বাদ ততই কমতে থাকে, এবং একসময় আর খেতেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু আখেরাতে বিষয়টি হবে এর বিপরীত। আল্লাহ্ পাক সেখানে মানুষকে এমন ক্ষমতা দান করবেন যে, অনবরত পানাহার করতে থাকলেও খাওয়ার আগ্রহ মোটেওহ্রাস পাবে না। এমনকি পেশাব-পায়খানারও প্রয়োজন হবে না।

এই আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে দুনিয়ার সময় হিসাবে বহু বছর কেটে যাবে। তারপর এক সময় খাদেমরা বলে ওঠবে, এবার আমাদের মনিবকে তার ঘরওয়ালাদের সঙ্গে মিলনের সুযোগ করে দাও। এই কথা বলে একে একে তারা সকলে প্রস্থান করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দু' চোখের সামনে নতুন এক জগৎ ভেসে ওঠবে। সে জগৎ হবে আরো শানদার, আরো মূল্যবান ও চিত্তহরণকারী বস্তুসম্ভার দিয়ে সজ্জিত। লোকটি দেখতে পাবে, অদূরে বাগিচার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এক পরমা সুন্দরী নারী অপূর্ব ভঙ্গিতে উপবিষ্ট রয়েছে। তার পরনে থাকবে সত্তর জোড়া পোশাক। প্রতিটি পোশাক হবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের এবং তা এমনই সূক্ষ্ম ও মিহিন হবে যে, সমস্ত পোশাক ভেদ করে তার দেহের সৌন্দর্য ফুটে ওঠবে। সেই যুবতী হুরের চাঁদের মত মুখমণ্ডলের ওপর যখন তার দৃষ্টি পতিত হবে, অবাক হয়ে লোকটি সেখানে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। তার দেহের সৌন্দর্যও এত স্বচ্ছ হবে যে তার বক্ষের মধ্যেও লোকটির স্পষ্ট ছায়া প্রতিভাত

হবে। মোটকথা, যুবতীর অসামান্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লোকটি অপলক নয়নে তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে যে, কীভাবে যে চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে সে বুঝতেই পারবে না। যেই লোকটি এইমাত্র জাহান্নামের ভীষণ ও বিকট-দর্শন ফিরিশতাদের দেখে এসেছে, তার পক্ষে এমন রমণী-রূপের মুখোমুখী হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক। চল্লিশ বছর পর সেই আত্মহারা লোকটির মাঝে যুবতী-হুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনবে। বলবে— اما لك منى رغبة 'হে আমার মহান মালিক! আমাকে কি আপনার প্রয়োজন নেই ?' প্রশ্ন শোনে লোকটি চমকে ওঠবে। জিজ্ঞাসা করবে, তোমার পরিচয় কি ? জবাবে হুর বলবে, আল্লাহ্ পাক আমাকে আপনার চোখের তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এ হলো এক সেন্টিমিটারের কোটি ভাগের এক ভাগ তথা অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক বিন্দু ঈমানের প্রতিদান। অতএব, ভেবে দেখুন —সেই ঈমানের কাছে আমেরিকা, ইউরোপ বা অষ্ট্রেলিয়ার বিত্ত-বৈভবের কী মূল্য রয়েছে! কাজেই আমাদেরকে হিনমন্যতা ত্যাগ করতে হবে। একথা নিশ্চিত জেনে রাখুন যে, আমাদের কারণেই এ জগৎ-ব্যবস্থা সচল-স্বাভাবিক রয়েছে এবং আমাদের কারণেই মানব-দানবসহ পৃথিবীর সকল প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, সকলের রিযিকের ব্যবস্থা হচ্ছে। আখেরী নবী হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতই হলো সর্বোত্তম উম্মত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন—

انتم خيرها و اكرمها

তোমরা সকলের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

হযরত মূসা (আ.) একবার রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে বলেছিলেন, 'আয় আল্লাহ্! আমার উম্মতের জন্য আকাশ থেকে আপনি 'মান্না-সালওয়া'র ব্যবস্থা করেছেন, মাথার উপর মেঘের সামিয়ানা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন। যাদের জন্য আপনি আপনার এত নেয়ামতের দরজা খুলে দিয়েছেন, এ জগতে তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কোন উম্মত আছে কি ?'

জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন—

اما تدري يا موسي ان فضل امة احمد علي الامم

كفضلي علي خلقي ؟

'হে মূসা! তোমার কি জানা নেই, গোটা মাখলুকের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, সকল উম্মতের উপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে আমি তেমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি ?'

আমাদের কতইনা সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছেন। যার বদৌলতে আজ আমরা এক নেকীর বিনিময়ে দশ নেকী লাভ করছি।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকসাম (রহ.) ছিলেন একজন বড় মুহাদ্দিস। সমকালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও স্বভাবে তিনি ছিলেন বেশ রসিক। তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে তাঁর সঙ্গে জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওহে বদকার বৃদ্ধ! দুনিয়াতে তুমি এই এই অপরাধ করেছিলে। এভাবে আল্লাহ্ পাক আমার গুনাহের বিবরণ দিতে লাগলেন। তখন আমি বললাম, আয় আল্লাহ্! দুনিয়াতে আপনার সম্পর্কে যেমন শোনে এসেছি, আজ আমার সঙ্গে আপনার আচরণ তো তেমন দেখতে পাচ্ছি না।

ইলমের শান দেখুন! স্বয়ং আল্লাহ্র সঙ্গেই তিনি বিতর্ক আরম্ভ করলেন— আয় আল্লাহ্! আমার সঙ্গে আজ যেমন কঠোরতা করা হচ্ছে, দুনিয়াতে তো আপনার সম্পর্কে আমি এমন শুনি নি। তখন আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন শোনেছ ? আমি বললাম—

حدثني عبد الرزاق عن المعمر عن الزهرى عن عروة ابن زبير عن عائشة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم أن جبرائيل قال : قال الله تعالي اني استحيي أن اعذبه عذاب شيبة في الاسلام و أني شيبة في الاسلام.

আয় আল্লাহ্! আপনার সম্পর্কে যে কথা শোনেছি তা পূর্ণ দলিলের সাথে আপনার সামনে উপস্থাপন করছি—আমাকে আব্দুর রায্যাক বলেছেন, তাকে মু'আম্মার বলেছেন, তাকে যুহ্রী বলেছেন, তাকে হযরত যোবায়ের (রাযি.) এর পুত্র ওরওয়া বলেছেন। তাকে বলেছেন তার খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)। তিনি আপনার হাবীব থেকে নকল করেছেন। আর আপনার হাবীবকে

বলেছেন জিবরায়ীল (আ.)। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, 'কোন মুসলমান যখন বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে তখন আমি তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করি'। আয় আল্লাহ্! আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মুসলমান অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সেই আমি আপনার নিকট এসেছি।

জবাবে আল্লাহ্ পাক বললেন—

صدق عبد الرزاق و صدق معمر و صدق زهرى و صدق
عروة و صدقت عائشة و صدق رسول الله صلى الله عليه
وسلم و صدق جبرائيل و انا اصدق القائلين

যথার্থ বলেছ। আব্দুর রাজ্জাকও সত্য বলেছে, যুহরীও সত্য বলেছে, ওরওয়াও সত্য বলেছে, আয়েশাও সত্য বলেছে, আমার মাহবুবও সত্য বলেছে, জিবরায়ীলও সত্য বলেছে। আর আমি সকল সত্যবাদীদের সেরা সত্যবাদী। আজ তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা। সেখানে গিয়ে যত ইচ্ছা আনন্দ-ফুর্তি করতে থাকো।

এটা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ পাক জান্নাত সহজলভ্য করে দিয়েছেন। একটু হিম্মত আর কিছু পরিশ্রমই জান্নাতকে আপনার হাতের মুঠোয় এনে দিবে।

উম্মতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

মোহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের এই সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণে যে, আল্লাহ্ পাক আমাদের কাঁধে এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সে দায়িত্বটি হলো—নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং পাশাপাশি আর সকলের কাছেও দ্বীনের বাণী পৌছে দেয়া। এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া প্রতিটি মুসলমানের পক্ষেই কম-বেশী সম্ভব।

পৃথিবীতে মানব জাতির আবির্ভাবের পর হতে তাদের হিদায়তের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্ পাক হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। গৃহচ্যুত মানুষকে আবার গৃহমুখী করেছেন। পৃথিবীতে আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণের আবির্ভাবের সেই ক্রমধারা আখেরী নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। এ পৃথিবীতে আর কোন দিন কোন নবীর আগমন ঘটবে না। এই মাটি আর কোন নবী-রাসূলের পদস্পর্শে ধন্য হবে না। কিন্তু মানব-চরিত্র তো ভালমন্দের

সংমিশ্রণে গঠিত। নিরন্তর তার মধ্যে চলছে পাপ-পুণ্যের সংঘাত। সঠিক পথের অনুসারী ও পূণ্যকর্মে অটল থাকার জন্য তাই তার প্রয়োজন সার্বক্ষণিক নববী ছত্রছায়া। কিন্তু দুনিয়াতে নবীগণের ক্রমধারার অবশান ঘটায় তাদের ছায়া লাভ করা আর সম্ভব নয়। তাহলে এই উম্মতের 'রাহ্বরী'র দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে কে ? আল্লাহ্ পাক বলেন— هو اجتباكم 'এই মহান দায়িত্বের জন্য রাব্বুল আলামীন আখেরী উম্মতকে নির্বাচন করেছেন।' هو سمكم المسلمين 'আর তাদের নাম রেখেছেন মুসলমান।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

اسماء من اسماء الله سمى بها امتى

'আল্লাহ্ পাক তাঁর এক নামানুসারে আমার উম্মতের নাম রেখেছেন।'

তিনি নিজের নাম রেখেছেন 'আস্সালাম', আর আমার উম্মতের নাম রেখেছেন 'মুসলমান'। আমার উম্মতের পূর্বে আর কোন উম্মতের নামই 'মুসলমান' ছিল না। ইহুদ-নাসারা প্রভৃতি বহু উম্মতই দুনিয়াতে এসেছিল। কিন্তু মুসলমান নামের উম্মত এই প্রথম। আল্লাহ্ পাকের আরো একটি নাম হলো— 'মু'মিন'। তিনি এই উম্মতকে 'মু'মিন' নামেও আখ্যায়িত করেছেন। রাব্বুল আলামীন আমাকে সমস্ত নবীর উপর মর্যাদা দান করেছেন। আমি জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁদের কেউই প্রবেশের অনুমতি পাবেন না। তদ্রূপ আর সকল উম্মতের উপর আল্লাহ্ পাক আমার উম্মতকেও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তাদেরকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করেছেন যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে অন্য কোন উম্মতের পক্ষেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। কাল কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের এই ঈর্ষনীয় মর্যাদা দেখে তারা অবাক হয়ে বলবে, 'আয় আল্লাহ্! এরা দুনিয়া থেকে এসেছে সকলের পর, অথচ জান্নাতে যাচ্ছে সকলের আগে, এটা কেমন হলো!' জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন—

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

এটা মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি তা দান করেন।

আল্লাহ্র কসম! এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলমানের সামান্য ঈমানের সামনে সাত আসমান-যমীনের দৌলত কোনই মূল্য রাখে না। আমার পায়ে জুতা নেই, পরনে পোশাক নেই, খাবারের রুটি নেই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে লাঞ্ছনা কুড়িয়ে বেড়াই। কিন্তু, আমি মুসলমান। অতএব জেনে রাখুন, এত শূন্যতার

পরও আমার নিকট আসমান ও যমীনের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ঈমানের পাশাপাশি ঈমানের মেহনতও দান করেছেন। এ মেহনত এক সময় হযরত আম্বিয়া (আ.)-গণের দায়িত্ব ছিল। তাঁরা মানুষের কাছে ঐশী বাণী পৌঁছে দিতেন আর বলতেন, তোমাদের উপর রয়েছে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীনের একচ্ছত্র আধিপত্য। আর তোমাদের সামনে রয়েছে অপরিহার্য মৃত্যু ও হিসাব-কিতাব। অতঃপর কর্মফলরূপে জান্নাত ও জাহান্নামের সুখ বা দুঃখ। কাজেই সেই দুঃখ থেকে বাঁচা এবং সুখ লাভ করার জন্য তোমরা আল্লাহ্র পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলো। হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামগণের সিল্সিলা যতদিন এই পৃথিবীতে অব্যাহত ছিল, দাওয়াতের এই মহান দায়িত্ব তাঁরাই আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে যখন নবুওয়াতের ধারার চির সমাপ্তি হলো, তখন থেকে নববী দায়িত্ব এই উম্মতের কাঁধে অর্পিত হয়। এখন থেকে তারাই গোটা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবে।

বিভিন্ন কোম্পানীর প্রচারকর্মীরা যেমন কোম্পানীর পণ্যসামগ্রীর প্রচার কার্যে নিয়োজিত থাকে। আর কোম্পানী তার প্রচারকর্মীদেরকে মাসোহারা দেয় ; কাউকে বা ফ্লাট দেয়, ব্যবহারের জন্য গাড়ী দেয়। তদ্রূপ আমরাও আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের প্রচারকর্মী বা প্রতিনিধি। মানব-সমাজে তাঁদের পরিচয় তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব। বড়-ছোট, যুবক-বৃদ্ধ, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র যে-ই হই না কেন, এবং পৃথিবীর যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, এ দায়িত্ব সকলের। এ দায়িত্ব যথার্থরূপে আঞ্জাম দেয়ার শর্তে আমাদের জন্যও রয়েছে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অকল্পনীয় প্রতিদানের ব্যবস্থা।

আল্লাহ্র প্রতিনিধি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'উম্মতী' হওয়ার সুবাদে আমাদেরকে এক মহান কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা এখন আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের প্রতিনিধি। কোন রাষ্ট্রের দূত বা প্রতিনিধির সঙ্গে সে রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্য থাকে পরিপূর্ণ মাত্রায়। যেহেতু আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি, তাই আমাদের সঙ্গেও রয়েছে পরিপূর্ণ ঐশী শক্তি এবং আল্লাহ্ পাকের পূর্ণ মদদ। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো—প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করা এবং আমাদেরকে যে কাজের প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে, সে কাজ আঞ্জাম দেয়া।

বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো—মানুষের সুখ-শান্তি ও সাফল্য-ব্যর্থতার বিশ্বাস এখন বস্তু নির্ভর হয়ে পড়েছে। মানুষ মনে করে—'যার উপার্জন যত বেশী, যার সম্পদের পরিমাণ যত অধিক, তার পক্ষে প্রাত্যহিক প্রয়োজন এবং জীবনের চাহিদাগুলো পূরণ করা ততই সহজসাধ্য হয়। আর সহজে জীবনের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারাই তো সুখ।' এখন মানব সমাজের বিশ্বাসের এই অধঃপতিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে একথা বুঝানো যে, এই গোটা সৃষ্টিজগতের উপর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকের। আসমান, যমীন এবং যমীনের অতল গভীর জগতে তাঁরই একচ্ছত্র রাজত্ব। لله ما في السموت والارض এই আসমান ও যমীনের সবকিছু মহান রাব্বুল আলামীনের। কাজেই গোটা মানব জাতিকে আমাদের একথা বুঝাতে হবে যে, আল্লাহ্ পাকের বিধান মেনে চলার মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী নিহিত রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো—মানুষ থেকে দ্বীনের খেদমত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের নেযামও যথেষ্ট আজিব ও গরীব। আল্লাহ্ পাক তাঁর দ্বীনের কাজ মালদারদের তুলনায় দরিদ্র লোকদের থেকেই অধিক গ্রহণ করে থাকেন। কারণ, অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততায় দ্বীনের কাজে সময় দেয়ার সুযোগ মালদারদের কমই ঘটে থাকে। আল্লাহ্ পাক বলেন—দুনিয়া যার কাছে যত কম থাকবে, সে ব্যক্তি ততই সহজভাবে আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারবে।

আকরাব ইবনে হারেস এবং ওয়াইনা ইবনে হাসান খাজারী একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা আপনার কথা শোনবো। কিন্তু এই গরীব ও হতদরিদ্র লোকগুলোকে এখান থেকে উঠিয়ে দিন। সেখানে হযরত বিলাল (রাযি.), হযরত সোহাইব (রাযি.), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) উপস্থিত ছিলেন। আগত দুই সর্দার বললো, এরা দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোক। এদের সঙ্গে একই আসনে বসা আমাদের জন্য অসম্মানজনক। এদেরকে উঠিয়ে দিন। তাহলেই আমরা আপনার কথা শোনবো। তখন এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার গোলাম। আপনি আমাদেরকে বসতে দিন বা উঠিয়ে দিন, সর্বাবস্থায় আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। তো হতে পারে আমরা ওঠে গেলে এই লোকগুলো বসবে এবং আপনার কথা শোনে ঈমান আনবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ফলে সাহাবাগণ ওঠে গেলে সরদারদ্বয়

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি আপনার বক্তব্য আমাদেরকে লিখিত আকারে প্রদান করুন। তাদের এ আবেদনও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু লেখক এসে উপস্থিত হবার আগেই আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে হযরত জিব্রায়ীল (আ.)-এর মারফত বলে পাঠালেন—

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ۞

'আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। *—সূরা আন'আম - ৫২*

কাজেই, আপনার মজলিশে উপস্থিত আল্লাহ্ পাকের একনিষ্ঠ বান্দাদের কারণে সেখানে উপস্থিত হতে কারো সম্মান যদি আহত হয় হোক, তবুও সে বিবেচনা করে আপনি তাদেরকে আপনার মজলিশ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক সময় উমাইয়া ইবনে খলফের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। উমাইয়া ইবনে খালফ বেশ মনোযোগের সঙ্গেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনছিল। এমন সময় সেখানে অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন একজন নেহায়েত দরিদ্র লোক। এসে তিনি বললেন—

علمنى ما علمك الله

'আয় আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্ পাক আপনাকে যা শিখিয়েছেন আমাকে তা শিখিয়ে দিন।'

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু তখন সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাই এ মুহূর্তে তার আগমনে তিনি কিঞ্চিত বিরক্তি বোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসমান হতে

হযরত জিবরায়ীল (আ.) ওহী নিয়ে নেমে আসলেন—

عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يزكى * أو يذكر فتنفعه الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك ألا يزكى * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهى * كلا إنها تذكرة * فمن شاء ذكره * في صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة * كرام بررة *

'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করলো। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো। এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী। অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে। এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, লিপিকারের হস্তে, যারা মহৎ, পূত চরিত্র।' —*সূরা আবাসা - ১-১৬*

যে লোকটির হৃদয়ে আপনার প্রতিও সম্মান নেই এবং আমার প্রতিও যে আযমত পোষণ করে না, তার প্রতি মনোযোগী হয়ে আপনি সেই অন্ধ ও দরিদ্র লোকটির প্রতি অবজ্ঞা করলেন, যার হৃদয়ে দ্বীনের প্রতি দরদ রয়েছে এবং যে ব্যক্তি হিদায়তপ্রার্থী। এটা ঠিক নয়।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! মুসলমানগণ যদি দ্বীন যিন্দা করার কাজে শরীক হওয়ার সঙ্কল্প করে, তাহলে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তাদের থেকে কাজ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে কারো দরিদ্রতা বা ধনসম্পদ বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না।

'তাবলীগ' মুসলমানদের জন্য এক অপরিহার্য দায়িত্ব

আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হলো—মুসলমান হবার সুবাদে রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এক মহান কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। যে প্রক্রিয়ায়ই হোক আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে এদেশে এনে উপস্থিত করেছেন। এখন এদেশে দ্বীন যিন্দার মেহনত করা আপনাদের যিম্মাদারী। যারাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী হিসাবে স্বীকার করবে, তারাই এই দায়িত্ব লাভ

করবে। এই দায়িত্ব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হজ্জাতুল বিদায়' আমাদেরকে দান করে গিয়েছেন—

الا فليبلغ الشاهد الغائب

'আমার পয়গাম অনাগত লোকদের কাছে পৌছে দেয়া তোমাদের উপস্থিত লোকদের দায়িত্ব।' তাদেরকে বলবে—আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন রব নেই যাকে ভয় করা যায় বা যার নিকট কিছু পাবার আশা করা যায়। বা এমন কেউ নেই যার সুপারিশ নিয়ে বা যাকে ঘুষ দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যায়। আল্লাহ্ পাকের এমন কোন ওয়ারিসও নেই, যে সে এই বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এই মহা কর্মজজ্ঞ একমাত্র আল্লাহ্ পাকই আঞ্জাম দেন।

আল্লাহ্ পাকের এই বড়ত্ব ও মহত্বের বাণী গোটা দুনিয়ায় পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই এই দায়িত্ব ও কর্তব্য-কর্মের প্রতি আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

'সফীর' বা প্রতিনিধির দায়িত্ব

মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হলো গোটা জগদ্বাসীকে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের কাঁধেই রয়েছে এ দায়িত্বের গুরুভার। এই নিখিল বিশ্বের পরিচালক এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রব একমাত্র আল্লাহ্ পাক। প্রতিটি মানুষের কাছে এ বাণী পৌছে দেয়াই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানব্রত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো একথা বলতেন না যে, তোমরা সকলে এসে আমার কাছে সমবেত হও। বরং তিনি নিজে গিয়ে মানুষের দুয়ারে উপস্থিত হতেন। 'আবু জেহেল শোনবে না। না শুনুক। আবু লাহাব শোনবে না। না শোনলো। কিন্তু আমাকে তো তাদের কাছে এ আওয়াজ পৌছে দেয়ার চেষ্টা করতেই হবে।' তারা পাথর মারতো আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ঐশী বাণী শোনাতেন। তারা গালি দিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের কাজ করে যেতেন।

দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বনী হানিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘটনাক্রমে গোত্রপ্রধান তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। লোকজন তাঁকে বললো, 'আপনি সরদারের খীমায় অপেক্ষা করুন। উনি ফিরে আসলে তার সঙ্গেই আলাপ করবেন।' ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্দারের ইন্তেজার করতে থাকলেন। এক সময় লোকটি এসে উপস্থিত হলো। খীমায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে লোকজন বললো, 'এ সেই কোরায়শী যুবক যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে।' এই কথা শোনে লোকটি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়ে বললো, 'বের হয়ে যা এখান থেকে। আর কখনো যেন তোকে আমার খীমায় না দেখি। না হলে তোর গর্দান উড়িয়ে দিবো। লোকটির এরূপ আচরণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথেষ্ট মর্মাহত হলেন। তারপর নিজের উষ্ট্রীর পিঠে গিয়ে ওঠে বসলেন। তখন লোকটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর পশ্চাদদেশে বর্শা দিয়ে আঘাত করলে সেটি লাফিয়ে ওঠলো। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচে পড়ে গেলেন। এত কিছুর পরও কোমল ভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এটাই আমার কাজ।

কাজেই আমার ভাই ও বন্ধুগণ! হয়তো পার্থিব একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এদেশে আপনাদের আগমন ঘটেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো—মানুষের কাছে মহান রাব্বুল আলামীনের পরিচয় তুলে ধরা এবং তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। সে দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীতে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার আবশ্যিক কর্তব্য-কর্মগুলোও চলতে থাকবে। কাজেই আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আজ থেকে আপনাদের নিয়ত পরিবর্তন করুন। দেশ ছেড়ে এই দূরদেশ আসার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন নয়, বরং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারকেই নির্ধারণ করুন। আল্লাহ্ কসম! এতে মহান রাব্বুল আলামীনের দয়া ও রহমতের নজর আপনাদের উপর পতিত হবে। তিনি আপনাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকাবেন। আমাদের দারিদ্রতা যতই গভীর হোক না কেন, রাব্বুল আলামীনের নিকট আমরা অনেক সম্মানিত। আল্লাহ্ পাকের নিকট তাঁর বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় হলেন হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম। কারণ, তাঁরা লোকজনকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিচিত করে তোলার মেহনত করতেন। আজও যারা এ মেহনতে আত্মনিয়োগ করবে, তারাও রাব্বুল আলামীনের নিকট হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামগণের ন্যায় 'প্রিয়পাত্র' হিসাবে বিবেচিত হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের নিকট শয়ন করার জন্য সামান্য বিছানার ব্যবস্থা ছিল না। অথচ আল্লাহ্‌র দুশমন ফেরআউন সোনার খাট-পালঙ্কে আরাম করতো। কিন্তু এতে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্মানের কোনই ক্ষতি হয় নি।

কাজেই সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন এবং সেই পবিত্র আদর্শকে নিজেদের জীবনেও গ্রহণ করুন। বিশ্বাস করুন, এই যমীন ও আসমানের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকের হাতে। মানুষের সম্মান-অসম্মান বিত্ত বা দারিদ্রতা দিয়ে হয় না, এটা একান্তই আল্লাহ্ পাকের দান। যার বিশ্বাস অর্থ-নির্ভর, যে ব্যক্তি মনে করে যে, বিত্ত দিয়েই সবকিছু হয়—তার সমস্ত কাজই অসম্পূর্ণ ও অপরিণত থাকে। আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, ক্ষমতাই সম্মান দান করে, তাকে সর্বদা অসম্মানই ঘীরে রাখে। যে ব্যক্তি নিজেকে বড় আলীম বলে বড়াই করে, ভ্রষ্টতাই তার নিয়তি। আর যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর আশ্বস্ত থাকে, তার বুদ্ধি সবসময় তার সঙ্গে প্রতারণাই করে থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার না অর্থ-সম্পদের অভাব হয়, না তার জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা দেয়, না সে অপদস্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

নবীজী (সা.)-এর জীবন-আদর্শ

গোটা মানব সমাজের কাছে আমাদেরকে এ বাণী পৌছে দিতে হবে যে, পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা প্রবাহের উৎস একমাত্র আল্লাহ্ পাক, এবং যে সকল বস্তুর সমন্বয়ে ঘটনার সৃষ্টি হয়, তাও সর্বোতভাবে আল্লাহ্ পাকেরই নিয়ন্ত্রণে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও ভালবাসা, দ্বেষ-ক্ষোভ এবং হিংসা ও বিভেদ মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই হয়। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়াতে কিছুই ঘটতে পারে না। তিনি যেমন চাইবেন তেমনই হবে। আর যা চাইবেন না তা কোনভাবেই হবে না।—আমরা যদি রাব্বুল আলামীনের এ পরিচয় প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করি, তাহলে তাঁর গায়েবী খাজানা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য খুলে যাবে, এবং জীবনের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ আমাদের অনুকুলে ঘটতে থাকবে। সর্বোপরি তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর ব্যবস্থা করে দিবেন। আমাদের জীবনের সুখ ও সাফল্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আদর্শের অনুসরণ।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি সুন্নত আসমান-যমীন তথা আল্লাহ্ পাকের গোটা সৃষ্টিজগত থেকেও যে অধিক মূল্যবান, এই সত্যটি মানুষকে বোঝাতে হবে। পাঁচটি পদার্থের সমন্বয়ে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তা থেকে কোন একটি পদার্থ বাদ দিলে সে ঔষধের কার্যকারিতা যেমন হ্রাস পায়, কোন মেশিনের দু'একটি অংশ খুলে ফেললে তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সুন্নত ছেড়ে দিলেও তার গভীর প্রভাব মানব জীবনে পতিত হবেই।

শানে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এতই ভালবাসেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নামটি অক্ষয় ও অমর করে রাখার জন্য নিজের নামের সঙ্গে এমন গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন যে, তা আর কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। যে নবী আল্লাহ্ পাকের নিকট এমন প্রিয়, তাঁর সুন্নত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিকট সমধিক মর্যাদার অধিকারী হবে, সন্দেহ কী। কাজেই দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সাফল্য লাভ করার জন্য তাঁর জীবন-আদর্শ অনুসরণের যে কোন বিকল্প নেই, এ সত্য আমাদের নিজেদেরকে যেমন উপলব্ধি করতে হবে, তেমনি আর সকলের নিকটও এ সত্য প্রচার করে যেতে হবে নিরন্তর। পাশাপাশি নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজনকে নামাজের মাধ্যমে সমাধানের তরীকা অবলম্বন করতে হবে। সমস্ত আমলের মধ্যে নামাজই হলো শ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহ্ পাকের খাজানা থেকে যাবতীয় হাজত পূরণ করার অন্যতম হাতিয়াররূপেই আমাদেরকে নামায দান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণকেও নামাজ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল মাত্র দুই ওয়াক্ত—ফজর ও আসর। আর এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ পাকের স্নেহ এতই গভীর যে, তাদেরকে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায দান করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন—এই উম্মত সারাক্ষণ তাঁর দরবারে সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকুক এবং তাদের গোটা জীবন মসজিদে মসজিদেই কেটে যাক। পিতা-মাতা যেমন তাদের আদরের সন্তানকে চোখের আড়াল করতে চান না, তেমনি আল্লাহ্ পাকও তাঁর হাবীবের প্রিয় উম্মতদেরকে সর্বক্ষণ নামায ও সিজদায় লিপ্ত রেখে স্নেহ-অনুগ্রহে শিক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু মানুষকে যে পানাহার করতে হয়, তার যে মানবিক আরো বহুবিধ প্রয়োজন রয়েছে—এই কারণে তাদেরকে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায দান করা হয়েছে। যদিও চূড়ান্তরূপে পাঁচ ওয়াক্ত নামায দান করাই আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই উম্মতের প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশের জন্যই ঘটনার এই দীর্ঘ উপস্থাপনা—হযরত মূসা আলাইহিস্সালামকে মাধ্যম বানিয়ে নামাযের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পাঁচে নামিয়ে এনেছেন। তারপর চূড়ান্ত রূপে সেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়ারূপে পেশ করেছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায প্রদানের ঘটনাটিও ছিল বেশ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ্ পাক এই মর্তের নবীকে আসমানে তুলে নিয়ে গিয়ে

তাঁকে হাদিয়ারূপে নামায পেশ করেছেন। একদিন মক্কায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরায়ীল (আ.) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জন্য আসমান সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র আরশে আপনার জন্য ইন্তেজার করা হচ্ছে। তারপর তাঁকে নিয়ে বাইতুল্লাহ্ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হলেন, এবং সেখান থেকে গেলেন অপ্রাকৃত উর্ধ্ব জগতে।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এই নামাজের মর্যাদা আল্লাহ্ পাকের নিকট এমনই সুমহান যে, আল্লাহ্ পাক স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের আরশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে তা হাদিয়ারূপে পেশ করেছেন। এই নামাযের জন্য মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয়, সেই আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত পৌছায়, ততদূর পর্যন্ত এলাকার পাথর-মাটি, তরুলতা, বৃক্ষশাখা, এমনকি গাছের পাতা পর্যন্ত কাল কেয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। যমীনের যেই অংশে নামাযী সিজদার জন্য কপাল স্থাপন করে, গভীর পাতাল পর্যন্ত যমীনের সে অংশটি পবিত্র হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মানুষ যখন সিজদা করার জন্য যমীনে মাথা স্থাপন করে, তখন তার কপাল যেন আল্লাহ্ পাকের কুদরতী পায়ের উপর পতিত হয়। 'আল্লাহু আক্বার' বলে নামাযী যখন তাকবীর বাঁধে তখন গোটা আসমান-যমীন নূরে নুরান্বিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাকের আরশের সামনে থেকে পর্দাগুলো সরে যায়। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর জান্নাতের খিড়কি পথে রূপবতী রমণীরা তার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে। নামাযীর 'কিয়াম' যত দীর্ঘ হবে, তার মৃত্যু কষ্ট ততই আসান হবে। দীর্ঘ নামায মৃত্যুকষ্ট দূর করে দেয়। নামাযী যখন রুকূতে অবনত হয়, তখন তাকে তার দেহের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকা করার সওয়াব দান করা হয়। রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর আল্লাহ্ পাক তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অতঃপর যখন সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন। যখন সে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে, তখন তাকে পরম ধৈর্য্যশীলের সওয়াব দান করা হয়। যখন সে দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দশবার দরূদ প্রেরণ করেন। তারপর যখন সে সালাম ফিরায় তখন সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর মতই নিঃস্পাপ ও নির্মল হয়ে যায়।

কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য—জীবনের পঞ্চাশটি বছর অতিক্রম করে এসে আজ পিছনের দিকে তাকিয়ে কোন একটি সিজদাও কি এমন পাওয়া যাবে, যা ছিল ধ্যানমগ্নতায় উজ্জ্বল! সুতরাং, ভেবে দেখুন আমরা কেমন নামাযী! তারপরও

আমাদের মনে কোন দুঃখবোধ নেই। সেই ত্রুটির জন্য কোন আক্ষেপ নেই। পার্থিব কোন বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হলে সে জন্য তো পেরেশানীর অন্ত থাকে না। দু'আ-দরূদেরও শেষ থাকে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে, এখনো যে নামাযে একাগ্রতা এলো না, আল্লাহ্‌র প্রতি অভিনিবেশ সৃষ্টি হলো না, সে জন্য কোন অস্থিরতাও নেই, দু'আও নেই। অথচ কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে নামায ঠিক করে দেবার জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট মিনতি জানানো উচিত ছিল। যে নামাযে আল্লাহ্‌র ধ্যান থাকে না, সে নামাযকে তো নামাযই বলা যায় না।

হযরত আবু রায়হানা (রহ.)-এর নামায সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রাতে তার স্ত্রী স্বামীর আগমনের অপেক্ষা করতেন। ওদিকে তিনি নামাযের নিয়ত করে এমনই বিভোর হয়ে পড়তেন যে, এক নামাযেই ফজরের আজান হয়ে যেত। তো এই ছিল আকাবিরীনদের নামায। এমন নামায অর্জন করার জন্যই আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর সেই নামাযে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কালামের তেলাওয়াতে বিভোর হতে হবে। এই কোরআন আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম। জান্নাতে সকল জান্নাতবাসীকে এই কালামই শোনাতে হবে। জান্নাতে একটি বিশাল ময়দানে আল্লাহ্ পাক সকলকে একত্রিত করে সুদৃশ্য আসনে উপবেশন করাবেন। তারপর শাহী দরবারের উপযোগী লেবাসে তাদেরকে সজ্জিত করিয়ে পানাহারের আয়োজন করবেন। তারপর আল্লাহ্ পাক জান্নাতের হুরদেরকে বলবেন, আমার এই মেহমানদেরকে তোমাদের সুরের মুর্ছনা দিয়ে মুগ্ধ করে দাও। ফলে তারা এমন সঙ্গীত পরিবেশন করবে যে, সে সুরের মুর্ছনায় সকলে মাতোয়ারা হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাকের দীদার

অবশেষে আল্লাহ্ পাক কুদরতী পর্দার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। সকলে অপলক চোখে রাব্বুল আলামীনের সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে পড়বে। সে সময়টি যে কত মধুর ও উপভোগ্য হবে তা বলে বুঝানো যায় না।

হযরত আইয়ুব (আ.) ক্রমাগত ১৮ বছর পর্যন্ত এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন যে, সে সময় তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট ও যাতনা ভোগ করেছেন। এই দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এক সময় আল্লাহ্ পাক তাঁকে সুস্থতা দান করেন। আবার তাঁর দেহে ফিরে আসে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য। সুস্থতা লাভের পর এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার কি সেই অসুস্থতার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে? তিনি বললেন, আহা! সেই দিনগুলোই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ

সুখের দিন। অসুস্থতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে আইউব! কেমন আছো! আল্লাহ্ পাকের সেই প্রশ্ন শোনে আমার গোটা হৃদয় এমন আনন্দবন্যায় ভেসে যেত যা আর অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়।

আর জান্নাতে সেদিন আল্লাহ্ পাক সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করে এক এক করে ডেকে ডেকে তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, কেমন আছো ? কি অবস্থা তোমাদের ? মানুষ যখন সরাসরি তাদের রবকে দেখতে পাবে এবং মুখোমুখী কথায় লিপ্ত হবে, সেই সুখের অনুভূতি বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যই এমন ছিল যে, তাকে দেখে মিশরের নারীরা আত্মবিস্মৃত হয়ে ফল কাটার ছুড়ি দিয়ে একেবারে নিজেদের হাতই কেটে ফেলেছিলো। সেই ইউসুফ (আ.)-কে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যিনি সৌন্দর্য দান করেছেন, সেই মহান স্রষ্টার সৌন্দর্য কেমন হতে পারে! রবের সেই অপার রূপে মুগ্ধ বান্দারা যখন আত্মহারা অবস্থায় থাকবে, তখন, সমস্ত সুরের আধার স্বয়ং রাব্বুল আলামীন জান্নাতবাসীদেরকে তাঁর কালাম তেলাওয়াত করে শোনাবেন।

তো আমাদের কাছে আল্লাহ্ পাক সেই কোরআনই অবতীর্ণ করেছেন। এই কোরআন প্রতিটি মুসলমানকেই শিখতে হবে এবং তেলাওয়াতের জন্য প্রতিদিনের ছকবাঁধা সময় থেকে কিছু সময় ফারেগ করতে হবে। কারণ, কাল কেয়ামতের দিন এই কোরআন আপনার-আমার পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দিবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোরআনকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দান করবে, কাল কেয়ামতের দিন কোরআন কেবল তাকেই টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কোরআনের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকবে, কেয়ামতের দিন এই কোরআন তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দিবে।

দুনিয়াতে আমাদের আরো একটি দায়িত্ব হলো—নববী আখলাক অর্জন করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

আমি মানব স্বভাবকে চূড়ান্তরূপে মাধুর্যমণ্ডিত করতে এসেছি।

তো নববী আখলাক কী ছিল?

صل من قطعك تعطى من حرمك واعف عمن ظلمك

واحسن من اساء اليك -

যে ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করো, যে অবিচার করে তাকে ক্ষমা করো, আর যে অসদাচরণ করে, তাকে সদাচরণ উপহার দাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এই আখলাক অর্জন করবে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম।

কেউ সুগন্ধি ব্যবহার করলে তা বুঝার জন্য যেমন বলার অপেক্ষা রাখে না, গন্ধ আপনি আশপাশ আমোদিত করে তোলে। সদাচরণও ঠিক তেমনি তার আলো দিয়ে চারপাশের অন্ধকারকে দূর করবেই। আমাদের স্বভাবে যখন নববী আখলাকের আলো পড়বে, তখন তার প্রভাবে আপনিই চারিদিকে ঈমান ও ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকবে। কাজেই আমাদেরকে নববী আখলাক অর্জন করতেই হবে। এই আখলাকের এমনই শক্তি যে, বড় থেকে বড় ব্যক্তিদেরকেও নতজানু করে দেয়। বড় বড় শক্তিকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এবং প্রবল-প্রচণ্ড কুফরী শক্তিও তার সামনে নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে যায়।

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ!

আমাদের কাজ হলো—মানব সমাজে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় তুলে ধরা। যথাযথভাবে নামায কায়েম করা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে কোরআনী যিন্দেগীর প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং সে জীবনে অভ্যস্ত করে তোলা। কোরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্ পাকের যিকির করা। নববী আখলাক অর্জন করা এবং তার প্রতি সকলকে দাওয়াত দেয়া। আর সমস্ত কাজ মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা। সর্বোপরি নিজেদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব মনে করে সেই নেয়াবত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মানব সমাজে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছে দেয়ার নিয়ত করে নিজেদের জান ও মালের কুরবানী দেয়া। জেনে রাখুন, এই কুরবানীর নিয়তের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের গায়েবী নেজাম আমাদের অনুকূলে এসে যাবে। আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত আল্লাহ্ পাক ঠিক করে দিবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি সর্বাগ্রে জান্নাতে যাবে ? জবাবে হযরত সাহাবায়ে কেরাম অতীব বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

الفقراء المهاجرين- দরিদ্র মোহাজিরগণ, যারা আমার দ্বীনের জন্য হিজরত করে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছে। আর তাদের সমস্ত স্বাদ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়েই সুপ্ত থেকেছে, বাস্তবতার আলো দেখতে পায় নি। সেই অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কাল কেয়ামতের দিন মহান রাব্বুল আলামীন ফিরিশতাদেরকে ডেকে বলবেন, যাও, গিয়ে তাদেরকে সালাম করো। ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করবেন, আয় আল্লাহ্! যাদেরকে সালাম করতে বলছেন, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিরা কারা ? জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন, তারা ঐ সকল লোক, যারা আমার দ্বীনের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছে এবং চরম কষ্ট স্বীকার করেও আমার দ্বীনের উপর অটল থেকেছে। তখন ফিরিশতারা এসে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন—

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

'তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার।'—*সূরা রা'দ-২৪*

ফিরিশতাগণ বলবেন, আমরা আপনাদেরকে সালাম করতে এসেছি। রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। দ্বীনের জন্য মেহনতকারীদেরকে আল্লাহ্ পাক এমন মর্যাদা দান করেন যে, ঘরে বসে ইবাদতকারীরা তা লাভ করা তো দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারে না।

জান্নাতে একদিন হঠাৎ আলোর ফোয়ারা ছুটবে। সেই আলোর ঝলকানিতে গোটা জান্নাত আলোকিত হয়ে যাবে। সকলে অবাক হয়ে বলাবলি করবে, এটা কিসের আলো ? বলা হবে, এটা জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসীদের চেহারার আলো। অন্য জান্নাতীরা অবাক হয়ে আরজ করবে, আয় আল্লাহ্! তারা এমন মর্যাদা কীভাবে লাভ করলো ? আল্লাহ্ পাক বলবেন, তারা যখন আমার দ্বীন প্রচারের জন্য বাড়ীঘর ছেড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তো, তোমরা তখন ঘরে বসে আরাম করতে। কাজেই তোমাদের উভয়ের মর্যাদা এক হয় কী করে ?

এক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে সশরীরে অংশ না নিয়ে শুধু অর্থ-সম্পদ ব্যয় করি, তাহলে কি আল্লাহ্র রাস্তায় মেহনত করার সওয়াব লাভ করবো?' জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কত টাকা আছে?'

সাহাবী বললেন, 'ছয় হাজার'।

জবাব শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যদি তোমার সমুদয় অর্থ-সম্পদও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে দাও, তবুও সশরীরে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মেহনতকারী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় যে সওয়াব ও পুণ্য লাভ করে, সে পরিমাণ পুণ্যও তুমি লাভ করতে পারবে না।

আল্লাহ্ পাক গোটা জান্নাতকে শুধু 'কুন' বা 'হয়ে যাও' এই নির্দেশের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জান্নাতুল ফিরদাউস সৃষ্টি করেছেন নিজ হাতে। সৃষ্টির পর সিল করে দিয়ে তা সকলের জন্য দেখা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সেই থেকে প্রতিদিন পাঁচবার জান্নাতুল ফিরদাউসের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—'আমার বন্ধুদের জন্য আরো অধিক সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং আরো বেশী পবিত্র হতে থাক।' অন্যদিকে জান্নাত বলতে থাকে—'আয় আল্লাহ্! গাছে গাছে ফল পেকে আছে, নদীর ধারা দু'কুল ছাপিয়ে উপচে পড়েছে। আয় আল্লাহ্! আমার বাসিন্দারা কবে এসে আমাকে আবাদ করবে? আমার কাছে তাদের আগমনকে তরান্বিত করুন।'

দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য আমাদের করণীয়

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! এই জান্নাত, এই নাজ-নেয়ামত, সুখ-শান্তির এই বিপুল আয়োজন, একমাত্র মেহনতের মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। আর সুখের বিষয় এই যে, রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সেই মেহনতের তরীকা বলে দিয়েছেন।

আমাদের এলাকায় এক গরীব লোকের সন্তান ডাক্তার হওয়ার পর সমাজে তারা যথেষ্ট সম্মানিত হয়ে ওঠে এবং আশেপাশে তাদের প্রসিদ্ধিও ছড়িয়ে পরে। মেহনতের ফলে সে পরিবারটি হীন অবস্থা থেকে যেভাবে সমাজে সম্মানের অধিকারী হয়েছে, তেমনি আল্লাহ্ পাকও আমাদেরকে এক মেহনত দান করে বলেছেন, এই মেহনতের মাধ্যমে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান, অনন্ত সুখের জান্নাত এবং আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারো। আর সব প্রাপ্তির বড় প্রাপ্তি হলো আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি। একমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিই সমস্ত সাফল্যকে হাতের মুঠোয় এনে দিতে পারে।

কাজেই দুনিয়াতে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, নিজে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং গোটা দুনিয়ার মানুষকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করার মেহনতে ঝাঁপিয়ে পড়া। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সঙ্গে নিজেও পরিচিত হওয়া এবং অন্যদেরকেও পরিচিত করে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে

গোটা মানব সমাজে ইলম ও যিকিরের পরিবেশ তৈরী করা। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মানুষ যেহেতু আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি, তাই মানুষের দুর্বল চিত্ত যে শুধু জান্নাত নিয়ে সন্তুষ্ট নয়—এ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত আছেন। তাই মানুষকে তার কর্মের প্রতিদানরূপে শুধু জান্নাত নয়, বরং দুনিয়ার কামিয়াবী দানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো—এর জন্য নিজে দ্বীনের উপর চলা শিখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও চলা শিখাতে হবে।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! একাজ শিখার জন্য জীবনের কিছু সময় ফারেগ করে বেরিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ্ পাক সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন! - واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

—▣—

জীবন ও মৃত্যু

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين الصطفى , اللهم صلى على محمد و على ال محمد كما تحب و ترضى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . و لاتزر وازة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا , فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم يا ابا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة و محصنكم النار او كما قال صلى الله عليه وسلم .

আমার ভাই ও বন্ধুগণ!

দুনিয়াতে মানুষ যেমন নিজের ইচ্ছায় আসতে পারে নি, তেমনি যেতেও পারবে না নিজের ইচ্ছায়। মানুষ একান্ত আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের মৃত্যুও হবে একান্ত আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাতেই। একটা সময় ছিল যখন মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর এক সময় আল্লাহ্ পাক হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং মানব-ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন আয়োজন করলেন। যমীন থেকে খাদ্যবস্তু উৎপন্ন করলেন। সেই খাদ্যদ্রব্যের নির্যাস থেকে মানুষের দেহে বীর্য তৈরী করলেন। সেই বীর্য এক কুদরতী প্রক্রিয়ায় পৌছে দিলেন মাতৃগর্ভে। তারপর সেই নিশিক্ত বীর্য সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে লাভ করে মানব আকৃতি। আল্লাহ্ পাকই সর্বোত্তম স্রষ্টা। তিনি যাকে যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নারী-পুরুষ, কালো-সাদা--এ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছারই প্রতিফলন। এক্ষেত্রে কোন মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সম্পূর্ণ অকার্যকর।

তারপর দুনিয়ায় জন্মলাভের পর কেইবা চায় মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করতে! কিন্তু তারপরও মানুষকে মরতে হয়। আসমানী নির্দেশে জীবনের আলো ছেড়ে মৃত্যুর অন্ধকারে যেতে হয়। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর ডাকে একদিন মানুষকে সাড়া দিতেই হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—

فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئذ تنظرون *

'অতপর যখন কারো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, এবং তোমরা তখন তাকিয়ে থাকো।'—*সূরা ওয়াকিয়াহ্-৮৩-৮৪*

তো মৃত্যুর প্রবল থাবা প্রাণ কেড়ে নিতে একদিন মানুষের উপর ছোবল হানবেই।

রাখে আল্লাহ্ মারে কে?

আমেরিকা তো গোটা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোন্নত দেশ হিসাবে স্বীকৃত। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাদের আঁকাশছোয়া। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এখানে সহজলভ্য। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা এখানে চিকিৎসা-সেবা প্রদান করেন। তারপরও মানুষ এখানে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় না। কোন মুমূর্ষ ব্যক্তিকে মৃত্যুর আগ্রাসী থাবা থেকে রক্ষা করতে বলুন তো তাদেরকে। যত উন্নত প্রযুক্তি তাদের করায়ত্ত থাকুক না কেন, সে মুহূর্তে আমার আপনার মত অসহায় তারাও। মৃত্যু-পথযাত্রীর পাশে শুধু নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না। সেই কঠিন মুহূর্তটি সম্পর্কে রাব্বুল আলামীন বলেন—ونحن اقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون 'মুমূর্ষু রোগীর পাশে তোমাদের চেয়ে আমিই বরং অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।' মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে তোমরা দাবী করতে—'স্বাধীন-সত্ত্বা নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আগমন করেছি, আমরা স্বাধীন ভাবেই থাকতে চাই। কারো অনুসারী বা অনুগামী হয়ে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়'।

এই দাবীতে তোমরা যদি সত্যবাদীই হও, তোমাদের কোন নেগাহ্বান যদি না-ই থাকে, কোন মালিক ও খালিক ছাড়াই যদি তোমরা সৃষ্টি হয়ে থাকো, যেমন তোমরা বলে থাকো—

ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

'আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।'—*সূরা জাছিয়া-২৪*

মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত মানুষই না সমাধিস্ত হয়েছে। মৃত্যু কত শত-কোটি মানুষকেই না মাটির মাঝে বিলীন করে দিয়েছে। কিন্তু কেউ তো ভুলেও ফিরে আসে নি। وما نحن بمبعوثين আসলে মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের প্রশ্নই ওঠে না। এই পৃথিবীতেই জীবনের শুরু এবং এখানেই তার চির অবসান।

যদি তোমাদের কথাই সত্য হয়—জীবনের উন্মেষ ও অবসান যদি শুধু এ পৃথিবীর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তোমাদের ক্ষমতা থাকলে মৃত্যুকে প্রতিহত করো। তোমাদের চোখের সামনে একের পর এক মানুষ চির বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, তার এই প্রয়াণ-পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াও। তাকে আগলে রাখো। কিন্তু মৃত্যুর সর্বগ্রাসী থাবা যখন কারো ঘাড়ে এসে পড়ে, তখন, এটা প্রমাণিত সত্য যে, ঔষধ-দাওয়াই আর ঝাড়-ফুঁকে কোন কাজ হয় না। মৃত্যুকে মানুষ কোনভাবেই প্রতিহত করতে পারে না।

মোটকথা, পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, জীবন-মৃত্যুর খেলা আদিকাল হতেই চলে আসছে, এবং এভাবেই চলতে থাকবে যতদিন এই সৃষ্টি টিকে আছে। পৃথিবীতে যে জন্মলাভ করলো, মৃত্যু একদিন তাকে গ্রাস করবেই। তারপর সেই পরিত্যাক্ত দেহ পঁচে-গলে মাটি হয়ে যাবে এবং একদিন পৃথিবী থেকে তার অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটিও মুছে যাবে। আসলে এই অষাঢ় চিন্তা তারাই পোষণ করে, মহান রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বে যাদের বিশ্বাস নেই। এই হাড়-মাংস যখন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ধুলিকণায় পরিণত হবে, এবং হাওয়ায় ভেসে গিয়ে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়বে, সে মানুষের পূনঃজীবন লাভের ব্যাপারে তাদের ঘোরতর অবিশ্বাস। এমন কে আছে, যে এই ধুলোমাটি একত্রিত করে আবার মানুষ সৃষ্টি করবে! এবং আবার তাতে প্রাণের সঞ্চার করবে!

মানুষের এই অবিশ্বাস ও দ্বিধা নিরসন-কল্পে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—فاذا هى زجرة واحدة ভয়ঙ্কর ও বিকট এক শব্দ হবে فاذا هم بالساهرة তারপরই সকলে দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে ওঠবে। ونفخ فى الصور সিঙ্গা আরো একবার তীব্র শব্দে বেজে ওঠবে। তারপর কবর থেকে তোমরা সকলে খুব দ্রুত বের হয়ে আসবে। সেদিন তোমাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের শক্তি, প্রতিপত্তি নস্যাৎ করে তোমাদের দম্ভ চিরতরে খর্ব করে দেওয়া হবে। প্রথম সৃষ্টির দিন যেমন একা ছিলে, সেদিন তেমনি একাই উপস্থিত হবে। দুনিয়াতে ধনৈশ্বর্যের যে পাহাড় গড়ে তুলেছিলে, সবই পিছনে পড়ে থাকবে, শুধু এই প্রাণটুকু থাকবে তোমার সঙ্গে।

يوم يفر المرأ من اخيه وامه وابيه وصاحبته و بنيه

সেদিন মানুষ স্বীয় ভাই, পিতা-মাতা এবং স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে। —*সূরা আ'বাসা-৩৪-৩৬*

মানুষ নিজের বিপদে তখন এতটাই পেরেশান হয়ে পড়বে যে, পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা স্ত্রী-সন্তান কারো দিকে ফিরে তাকাবার অবসর তো থাকবেই না, বরং তাদের থেকে এই ভেবে পালিয়ে বেড়াবে যে, কেউ আবার না সাহায্যের আবেদন নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

মানব সমাজের একটি বৃহৎ অংশ এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, দুনিয়াতে মানুষের আগমন প্রাকৃতিক নিয়মে হয়েছে। আবার প্রকৃতির টানেই একদিন তার জীবনের বিলয় ঘটবে। মাঝের এই সময়টুকুই তাদের প্রাপ্তি। এই জীবনটুকু যে যত আনন্দ-আয়োজনে উপভোগ্য করে তুলতে পারে, সে-ই তত লাভবান। এই ভ্রষ্ট লোকদের অনুসরণ করে মুসলমানদেরও একটি বৃহৎ অংশ 'মনচাহি জীবন'-এর গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্ পাক স্বীয় আসমানী কিতাবে বান্দাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন—ولاتحسبن الله غافلا ওহে বান্দাগণ! আমাকে গাফেল মনে করো না। আমি তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডই দেখতে পাচ্ছি।

মদ্য পান করো না দুগ্ধ পান করো, আমি দেখতে পাই।

নাচ-গান করো, আমার কাছে তাও গোপন থাকে না।

সিজদা করো, আমি তাও দেখতে পাচ্ছি।

হালাল কামাই করো, তাও আমার অজানা নয়।

হারাম কামাই করো, তাও আমার নিকট লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

তুমি মদ ও মাদক বেঁচে হারাম পয়সার পাহাড় গড়ে তুলছো, না মজদুরী করে হালাল রুটির ব্যবস্থা করছো, সবই আমার জানা আছে। তোমাদের রবের কখনো ঝিমুনি হয় না। তাঁর নিদ্রাও নেই, ক্লান্তিও নেই। তিনি গাফেলও নন। তোমাদের রব কিছু ভুলেও জান না। এই নিখিল বিশ্বের কারো পক্ষেই তোমাদের রবকে অক্ষম করে দেয়া, তাঁর শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ভাল-মন্দ যাই করো না কেন, তা চাই পাহাড়ের গহীন গভীর গুহায় লুকিয়ে করো, চাই পাতালের গভীরে আত্মগোপন করে করো, মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতী দৃষ্টি সেখানেও বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কালামে আরো ইরশাদ হয়েছে—

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ۞

'আপনি কি ভেবে দেখেন নি যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।—*সূরা মুজাদালাহ্-৭*

কাজেই লুকিয়ে থাকবার বা আত্মগোপন করবার কোন স্থান নেই। মহান রাব্বুল আলামীনকে ফাঁকি দেবার কোন কৌশলও নেই।

আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ্

এই আসমান ও যমীন মহান রাব্বুল আলামীনেরই সৃষ্টি। একমাত্র তিনিই এই যমীনকে সমতলরূপে বাস উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। তাতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং মানুষের জন্য সুপেয় পানির প্রস্রবন উৎসারিত করেছেন। কাজেই এই যমীন ও আসমানের যেখানেই যা ঘটুক, কোন ঘটনাই তাঁর অজানা নয়। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। পালিয়ে যাবে? যাও কোথায় যাবার আছে তোমার। দূরন্ত গতিতে, বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায়। কিন্তু যাবে কোথায়? يدركم الموت মৃত্যু তোমাকে দু'হাতের প্রবল থাবায় টেনে এনে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করে দিবে। সেখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে? তুমি যত শক্তিধরই হও না কেন, সম্ভব নয়। ভেবেছো সেখানে উপস্থিত শত-সহস্র কোটি মানুষের ভিরে কোথাও লুকিয়ে থাকবে ? সে কথা চিন্তাও করো না। কারণ, প্রত্যেককে সুনির্দিষ্টরূপে সনাক্ত করে চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হবে। যে চোখে নিদ্রা নেই, তন্দ্রা নেই; যিনি কখনোই কোন বিষয়ে অমনোযোগী নন, তাঁর চোখে ফাঁকি দেবার চিন্তা সময় থাকতে পরিত্যাগ করো। মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তির বহু উর্ধ্বে তিনি। সময়ের পরিবর্তন তাঁর মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

তাঁর জ্ঞানের পরিধি এমনই সর্বব্যাপী যে, গোটা সৃষ্টি জগতে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, বালুকারাশির পরিমাণ কত, গাছের সংখ্যা, গাছে গাছে পাতার সংখ্যা, মেঘমালা হতে বর্ষিত বৃষ্টিবিন্দুর পরিমাণ—সবই আল্লাহ্ পাকের জানা আছে। আল্লাহ্ পাকের কাছে কোন কিছু গোপন করে রাখার মত শক্তি যেমন আকাশের নেই, যমীনও তার কোন খাযানা আল্লাহ্ পাকের নিকট লুকিয়ে রাখতে পারে না। সমুদ্রের গভীর অতলে, যেখানে সূর্যের আলো পৌছতে পারে না, আর সূর্যের প্রখর আলোয় ঝলমল সমুদ্র পৃষ্ঠ, সবকিছুই আল্লাহ পাকের নিকট সমান স্পষ্ট। তাঁর জ্ঞান কোথাও বাঁধাগ্রস্থ হয় না।

মানুষের অবহেলা

সেই মহান যাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। আমরা সেই মহাজ্ঞানী ও সর্বদর্শী রবেরই বান্দা। মৃত্যুর পর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বিষয় যদি আমাদেরকে গাফেল করে রাখে, পার্থিব মোহ যদি রাব্বুল আলামীনের স্মরণ থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে ; তাহলে তা হবে আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যজন। আমাদের নিজেদের হাতেই রচিত হবে আমাদের ধ্বংসের পথ।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

افحسبتم انما خلقنكم عبثا وانكم الينا لاترجعون

আমার বান্দারা! তোমাদের কি ধারণা, আমি তোমাদেরকে অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কাজে সৃষ্টি করেছি। লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রায় তোমরা তোমাদের জীবন কাটিয়ে দিতে পারো? নাচগান, রং-তামাশা আর অর্থ-বিত্তের মোহে ভেসে চলতে পারো? ايحسب الانسان ان يترك سدا তোমাদের কি ধারণা তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? তোমাদের এ জীবন সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না? জেনে রেখো—

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

তোমাদের চক্ষুকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি দেখেছো? কানকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি শোনেছো? এবং অন্তরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে এখানে এসেছো? —*সূরা ইসরা - ৩৬*

তো উপরওয়ালার এই নেযামের রশিতে আমরা সকলেই বাঁধা আছি। এই নেযাম থেকে বন্ধনমুক্ত হবার কোন পথ নেই।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! لا اله الا الله এর উদ্দেশ্যই হলো—আর কখনো আমরা আমাদের মর্জি মত চলবো না। আমাদের সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছাকে রাব্বুল আলামীনের মানশার কাছে সমর্পণ করলাম। ইউরোপ-আমেরিকা, মক্কা-মদীনা—আমি যে দেশেরই বাসিন্দা হই না কেন, আয় আল্লাহ্! আপনি যেভাবে চেয়েছেন, আমি সেভাবেই চলবো। আমার জীবন-তরী এখন থেকে সে স্রোতের অনুকূলেই কুলকুলিয়ে চলবে। আর আপনার অবাধ্যতা নয়, এখন থেকে একান্ত বাধ্য জীবনই আমি যাপন করবো।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আজ একটি মুবারক দিন এবং এক মুবারক মজলিশ, নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ পাক বড়ই দয়ালু। আমাদের অনাচার ও অবাধ্যতা দেখে আল্লাহ্র এই যমীন ও আসমান অধৈর্য্য হয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট এই অবাধ্য মানব জাতিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। আকাশের ফিরিশতারাও বলে 'আয় আল্লাহ্! অনুমতি দিন—আযাবের চাবুক মেরে এই পাপিষ্ঠদের ধ্বংস করে দেই।

আল্লাহ্ গোনাহ্গার বান্দাদের তওবার অপেক্ষা করেন

এই আসমান, যমীন, ফিরিস্তা, কেউই আমাদের সমকক্ষ মর্যদার অধিকারী নয়। সকলকেই আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন আমাদের খিদমতের জন্য। আমাদের অনাচার ও অবাধ্যতা দেখে তারাই রাগে অধৈর্য্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করছি তিনি কি বলেন শুনুন—

دعوا عبدى فانى اعلم بعبدى منكم

আমার বান্দাদেরকে নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। কারণ, তাদের ব্যাপারটি আমিই ভাল জানি। আমি তাদের তওবার অপেক্ষায় আছি। হে যমীন, আসমান ও আমার ফিরিশতারা! এই মানব জাতি কি তোমাদের সৃষ্টি যে, তোমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছো? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে আমার আর আমার বান্দাদের মাঝে তোমরা নাক গলাতে এসো না। তারা কখন আমার নিকট ক্ষমা চেয়ে আকুতি জানাবে—আমি সে অপেক্ষায় আছি। যখনই তারা তওবা করবে, আমাকে বড় দয়ালু পাবে। জীবনের যে পর্বেই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে ফিরে আসুক, আমার দয়া তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে নেবে। আমার চেয়ে বড় দয়ালু আর কে আছে? কাজেই তোমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। ফিরে আসো, তওবা করো। আমি তোমাদের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবো এবং তোমাদের তওবা কবুল করে নিবো।

আমার বান্দারা! তোমাদের পাপ দিয়ে যদি গোটা আসমান-যমীন পূর্ণ হয়ে যায়, তবুও নিরাশ হয়ো না। সন্তান তার মায়ের সঙ্গে অপরাধ করলে, সে মাকে সন্তুষ্ট করতেও কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন এমনই দয়ালু যে, গুনাহ্ দিয়ে আসমান-যমীন পূর্ণ হয়ে গেলেও, এবং সকলে কাট্টা জাহান্নামী বলতে থাকলেও, বান্দাকে তিনি বলেন, 'ওহে! নিরাশ হবে না। আমার কাছে ফিরে আসো। আনুগত্যের মাথা আমার কাছে অবনত করো। আমি তোমার সমস্ত অপরাধ মাফ করে দিবো। কারণ, তোমাকে মাফ করে দেয়ার জন্য আমাকে কারো নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে না।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! সেই দয়ালু আল্লাহ্ পাকের দয়া পেতে হলে প্রথমে আমাদেরকে তওবা তো করতে হবে! আমেরিকার এই জীবন তথা বিত্ত-বৈভবের এই প্রাচুর্য্যকে আপনারা সুখের জীবনের চাবি মনে করছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীনের অভিমত কি শুনুন—'তোমরা ভাবছো, এখানে এদেশে তোমরা তোমাদের সুখী ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে। কিন্তু সুখী জীবন তো এভাবে নির্মিত হয় না। তোমাদের এই অভিবাসন বরং তোমাদের ভবিষ্যৎকে সংকুচিত করে ফেলেছে। মৃত্যু, কবর ও হাশরের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যে জীবনকে আমরা ভবিষ্যৎ গঠনের চাবিকাঠি মনে করছি, সে জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলছেন—'এটা ধোঁকার ঘর, মাকড়ষার জ্বাল, মাছির পর। এ জীবন ধু-ধু মরিচিকা। যে মরিচিকার পিছনে ছুটে পিপাসাই শুধু বাড়ে এবং জীবন শুধু ধ্বংসের পথেই এগিয়ে যায়, কিন্তু পানির নাগাল আর পাওয়া যায় না।

কোথাও বলা হয়েছে—এ জীবন শুধু তিন দিনের। একটি দিন যা অতীত হয়ে গেছে। সেদিনটি কারো জীবনেই আর ফিরে আসবে না। গোটা জগতের সম্মিলিত শক্তির পক্ষেও গতকালটিকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আর একটি দিন হলো আগামী কাল। আপনার, আমার এবং এই দুনিয়ার কারোরই জানা নেই যে, সে দিনটি আমাদের কারো জীবনে আদৌ আসবে কি না। আর যে দিনটি আমরা অতিক্রম করছি, মূলত এটিই আমাদের জীবন। এই একটি মাত্র দিনের জন্য আমরা দেশ-মাটি-আপনজন ছেড়ে এই দূর দেশে পড়ে আছি। আর যে দিনটিকে আমার বলে বিবেচনা করছি, তাও পরিপূর্ণরূপে আমার কিনা, দিনের শেষ পর্যন্ত আমার প্রাণ এ দেহে থাকবে কি না, তাও আমার জানা নেই। কাজেই বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভুল করে ফেলেছি। আমরা কেবল মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ভবিষ্যৎকে সংকুচিত করে ফেলেছি।

কবর,
হাশর,
আখেরাত ও
জান্নাতকে আমরা আমাদের ভবিষ্যত মনে করছি না। ফলে সমস্ত নেযাম এবং আমাদের গোটা জীবনযাত্রা ভুল পথে অগ্রসর হয়েছে। 'ডলার' তথা অর্থ-সম্পদ আমাদের নিকট দ্বীনের চেয়ে অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। সেই ভুল পথ থেকে সঠিক পথের দিশা দান এবং দ্বীনকে জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্যে পরিণত করার জন্যই আজ আমাদের এই মেহনত। বিশ্বাস করুন, মানুষকে মহান রাব্বুল আলামীনের চেয়ে অধিক আর কেউ ভালবাসে না। মা তার সন্তানকে যে পরিমাণ ভালবাসেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাকে তার চেয়েও সত্তরগুণ অধিক ভালবাসেন।

কারূণের মত এক জালেম ব্যক্তি, যে হযরত মূসা (আ.)-এর নামে যিনার অপবাদ দিয়েছিলো, আল্লাহ্ পাক তার প্রতিও দয়া করতে প্রস্তুত ছিলেন। কারূণ যখন ভর মজলিশে নবী হযরত মূসা (আ.)-এর নামে যিনার অপবাদ দিল, হযরত মূসা (আ.) দুঃখে, লজ্জায় কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে বললেন, হে মূসা! তুমি যমীনকে যা আদেশ করবে সে তাই পালন করবে। নবী মূসা (আ.) ছিলেন জালালী তবিয়তের নবী। তিনি জোশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং যমীনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে যমীন! তুমি ঐ পাপীষ্ঠকে গিলে ফেল।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কারূণ যমীনে দেবে যেতে লাগলো। ফলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আকুতি জানিয়ে বলতে লাগলো يا موسى ارحمنى হে মূসা! আমার প্রতি দয়া করো। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তার সেই ষড়যন্ত্রে মনে যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিলেন। তাই পুনরায় যমীনকে বললেন, 'একে গিলে ফেল'। কারূণ কাতরভাবে ক্ষমা চাইতেই থাকলো। কিন্তু তার সেই কাকুতি-মিনতিতে হযরত মূসা (আ.)-এর মনের কষ্ট কিছুতেই দূর হলো না। তিনি তার প্রতি কিছুতেই সদয় হতে পারলেন না। ফলে কারূণের গোটা দেহ এক সময় মাটির নীচে দেবে গেল। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, 'হে মূসা! কারূণ তোমার কাছে এত করে কাতর মিনতি জানাল, তবুও সে তোমার কাছে ক্ষমা পেল না। আমার ইয্যতের কসম! সে যদি আমার কাছে একবারও ক্ষমা প্রার্থনা করতো, আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দিতাম।

তো যেই আল্লাহ্ পাক কারূণের ন্যায় এক মহা পাপিষ্ঠকে পর্যন্ত মাফ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, সেই মেহেরবান আল্লাহ্র কাছে আমরা মাফ পাবো না, এমন ভাবা অন্যায় হবে। তবে শর্ত হলো—তওবা করতে হবে এবং যে

জীবনাচারে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সে জীবন ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই আসমান ও যমীনের মাঝে আল্লাহ্‌র হাবীব একজনই আছেন। আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য তাঁর সেই হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ অনুসরণের বিকল্প কিছু নেই।

কোন বক্তব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য মানুষ সাধারণত শপথ করে থাকে। আর শপথ করা হয় সাধারণত এমন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে যা শপথকারীর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ হয়। মহান রাব্বুল আলামীনও তাঁর পবিত্র কালামের বিভিন্ন স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বিভিন্ন প্রসঙ্গে শপথ করেছেন। আর এভাবে তাঁর মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মহিমান্বিত করেছেন

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! যদি মহান রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি আরবী হোন, আজমী হোন, সাইয়্যেদ হোন, কোরায়শী হোন, পাঠান হোন, হিন্দী-সিন্ধী যা-ই হোন না কেন, আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শকে নিজের জীবনে সর্বোতভাবে গ্রহণ করতেই হবে। তারপর চাই শিকাগোতেই থাকুন আর মক্কাতেই থাকুন, আপনার জীবন এক রোখ ও এক গতি অনুসরণ করেই চলবে।

পৃথিবীতে জন্ম যখন হয়েছে, এ জীবন আমাদেরকে যাপন করতেই হবে। মানুষ স্বভাবে অনুকরণ-প্রিয়। সে অন্যের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। মানুষ তার চালচলন, পোশাক-আশাক তথা জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই কারো না কারো অনুকরণ করে নিয়তে পরিবর্তন আনতেই থাকে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন—'তোমরা তোমাদের জীবনকে আল্লাহ্‌র রঙে রাঙ্গিয়ে তোল। সেই রঙটি হলো আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-আদর্শ। তাঁর সেই আদর্শ অনুসরণ করে তোমরা তোমাদের জীবন গঠন করো।

হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন আল্লাহ্ পাকের একজন সম্মানিত নবী। তাঁকে লক্ষ্য করে রাব্বুল আলামীন বলেছিলেন—'হে দাউদ! আমি আপনাকে আমার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি। আপনি রাজ্য পরিচালক। কিন্তু (সাবধান!) কখনো মনের কু-প্রবৃত্তি অনুসরণ করে চলবেন না।' পক্ষান্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কী বলেছিলেন জানেন?

والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى *

'শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি। এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায়ও কথা বলেন না।'

—সূরা আন-নাজম-১-৩

যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর কালামে বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, সে নবীর জীবনাদর্শ যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাতে সন্দেহ থাকে না। আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর হাবীবের সেই শ্রেষ্ঠ সীরাত ও সুন্নত অনুসরণ করে চলার আদেশ করেছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতই মুক্তির পথ

কারো পকেট থেকে একটা 'ডলার' পড়ে গেলে তা উঠিয়ে নিতে কেউ ভুল করে না। কারণ, একটি ডলার আমাদের দেশীয় টাকায় প্রায় সত্তর টাকা। কিন্তু আফসুস! জীবন থেকে যে অমূল্য সুন্নত ছুটে যাচ্ছে সেদিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ নেই। কারো মনে সে জন্য ব্যথাও হয় না এবং কারো চোখে এক ফোঁটা অশ্রুও গড়ায় না। আসলে যাদের কাছে ফরজই চরম অবহেলায় পরিত্যক্ত হয়, তাদের চোখে সুন্নত ছুটে যাওয়ায় বেদনার অশ্রু আশা করা বোকামী বই কি?

কিন্তু আমার ভাই ও বন্ধুগণ! একটু চিন্তা করুন। বিবেক থেকে একটু সাহায্য গ্রহণ করুন। ভেবে দেখুন, এই ডলার কতদিন পর্যন্ত আপনাকে সঙ্গ দিবে? আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত কত দিন পর্যন্ত অতি আপন জনের মত আপনার দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে রাখবে ? আপনি একজন ঈমানদার মানুষ। ঈমানের প্রতি আপনার হৃদয়ে মুহব্বত ও দরদ রয়েছে। তাই মসজিদে এসেছেন। না থাকলে আসতেন না। তবে দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, দুনিয়াতে এমন অনেক মুসলমান রয়েছে যারা ভুলেও মসজিদের দিকে ফিরে তাকায় না।

নির্জন-নিরালায় বসে চোখ বুজে একটু চিন্তা করুন—আপনার এ জীবন কোন পথে এগিয়ে চলেছে। যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাদের কল্যাণ চিন্তায় তাঁর গোটা জীবন কেঁদে ভাসিয়েছেন। তায়েফে পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। যে দেহে মশা-মাছি পর্যন্ত বসা নিষিদ্ধ ছিল, শুধু আপনাদেরই জন্য সে পবিত্র দেহ দুশমনের প্রস্তর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। উহুদের লড়াইয়ে প্রহৃত হয়েছেন, দাঁত ভেঙ্গেছে, পাথর পড়েছে, আঘাতের আতিশয্যে তিনি জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে নবীর লাজ রক্ষা করুন। তাঁর এই দরদ ও ত্যাগের সম্মান দিন।

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! উম্মতের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কী পরিমাণ দরদ ও স্নেহ পোষণ করতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি নিজের সন্তানদেরকে নয়, বরং গোটা উম্মতকে নসীহত করে বলেছেন—

الصلوة الصلوة الصلوة وما ملكت ايمانكم

ওহে আমার প্রাণপ্রিয় উম্মতগণ! আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। এই অন্তিম মুহূর্তে তোমাদের জন্য আমার নসীহত হলো—নামায ত্যাগ করো না, নামায ত্যাগ করো না, নামায ত্যাগ করো না। আর দাস-দাসীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।

প্রতিটি মুসলমানকে 'কালিমাওয়ালা' হতে হবে

আসুন! আজ আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি—আর কোন অবহেলা নয়, এখন থেকে আমরা আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবো। গোটা দুনিয়া জুড়ে তাবলীগের নামে যে মেহনত হচ্ছে, দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে একদল লোক মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে, এটা কোন বিশেষ দল বা ব্যক্তির কাজ নয়। একাজ সকল উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। সে দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হয়েই আজ আমরা সুদূর পাকিস্তান থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের এই ত্যাগ ও মেহনত শুধু এই উদ্দেশ্য যে, সমস্ত 'কালিমাগো' মুসলমানদের দ্বারা যেন কালিমার সম্মান রক্ষা হয়। যেন সকলের জীবনেই কালিমার দাবী পুরণ হতে থাকে। সকলেই যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মানুষ যেন টাকা-পয়সা, স্ত্রী আর খাহেশাতের গোলামী ত্যাগ করে এক আল্লাহ্র গোলামে পরিণত হয়। কারণ, ডলারের গোলাম, স্বর্ণ-রৌপ্য আর দুনিয়ার চাকচিক্যের গোলামদের ধ্বংস অচিরেই হয়ে যাবে।

দ্বীনই সফলতার একমাত্র পথ

তো যারা খাহেশাতের কারণে গোমরাহ্ হয়েছে, যারা দুনিয়ার সাময়িক স্বাদ-আহ্লাদ আর রঙ-তামাশার পিছনে পড়ে দ্বীন ত্যাগ করেছে, দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য না করে যারা শাহওয়াত ও মনের চাহিদার পূজা করেছে, মানুষ হিসাবে তাদেরকে নিশ্চয়ই ভাল বলা যায় না। এটা আমার কথা নয়, স্বয়ং আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান। কাজেই আমাদেরকে দুনিয়ার এই ক্ষুদ্র জীবনে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

অনুগামী হয়ে চলা শিখতে হবে।

ডাক্তারী শিখেছেন,

ব্যবসা শিখেছেন,

ইঞ্জিনিয়ারী শিখেছেন,

এই সুদূর আমেরিকায় কীভাবে আসতে হবে সে পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর কীভাবে আখেরাত তথা আমাদের জীবনের মূল পর্বের কল্যাণ অর্জন করতে হবে, তা শিখতে হবে না, এটা কেমন করে হয় ? এই ক্ষুদ্র ও সাময়িক জীবনের জন্য এত ব্যাপক আয়োজন, আর অনন্তকালের যে জীবন অচিরেই আরম্ভ হতে যাচ্ছে, তার জন্য কোন আয়োজনের প্রয়োজন নেই, তা কি করে হয়? সুতরাং, আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান হওয়া শিখতে হবে। দুনিয়ার কোন বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন যেমন শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া হয় না, তদ্রূপ খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্যও শিক্ষার বিকল্প নেই।

দ্বীন ও ঈমান শিক্ষার এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই জগত জুড়ে চলছে তাবলীগের দ্বীনী মেহনত। আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুবের তরীকা সম্পর্কে পরিচয় লাভ করতে পারে, এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করতে পারে, এ লক্ষ্যেই চলছে দুয়ার হতে দুয়ারে নিরন্তর ছুটে চলা।

আলম ব্যাপী তাবলীগের এই মেহনতের আরো একটি উদ্দেশ্য হলো— আমাদের নবীর পর যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কর্মভার আমাদের কাঁধে অর্পণ করে বলেছেন— الا فليبلغ الشاهد الغائب শোনে রাখ! আমার রেখে যাওয়া দ্বীনের এ পয়গাম তোমরা অনুপস্থিত ও অনাগত লোকদের কাছে পৌছে দিও।

আমরা যে পাকিস্তান থেকে কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এই সুদূর আমেরিকায় এসেছি তা কারো আর্থিক সহযোগিতায়ও নয়, কিংবা কারো নির্দেশে বাধ্য হয়েও নয়। আমরা এসেছি নিজ খরচে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। কেন ? কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া দ্বীন শিক্ষা করা আমাদের নিজেদের যেমন কর্তব্য, তেমনি আমাদের ভাইদের কাছেও দ্বীনের কথা পৌছে দেয়া এবং তাদেরকে দ্বীনের মেহনতের জন্য তৈরী করাও আমাদেরই দায়িত্ব। দাওয়াতের নির্দেশ সম্বলিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীসের প্রেক্ষিতে আমাদের কাঁধে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, হাদীসের পরিভাষায় তাকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়। 'মুতাওয়াতির' বলা হয় এমন সহীহ হাদীসকে যার রেওয়ায়েতকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সকলের একসঙ্গে মিথ্যা বলা স্বভাবিকভাবেই অসম্ভব মনে হয়। এমন সহীহ

হাদীস দিয়ে প্রমাণিত বিধান শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরআন দ্বারা প্রমাণিত বিধানের মতই অকাট্য বলে বিবেচিত হয়।

দ্বীনের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করা মারাত্মক অপরাধ

বিদায় হজ্বে আরাফাতের ময়দানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীর বিশাল সমাবেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হলো—

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

ورضيت لكم الإسلام دينا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম।'—*সূরা মায়েদা-৩*

আমার বান্দাগণ! তোমরা আনন্দিত হও। যে দ্বীনের যাত্রা শুরু হয়েছিল আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর উপর, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আজ আমি তা পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তাতে মোহর লাগিয়ে দিলাম। আজ থেকে এই দ্বীনের মধ্যে আর কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। চিরদিনের জন্য সেই হ্রাস-বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে দিলাম। বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার মত এক প্রগতিশীল দেশেও দ্বীনের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাগানো 'মহর' ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব নয়। যে 'মহর' স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাগিয়েছেন, সে 'মহর' আমার-আপনার মত তুচ্ছ মানুষের পক্ষে ভেঙ্গে ফেলা কী করে সম্ভব হতে পারে!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম অতঃপর হজ্বের নিয়মিত কর্মকাণ্ড সমাপন করে মিনায় গমন করলেন। কোরবানী করলেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের সামনে খুৎবা দিলেন। সে খুৎবায় বললেন— الا فليبلغ الشاهد الغائب 'হে আমার প্রিয় উম্মতগণ! এখন থেকে আমার পয়গাম পরবর্তী লোকদের নিকট পৌঁছে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব।

কাজেই 'তাবলীগ' কোন ব্যক্তি বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠির কাজ নয়; বরং এ দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের এবং প্রতিটি ঈমানদার মানুষের। যারাই খতমে নবুওয়াতকে স্বীকার করে এবং মনে করে যে, আমাদের নবীই সর্বশেষ

নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আগমন করবেন না, তাঁকেই দ্বীন প্রচারের এ মেহনতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দেশে-বিদেশে সর্বত্র দ্বীন যিন্দা করার মেহনত করতে হবে এবং খাঁটি মুসলমান হয়ে জীবন কাটাতে হবে। মুসলমানের জীবন একটি ফুলের মত। সে ফুল চারিদিকে সুবাস ছড়িয়ে মানুষকে বিমোহিত করে। পাপের মধ্যে যেমন দুর্গন্ধ ও নোংরামী রয়েছে, যার দ্বারা মানুষের আত্মা প্রভাবিত হয়। তেমনি ইসলামী জীবনও মানুষের হৃদয়ে এমন প্রভাব ফেলে যে, তারা কুফরের নোংরা জগত ছেড়ে ইসলামের সুরভিত জগতে দলে দলে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

আজকের এই মজলিশে প্রায় হাজার দু'য়েক লোক উপস্থিত আছেন। আপনারা সকলে যদি আজ তওবা করে বলেন যে, আয় আল্লাহ্! আমাদের অপরাধ ও যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করে দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন। আয় আল্লাহ্! আমরা এতদিন আপনার ও আপনার হাবীবের নাফরমানী করেছি। আমাদেরকে মাফ করে দিন। তো এই তওবার ফলে কী লাভ হবে ? আল্লাহ্ পাক আপনাদের অতীত জীবনের সমস্ত ফাইল ফেলে দিবেন। সেখানে ভুল-বিচ্যুতি যা-ই লিপিবদ্ধ ছিল, সব মুছে ফেলা হবে। সত্তর, ষাট, পঞ্চাশ বা পনের —বয়স যা-ই হোক কেন, আল্লাহ্র কসম! এ দু'টি বাক্য আপনাদের ফেলে আসা জীবনের সমস্ত মলিনতা ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে দিবে, এবং আজ থেকে আপনাদের জীবন-লিপি একটি নতুন ফাইলে নতুন করে সংরক্ষিত হতে থাকবে।

এমনিতেও রমযান মাসে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। তার উপর আজ ঈদের দিন। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ নিয়ে ফিরিস্তাগণ উপস্থিত আছেন। আল্লাহ্ পাকের সেই রহমতের ভরসায় আসুন আমরা তওবা করি।

দ্বীন শিখার নিয়ত করুন

আজ এখান থেকে দু'টি বিষয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘরে ফিরুন—প্রথমত দ্বীনের উপর চলার নিয়ত করুন এবং তা শিখতে আরম্ভ করুন। আর দ্বিতীয়ত এই আমেরিকায় দ্বীন যিন্দা করার নিয়ত করে সে পথে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকুন।

আমাদের কত ছেলে-সন্তান, কত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমেরিকার এই পরিবেশে লবনের মত গলে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব শেষ করে দিয়েছে। আপনাদের দাওয়াতী মেহনতের ফলে পুনরায় তাদের দ্বীন ও ঈমানের পথে

ফিরে আসার পথ সুগম হবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ এ মেহনতের ফলে মহান রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের সৌরভে সুরভিত এক নতুন জীবন দান করবেন। আর পথহারা আমাদের গোটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইসলামের সোনালী পথে ফিরে আসার পথ সুগম করবেন।

তো আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনারা এদু'টি কাজের নিয়ত করুন। আজ এ দু'টি বিষয়ের উপরই গোটা দুনিয়ায় দ্বীনের মেহনত হচ্ছে। আল্লাহ্ পাক আমাকে, আপনাকে এবং আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন!

—▣—

কবরের আলো

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . كل نفس ذائقة الموت . صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشهدين والشكرين والحمد لله رب العالمين .

মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ

মোহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়াতে মানুষ যত বিপদের মুখোমুখি হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো মৃত্যু। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দুনিয়াতে মানুষের উপর যত বিপদাপদ আসে তার মধ্যে মৃত্যুই হলো সবচেয়ে বড় বিপদ। কিন্তু মানুষের স্বভাব হলো, সে অন্যান্য ছোটখাট বিপদ নিয়ে চিন্তা করে এবং তা প্রতিরোধের বিবিধ উপায় নিয়ে পরিকল্পনা করে, আর আগামী দিনের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। অথচ সবচেয়ে বড় বিপদ মৃত্যুর কথা তার চিন্তা পথে মোটেও উদয় হয় না।

পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাক যত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে একমাত্র মানুষই হলো এমন যারা আগামী কাল নিয়ে চিন্তা করে। পিপিলিকা খাদ্য সংগ্রহ করে। মৌমাছি মধু আহরণ করে। কিন্তু তাদের এই সঞ্চয়-মানসিকতা আগামী দিনের চিন্তা থেকে নয়, বরং এটা তাদের সৃষ্টিগত স্বভাব। খাদ্য সংগ্রহ বা মধু আহরণ তারা এ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করে না যে, এই সঞ্চিত খাদ্য তাদের আগামী দিনের প্রয়োজন মিটাবে। বরং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এই আহরণের স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। ফলে অন্য কোন চিন্তা নয় ; বরং সৃষ্টিগত স্বভাবের তাড়নাতেই তারা অহর্নিশি সঞ্চয়ের জন্য ছুটোছুটি করতে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ সচেতনভাবেই আগামী দিনের চিন্তা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় বিভোর হয়ে থাকে। আল্লাহ্ পাকও মানুষকে আগামী দিনের চিন্তার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন—

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت
لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون .

মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।

—সূরা হাশর - ১৮

অন্যদিকে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদেরকে আগামী দিনের চিন্তায় ব্যস্ত হবার উপদেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন—'আগামী দিন হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, অথচ আজ তোমাদের আমলের কোন প্রস্তুতি নেই!'

তো যা বলছিলাম, পৃথিবীতে মানুষের সবচাইতে বড় বিপদ হলো মৃত্যু বা এই পৃথিবীকে চিরদিনের মত ছেড়ে যাওয়া। মানুষ কত স্বপ্ন নিয়ে ঘর-বাড়ী তৈরী করে। শুধু মানুষই নয়, এইযে ছোট ছোট পাখী বিপুল উৎসাহের সঙ্গে খড়কুটো ঠোঁটে করে বয়ে এনে বাসা তৈরী করে, তাদের মনেও হয়তো বা একটা স্বপ্ন থাকে। নিজের থাকার জন্য একটা ঠিকানা তৈরী করা—এটা প্রাণী মাত্রেরই স্বভাব-চাহিদা। তেমনি মানুষও হৃদয় ভরা স্বপ্ন নিয়ে সুরম্য ঘরবাড়ী তৈরী করে। তারপর হয়তো সে ঘরে নিজের থাকবারও সুযোগ হয় না, তার আগেই মানুষের কাঁধে চড়ে নিরবে চলে যেতে হয় কবরের অন্ধকার ঠিকানায়।

আরাম-আয়েশের জন্য মানুষ কতনা আয়োজন করে। বিদেশী দামী দামী আসবাব সংগ্রহ করে। চোখ ধাঁধানো ডিজাইনের খাট তৈরী করে। শয়নকক্ষে সৃষ্টি করে ঝাড়বাতির মৃদু আলোর লুকোচুরি খেলা। কিন্তু সখের এই বিপুল আয়োজন কয়দিনই বা মানুষ ভোগ করতে পারে। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎই একদিন শেষ নোটিশ এসে উপস্থিত হয়। সমস্ত বিলাশব্যসন ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্ধকার কবরে। আলো ঝলমল ঘরের বাসিন্দা হয়ে পড়ে অন্ধকার নিলয়ের অধিবাসী। যে দেহ একদিন মশা-মাছি থেকে রক্ষা করার জন্য কত আয়োজন গৃহিত হয়েছে, সে দেহে রাজ্যের পোকামাকড় এসে বাসা বাঁধে। যে দেহকে একদিন শীত-তাপ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে রক্ষা করার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে, সে দেহ পঁচেগলে পোকামাকড়ের আহারে পরিণত হয়। কেউ তার চামড়া কুড়ে কুড়ে খায়। কেউ বা জিব কেটে টুকরো টুকরো করে। কেউ তার মাথার মগজে কিলবিল করতে থাকবে। যে উদরের লোভ মিটানোর জন্য গোটা জীবন হালাল-হারামের বিচার না করে কেবল ছুটাছুটি করে মরেছে, কবরের

মাটির বন্দীশালায় সর্বাগ্রে সে পেটই পঁচে ফুলে ফেটে যাবে। আল্লাহ্ পাক বলেন—ওহে আমার বান্দারা দুনিয়ার প্রতি লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ো না। কারণ কবরে তোমার দেহের যে অঙ্গটি সর্বপ্রথম পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হবে, সেই অঙ্গটি হল তোমার চক্ষু। যে অঙ্গটি মানুষের প্রতিবেশকে তার কাছে দৃশ্যমান রেখে তার জীবনকে আলোকময় করে রাখে, আল্লাহ্ পাক সবার আগে সে অঙ্গটিই পোকামাকড়ের হাওলা করে দিবেন।

তো যে মানুষের ঘাড়ের উপর হিংস্র মৃত্যু থাবা উঁচিয়ে আছে। মৃত্যুর পর কবরে যার এমন করুন ও ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। যার চারিদিকে বিপদের ফাঁদ পাতা আছে। পদে পদে যার পা পিছলে গভীর খাদে পড়ে যাবার সমূহ আশঙ্কা বিরাজ করছে। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার কালো মেঘ ফুঁড়ে যার আকাশে কখনো আশার আলো উঁকি দেয় না। জীবন-আকাশে হঠাৎ হঠাৎ হয়তো কখনো আনন্দের বিদ্যুৎ চমকে ওঠে কিন্তু পরক্ষণেই তা মিলিয়ে যায় দূর দিগন্তে। আবার সেই পেরেশানী ও দুশ্চিন্তায় অথৈ সাগরে হাবুডুবু। রোগ-ব্যাধি নাছোর সঙ্গীর মত পিছু লেগে থাকে। আত্মীয় বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সন্তানের অবাধ্যতা জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। আর ওদিকে কবর প্রতিদিন পাঁচবার ডেকে বলে—

انا بيت وحشت انا بيت الدود انا بيت الظلمة

'আমি একাকিত্বের ঘর, আমি অন্ধকার ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। কাজেই আমার নিকট আসার সময় কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এসো।' তো সে মানুষের পক্ষে মৃত্যু ভুলে দুনিয়ার চাকচিক্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো কতটা সঙ্গত ও বুদ্ধিমানের আচরণ হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?

জীবন এক অবিশ্বস্ত সঙ্গী

একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন—মানুষের এ জীবন কতটা ক্ষণভঙ্গুর, কতটা অস্থায়ী ও অবিশ্বস্ত। মুহূর্তের জন্যও এজীবনের নিশ্চয়তা নেই। জীবনে কখনো যদি আনন্দের ক্ষীণ একটা মুহূর্ত আসেও বা, পরক্ষণেই চারদিক থেকে অসংখ্য দুঃখ-বেদনা, চিন্তা-পেরেশানী আনন্দের সেই দুস্প্রাপ্য মুহূর্তটিকে ছিনিয়ে নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে শান্তি জীবনের গহীন অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতই হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে পর মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। তারপর অশান্তির অন্ধকারে জীবন এমনভাবেই তলিয়ে যায় যে, সে আকাশে কখনো শান্তির বিদ্যুৎ চমকেছিলো বলেও আর মনে হয় না।

আবার সেই বান্ধবহীন একাকীত্ব, আবার সেই দুঃখ-বেদনা ও অশান্তি অমোঘ নিয়তি হয়ে তাকে ঘিরে ধরে। তারপর জীবনের সেই অসমতল পথে চলতে চলতে একদিন জীবনের অসক্ত সুঁতোটিও ছিড়ে যায়। তখন সকলে মিলে তাকে নিয়ে মাটির এক অন্ধকার গর্তে রেখে আসে। তারপর ক্রমশ একদিন আত্মীয়-পরিজনরাও ভুলে যায় যে, এই লোকটি এক সময় এই মাটির বুকে, তাদেরই আশপাশে বিচরণ করেছিলো। তাদেরকে আপন-আত্মীয় ভেবে নিজের জীবন পাত করেছিলো।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর ভাই হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর মৃত্যুর পর তিনি বলেছিলেন—আমাদের এ দু'টি ভাই-বোনের মাঝে এমন গভীর সম্পর্ক ছিল যে, লোকজন বলতো, এরা কখনো পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু এখন সে আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে, যেন আমরা কখনো একসঙ্গে ছিলামই না।

যে সন্তানের সুখের জন্য আপনি আজ নিজের শরীরের বিন্দুবিন্দু ঘাম ঝড়িয়ে দিচ্ছেন, একদিন সেই সন্তানেরই মনে থাকবে না যে, তার পিতা-মাতা নিজেদের যৌবনের স্বপ্নময় দিনগুলোকে শুধু তাদের সুখের দিকে তাকিয়ে বিসর্জন দিয়েছেন। নিজেরা শীত-গ্রীস্মের কষ্ট সহ্য করে তাদের সুখের আয়োজন করেছেন। নিজেদের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা আর স্বপ্নকে টুকরো টুকরো করে সেই টুকরো স্বপ্নের ইট একটার পর একটা জুড়ে দিয়ে তাদের সুখের সৌধ রচনা করে যাচ্ছেন।

সন্তানের একথা মনেই থাকে না যে, তার একজন মা ছিল, যিনি তার মল-মূত্র পরিস্কার করার পিছনে নিজের জীবনের অনেক আনন্দময় মুহূর্তকে বিসর্জন দিয়েছেন। রাতের পর রাত নিজের ছোট সন্তানটির আরামের কথা ভেবে নিজের সমস্ত আরাম-আয়েশের কথা ভুলে গিয়েছেন। তারপর সে সন্তান যখন পিতামাতার বিচূর্ণ সুখের উপর দিয়ে হেটে হেটে নিজের সুখ-স্বপ্নকে আলিঙ্গন করে, তখন আর পিতামাতার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর খুঁজে পায় না। আরও পরে, যখন দুই জনক-জননী নিজেদের দুঃখের বোঝার ভারে বিপর্যস্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন সন্তান তাদের কথা এমনভাবে ভুলে যায়, যেন তারা দুনিয়াতে পিতামাতা ছাড়াই এসেছে। তো এই হল দুনিয়ার জীবন—নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব, কেউ কারো নয়। একেবারে ক্ষণস্থায়ী, স্থিতিহীন ও অবিশ্বস্ত।

মৃত্যুর পর মনুষ মাটির মাঝে দাফন হয়। তারপর ক্রমশ সেই দেহ পঁচেগলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, এবং একসময় কবরও ভেঙ্গে নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন হারিয়ে ফেলে। এমনকি পিতা-মাতার কবরটি ঠিক কোথায় ছিল, একদিন

ছেলে-সন্তানরাও তা ভুলে যায়। তারপর সেই কবরের মাটি বাতাসে ভেসে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ একসময় যেভাবে জগতে অনুপরমানুতে মিশে ছিল, ঠিক তেমনি আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুপরমানুতে হারিয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক বলেন—

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا

মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। —*সূরা দাহর - ১*

সেদিনের কথা কি তোমার কিছু মনে পড়ে, যেদিন তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। তুমি বায়ু প্রবাহ আর চন্দ্র-সূর্যের আলোর কণায় বিক্ষিপ্ত ছিলে। অতঃপর আমি সেই কণাগুলো একত্রিত করে খাদ্য-বানিয়েছি। খাদ্য থেকে বীর্য এবং বীর্য থেকে মানব সন্তান। তারপর আবার তাকে মাটির মাঝে মিশিয়ে দেই। সেই মাটি যত ওলট-পালট হয়, ধূলোকণা হয়ে বাতাসে উড়ে ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। তো আমার ভাই, এই তুচ্ছ একটি জীবনের জন্যইকি আমরা আল্লাহ্কে নারাজ করবো? এ দেহে যৌবন কতদিন থাকবে? দেহের এই সবল-সচল অবস্থা আপনাকে কতদিন সঙ্গ দিবে? আর কতদিন পর্যন্ত আপনি আল্লাহ্র নাফরমানী করে যাবেন? এ জীবন আর কতদিন পর্যন্ত আপনার সহযাত্রী হয়ে আপনাকে স্বপ্নের রসদ জোগাবে তা কি জানা আছে আপনার?

এত ছোট একটা জীবন, যেন ছোট একটি কক্ষে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। আজ যার বরযাত্রা যাচ্ছে, কালই সে জানাযা হয়ে লোকের কাঁধে চড়ে নিজের আসল ঠিকানার উদ্দেশ্যে চলেছে। যে কন্যা আজ বধুবেশে পালকি চড়ে স্বামীর বাড়ী গমন করছে। কালই তার লাশ গোরস্থানে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই তো জীবন। অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ আর অনিশ্চিত। এরই জন্য আমরা আল্লাহ্কে নারাজ করে চলেছি। কোথায় যে কার মৃত্যুর গহীন গুহাটি লুকিয়ে আছে সেকথা কারোর জানা নেই । জীবনের কোন্ পর্বে হঠাৎ যে পা ফসকে পড়ে যেতে হবে, কে জানে। এই অনিশ্চিত জীবনের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয়ার মত বোকামী আর কী আছে ? নিজের এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর হয় না।

কেয়ামতের দিন মৃত্যুরও মৃত্যু হবে

তারপর একদিন গোটা পৃথিবীরই মৃত্যু হয়ে যাবে। মানব-দানবসহ সকল প্রাণীরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। আজরায়ীল, মীকায়ীল কেউই মৃত্যুর হাত থেকে

রক্ষা পাবে না। তারপর এক সময় শুধুমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। গোটা সৃষ্টিজগত এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হবে। সেই নির্জন, নিস্প্রাণ, নিথর সৃষ্টিজগতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বলবেন—اين الملوك কোথায় দুনিয়ার রাজা-বাদশারা! কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব দেবার মত সেদিন দুনিয়াতে কেউ থাকবে না। তো এই হলো দুনিয়ার হাকিকত।

জীবনের গল্প কি এখানেই শেষ? আসলাম আর গেলাম। জন্ম হলো তারপর একদিন মৃত্যুর মাঝে হারিয়ে গেলো। মানুষের যুক্তি আর বুদ্ধি তো একথাই বলে। এই হাড়-মাংস পঁচেগলে যাওয়ার পর আবার পূণর্জন্ম হবে—স্বাভাবিক যুক্তি একথা মেনে নিতে পারে না। কিন্তু আসমানী ওহী কী বলে শুনুন—

فإنما هي زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة *

এটা তো কেবল এক মহা-নাদ। তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।

—সূরা নাযি'আত - ১৩-১৪

এক তীব্র-তীক্ষ্ণ আওয়াজের আঘাতে সবকিছু চুরমার হয়ে যাবে। তারপর সকলে তোমরা এক বিশাল ময়দানে আবির্ভূত হবে। فلا انساب بينهم তোমাদের মাঝে সেদিন আত্মীয়তার কোন বন্ধন থাকবে না। পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান যে যার পথে। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কারো দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ানো তো দূরের কথা, চোখ তুলে তাকাবারও অবসর হবে না।

মুক্তি শুধু নবীওয়ালা পথে

মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু হবে আরো একটি জীবন। সে জীবনের কথা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যদিও মানতে চায় না, কিন্তু হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করে গেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন—منها نخرجكم تارة اخرى মাটির মাঝে হারিয়ে যাওয়া তোমাদের অস্তিত্বকে আবারো আমি দেহ দান করবো। সেদিনটি যে একদিন আসবেই তাতে সন্দেহ নেই। لاتكلم نفس الا باذنه সেদিন আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষেই কথা বলা সম্ভব হবে না। মানুষ সেদিন দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে—তাদের কিছু যাবে জাহান্নামে আর কিছু যাবে জান্নাতে। যারা জাহান্নামে যাবে তারা আগুনের শিকারে পরিণত হবে। لهم فيها زفير و شهيق সেখানে তাদের জন্য থাকবে শুধু বিলাপ ও

চিৎকার। সে বিলাপের কোন শেষ নেই, কান্নারও কোন অবসান নেই। দুঃখ সেখানে তাদের অনন্তকালের সঙ্গী হয়ে থাকবে। واما الذين سعدوا ففى الجنة আর যারা সেদিন কামিয়াব হবে তারা যাবে জান্নাতে।

তো আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য একটি নিয়ম কায়েম করেছেন। সে নিয়মটি হলো, মৃত্যুর পর তাদের জন্য আরও একটি জীবন রয়েছে, যা চিরস্থায়ী। সে জীবন হয় জান্নাতের হবে, নয়তো জাহান্নামের। জীবনের এই বিভাজনটা কোন্ ভিত্তিতে হবে ? জেনে রাখুন, তা আত্মীয়তার সূত্রেও নয় বা ধন-দৌলতের ভিত্তিতেও নয় ; বরং তা হবে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য এবং তাঁর প্রেরিত দ্বীনের অনুসরণের ভিত্তিতে, যেই দ্বীন তিনি হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুর পরের সে জীবনে মানুষের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ভর করবে তার দ্বীনদারীর গভীরতার ভিত্তিতে এবং সে কতটা ইসলামের অনুসারী হতে পেরেছে সেই বিচারে।

বাতিল শক্তির ইচ্ছা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! যেদিন আমাদের বন্ধু কেউ থাকবে না, আমরা নিঃসঙ্গ ও একা হয়ে পড়বো, সেই দুর্দিনে আমলই হবে আমাদের একমাত্র সঙ্গী। সেদিনই মানুষের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে যে, একেকটি নেকীর মূল্য কত! আজ দুনিয়াতে যেই বাতিল শক্তি বিরাজ করছে, তারা মূলতঃ আমাদের দেশ ছিনিয়ে নিতে চায় না বা দখলও করতে চায় না। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের আখিরাত ধ্বংস করে দেয়া। কারণ, তারা তো বরবাদ হয়েছেই, সঙ্গে আমাদেরকেও সফল হতে দেবে না। নাফরমানীর যে সমুদ্রে তারা নিমজ্জিত হয়েছে, আমাদেরকেও সে সমুদ্রে টেনে নামাতে চায়। আমাদের যুব-সমাজকে যেভাবে নাচ-গান আর অনৈসলামিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা হচ্ছে, পরিনামের বিচারে তা মাথার উপর এটম বোমা ফাটানোর চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ, আমাদের যুব সমাজকে যদি গানে অভ্যস্ত করে তোলা যায়, তাহলে তাদের ঈমানের দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়বে। তখন অতি সহজে তাদেরকে ধ্বংসের চূড়ান্তে ঠেলে দেয়া সম্ভব হবে।

তো আজ গোটা দুনিয়ার মুসলমানের 'নসল' (বংশধারা) ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই বাতিলের মেহনত চলছে। মুসলমানদের মাথার উপর এখন বিপদের পাহাড়। কাজেই সমস্ত মুসলমানই আজ করুণার পাত্র। তাবলীগের মেহনত সেই করুণারই বহিঃপ্রকাশ।

তাবলীগ জমাতের কর্মতৎপরতা

আমাদের জামাত একবার বেলজিয়াম থেকে জলজানে করে ইংল্যান্ড আসছিল। চার ঘন্টার সফর। জাহাজে আমরা তখন পঞ্চাশ জনের মত ছিলাম। আমাদের জামাত অবশ্য ছিল মাত্র চার সদস্যের। পরে বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স থেকে যুক্ত হয়ে এখন আমরা পঞ্চাশ জনের মত। সেই জাহাজেই আযান দিয়ে আমরা মাগরিব ও এশার নামায পড়লাম। নামাযের অন্তর্নিহিত শক্তি এতটাই প্রবল যে, এর ফলে গোটা জাহাজেই একটা প্রভাব পড়ল।

১৯৭৮ সনে ফ্রান্স থেকে একজন পাদ্রী এসেছিলেন। তখন অবশ্য তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের নাম রেখেছিলেন আব্দুল মজীদ। তিউনিসিয়ার এক জমাতের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে জমাতের আমীরের নাম ছিল আব্দুল মজীদ। সে নামানুসারে তিনি নিজের নাম আব্দুল মজীদ রেখেছিলেন। এখানে যখন এসেছিলেন তার বয়স তখন পচাত্তর থেকে আশির মাঝামাঝি। বেশ লম্বাটে গড়ন। তিনি বলেন, ত্রিশ বছর থেকে আমি কোরআন পড়তাম। কোরআন সত্য, মনে মনে উপলব্ধি করতাম। কিন্তু সেই আদর্শের অনুসারী একটা লোকেরও দেখা আমি পাই নি। তারপর হঠাৎ একদিন উষর মরুর বুকে মরুদ্যানের মত তিউনিসিয়ার একটি জমাত আমার চোখে পড়ে। তাদেরকে আমি আমার গির্জায় স্থান দেই এবং নিজে মুসলমান হয়ে যাই।

তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে দু'টি বিষয়ের ওসিয়ত করছি—প্রথমতঃ আপনাদের এই লেবাস—পাগড়ী, দাড়ী, কুরতা-শেলওয়ার কখনো ত্যাগ করবেন না। দুনিয়ার যেখানেই থাকুন। আপনাদের এই বাহ্যিক সাজের মধ্যে যেই শক্তি রয়েছে তা অন্য কিছুর মধ্যে নেই। দ্বিতীয়ত আপনারা যখনই ইউরোপে যাবেন আযান দিয়ে জামাতের সঙ্গে নামায পড়বেন। এই দু'টি বিষয় খঞ্জরের মত বুকের মধ্যে আঘাত করে।

সে লোকটি তার পচাত্তর বছরের পাদরী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি দু'আ করতেন—তার মৃত্যু যেন ফ্রান্সে না হয়ে কোন মুসলিম দেশে হয়। আল্লাহ্ পাক তার সে দু'আ কবুল করেছিলেন। তিউনিসিয়ার সফরে তার মৃত্যু হয় এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

তাবলীগ মানব সমাজের প্রতি এক অনন্য ইহ্সান

সন্দেহ নেই যে, তাবলীগের এই দাওয়াতী মেহনত মুসলমান তথা গোটা

মানব সমাজের প্রতি এক অনন্য ইহ্সান। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদেরকে মসজিদওয়ালা বানাবার মেহনতের প্রথম যিম্মাদার আপনিই। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে—এ জন্য দরদ প্রথমে আপনাকেই অনুভব করতে হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে বাঁচাবার মেহনতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইনশাআল্লাহ্, এ মেহনত আল্লাহ্ পাকের গায়েবী নেযামকে আপনার অনুকূলে এনে দিবে।

মসজিদের সঙ্গে যে সকল লোকের সম্পর্ক নেই, আখেরাতের কথা যারা শুনতে পায় না এবং জানেও না যে মৃত্যুর প্রস্তুতি বলে তাদের জীবনে কিছু কর্তব্য-কর্ম রয়েছে, আখেরাতের জন্য তাদেরকে কিছু সামান সংগ্রহ করতে হবে, তাবলীগের এই দাওয়াতী মেহনত তাদের জন্য এক অনন্য ইহ্সান বৈকি। কাজেই আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের এই যিম্মাদারী সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যে, নিজেদের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানো যেমন আমাদের কর্তব্য, তেমনি গোটা উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমান রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদেরই। তারা যে পথে চলেছে এ পথ মোটেও কামিয়াবীর পথ নয়। এ পথে সাফল্য লাভ করা যায় না। এপথ স্পষ্ট ধ্বংসের পথ। তওবা করা ছাড়া তাদের সামনে এ ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবার আর কোন পথ নেই। তারা যদি তওবা না করে এবং কামিয়াবীর পথে ফিরে না আসে, তাহলে আল্লাহ্ পাকের নেযাম আমাদের বিপক্ষেই চলতে থাকবে।

চেঙ্গিস খানের দূতের সঙ্গে অন্যায় আচরণ ও তার পরিণাম

খারজুম-এ নিযুক্ত খলীফা আলাউদ্দিনের গভর্নরের নিকট চেঙ্গিস খান তার দূত পাঠিয়েছিলো। কিন্তু সেই দূতের সঙ্গে বিধিবদ্ধ আচরণ না করে তার সমস্ত মাল-সামানা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বন্দী করে রাখা হলো। ফলে চেঙ্গিস খান খলীফা আলাউদ্দিনের নিকট লোক পাঠিয়ে তার গভর্নরের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দাবী করলো।

কিন্তু সেই মুর্খ আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে গোটা ওফ্দ (প্রতিনিধি দল)-কেই হত্যা করে ফেললো। শুধু একজনকে বাঁচিয়ে রেখে তার দাড়ি, গোফ ও ভ্রুর অর্ধেক কামিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলো। চেঙ্গিস তখন বর্তমান রাশিয়ার একটি অঞ্চলে শিকারে ব্যস্ত ছিলো। লোকটি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলো। চেঙ্গিস রাগে ক্ষোভে একটি টিলার উপর আরোহণ করে দাঁড়ালো। তারপর বলতে লাগলো, হে মুসলমানদের খোদা! আমার উপর জুলুম করা হয়েছে। সেই জালেমদের বিপক্ষে তুমি আমাকে সাহায্য করো।

অতঃপর চেঙ্গিস খান ইরান আক্রমনের জন্য অগ্রসর হলো। যখন তার বাহিনী মুসলিম সৈন্যদের মুখোমুখি হলো, এক আল্লাহ্ওয়ালা লোক তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য বের হয়ে এলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, 'আল্লাহ্র ফিরিশতারা তাতারী বাহিনীর পিছনে দাঁড়িয়ে বলছেন, ওহে কাফির বাহিনী! ঐ জালিমদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে ফেলো।' ফলে সেদিন চেঙ্গিস খান এক মৃত্যুদূত হয়ে বিশ লক্ষ্যাধিক লোকের আবাদী গোটা কয়েক বড় বড় শহরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো এবং আগুন জ্বালিয়ে সব পুরিয়ে ছাই করে দিলো।

আফগানিস্তানের বামিয়ান নগরের এক লড়াইয়ে চেঙ্গিস খানের পৌত্র নিহত হয়। এ ঘটনায় চেঙ্গিস খান এতটা রোশায়িত হলো যে, সে নগর বিজয়ের পর এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হলো যে, নগরের একটি কুকুর-বিড়ালও যেন জীবিত না থাকে। সব হত্যা করে দেয়া হোক। ফলে সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে কোন মানব সন্তানের পক্ষেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলো না। অথচ ইতিপূর্বে বিজিত সমস্ত নগরে যুবক-যুবতীদেরকে দাস-দাসী বানিয়ে শুধু বৃদ্ধ ও বয়স্কদেরকেই হত্যা করা হতো। আর ধন-সম্পদ সব লুট করে নেয়া হতো। কিন্তু বামিয়ান নগরে এমনভাবে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হলো যে, সেই বিভিষিকাময় হত্যাযজ্ঞ অবলোকন করার জন্য সেখানে একটি প্রাণীও জীবিত রইল না।

চেঙ্গিস খানের সর্বশেষ যুদ্ধ হয়েছিলো সিন্ধু নদের তীরে জালালুদ্দিনের সঙ্গে। সে যুদ্ধেও মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটে। ফলে তাদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনে এমন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যে, তাতারিদের কখনো পরাজয় হতে পারে এটা মুসলমানদের কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে পড়েছিলো।

মোটকথা, মুসলমানগণ তাতারী দূতদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করার ফলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মুসলমানদের উপর এমন প্রবল-প্রচণ্ড করে দিলেন যে, তাঁরা মুসলমানদের সালতানাতকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে দিয়ে গেল।

তাবলীগের বরকত

অতঃপর দম্ভের সাজা ভোগ করতে করতে মুসলমানদের অস্তিত্বের পিঠ যখন একেবারে দেয়ালে গিয়ে ঠেকলো, আল্লাহ্ পাক তখন দাওয়াত ও তবলীগী শক্তির প্রকাশ ঘটালেন। চেঙ্গিস খান তখন মৃত্যু বরণ করেছে। তার পুত্ররা ক্ষমতায়। রাশিয়ার রাজত্ব জুজির হাতে। গুবি মরুতে অবস্থিত কারাকোরামের

শাসনভার আফদারীনের হাতে। তৃতীয় পুত্র চুগতাইকে দেয়া হয়েছিল তুরকিস্তানের রাজ্যভার। আর চতুর্থ পুত্র তলওয়ায়ীকে দেয়া হয়েছিল ইরাক-ইরান-আফগানিস্তানসহ এতদঞ্চলের শাসনভার।

চেঙ্গিস খানের অনেক পরের কথা। তখন চলছিল তার পৌত্র হালাকু খানের যুগ। একমাত্র মিশর ছাড়া গোটা মুসলিম সম্রাজ্য তখন তাদের পদানত। হালাকু খান মিশর বিজয়ের মানসে যুদ্ধযাত্রার মনস্থ করলো। এ সংবাদে মুসলমানগণ একেবারে হতাশ হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে প্রতিরোধ বা প্রতিআক্রমনের কোন মনোবলই রইল না।

মুসলমানদের এই ক্রান্তিকালে আল্লাহ্ পাকের ভিন্ন এক নেযাম কার্যকর হলো—মিশরের তৎকালীন বাদশাহ্ রুকনুদ্দীন কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামাকে ব্যবসায়ীর সাজে তাতারীদের এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—অস্ত্র বলে তাতারীদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করা যেহেতু মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো, তাই দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে তাদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে যদি কোনভাবে মুসলমানদের চূড়ান্ত পতন রোধ করা যায়।

চেঙ্গিস খানের বড় পুত্র জুজির পৌত্র দরকা খান ছিল তৎকালীন রাশিয়ার অধিপতি। সে রাশিয়ায় তুর্কী মুসলীম ব্যবসায়ীগণ পণ্যবিক্রির পাশাপাশি দ্বীনের দাওয়াতের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন অক্লান্তভাবে। ফলে তাতারীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহন করতে লাগলো। সৌভাগ্যক্রমে নও মুসলীমদের সে দলে দরকা খানের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীও ছিল। সে কৌশলে রাজার কাছে ইসলামের সৌন্দর্য পেশ করতে লাগলো। একদিন দরকা খান জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কাছে এসব কথা কারা বলে যায়? মন্ত্রী বললেন, তুর্কিস্তানের সেই মুসলিম বণিকরা আমাদেরকে এসব কথা শুনিয়েছেন। দরকা খান বললো, তারা আবার আসলে আমাকে জানাবে। এক সময় মুসলিম বণিকদল পুনরায় রাশিয়ায় আগমন করলে তাদেরকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মুসলমানগণ তাঁকে কোরআনের মহাসত্যের কথা শোনালেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে হেদায়ত দান করলেন। ফলে তিনি ইসলামের সৌভাগ্য-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হলেন। রাজার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তাঁর প্রায় গোটা রাজ্যের অধিবাসীরাই ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। ওদিকে হালাকু খান মিসর আক্রমণ করার সংকল্প করলো। সে মিশর অধিপতি রুকনুদ্দীনের নিকট এই মর্মে পয়গাম পাঠালো যে, 'দেয়াল ভেঙ্গে দাও, দরজা খুলে দাও। একই যমিনের উপর দুই ব্যক্তির শাসন চলতে পারে না। আমার

কথা মেনে নিলে তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে। অন্যথায় নীলনদ তোমাদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।'

হালাকু খান তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলো। নুরুদ্দিন সে কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দরকা খানের নিকট পত্র লিখলেন। দরকা খান সে বিষয়ে অবগত হয়ে অনতিবিলম্বে হালাকু খানের নিকট এই মর্মে পয়গাম প্রেরণ করলেন যে, মিশর আক্রমণের পূর্বে তোমাকে আমার মোকাবেলা করতে হবে। এই বার্তা পেয়ে হালাকু খান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার মোকাবেলা কেন? তোমার কি চেঙ্গিস খানের সেই নীতির জানা নেই যে, তাতারীরা পরস্পর কখনো লড়াই করবে না?' জবাবে দরকা খান বললো, তুমি একজন কাফের, আর সেও ছিল একজন কাফের। কিন্তু আমি একজন মুসলমান। আজ তোমার আর আমার মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। এখন মিশর আক্রমণ করতে চাইলে তোমাকে প্রথমে আমার মোকাবেলা করতে হবে। দরকা খানের এ পয়গাম পেয়েও হালাকু খান যখন তার সঙ্কল্পে অটল রইল তখন দরকা খানও তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এবং পঞ্চাশ বছরের তাতারী ইতিহাসে এই প্রথম দুই তাতারীর তলোয়ার পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠলো। আর ইতিহাস বদলের এই বৈপ্লবিক ঘটনার পিছনে ভূমিকা ছিল কিছু সংখ্যক তাবলীগের অনুসারীর। নিরিহ কিছু দ্বীনের দায়ী'র।

প্রকৃত বিপ্লব

তাতারী জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন এবং এক ঐতিহাসিক বিপ্লব সূচিত হলো। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, রাজ্য নেই, রাজত্ব নেই। শূন্য হাতে এই বিপ্লব কীভাবে সম্ভব হলো! আসলে বিপ্লব ঘটে মানুষের হৃদয়ে। মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনই মূলতঃ তার মধ্যে বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন ঘটায়। দাওয়াতের সেই নবীওয়ালা আমলই তাতারীদের কঠিন হৃদয়ের কপাট ভেঙ্গে তাতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলো।

মানুষের হৃদয় জগতে যখন বিপ্লব ঘটে, সেখানে যখন পরিবর্তন সূচিত হয়, যখন মানুষের মন আল্লাহমুখী হয়ে ওঠে, তখন সতস্ফূর্তভাবেই তার জীবন-ধারায় এক বিপ্লব ঘটে যায়। মানুষের মাঝে যখন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক মানুষের মনের ভূমিকে কোমল করে দেন। সেখানে বিপ্লবের বীজ রোপিত হয় এবং তার মন ও মননে ক্রমশ আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর এভাবেই কোন স্থূল শক্তির সমর্থন ছাড়া আল্লাহ্ পাক এক তাতারীকে আরেক তাতারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

ওদিকে তৈমুর তুঘলক ছিল হালাকু খানের অধঃস্তন পুরুষ। জালালুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। সে বললো, এখনো আমি একজন গভর্নর মাত্র। যেদিন গোটা রাজ্যভার আমার হাতে আসবে সেদিন আসবেন। কিন্তু জালালুদ্দিন (রহ.)-এর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সে বাদশাহ্ হতে না পারায় তিনি স্বীয় পুত্র রশীদুদ্দীনকে বললেন, বেটা! আমি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। তৈমুর তুঘলক যখন বাদশাহ্ হবে তুমি আমার পয়গাম তার নিকট পৌছে দিও।

তৈমুরের ইসলাম গ্রহণ

তৈমুর বাদশাহ্ হবার পর তার রাজধানী মঙ্গোলিয়ার উদ্দেশ্যে রশীদুদ্দীন (রহ.) রওনা হলেন। কিন্তু সেই রাজমহলে পৌছার কোন উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। এক রাতে তিনি খুব জোড়ে ফজরের আযান দিলেন। আযান শুনে রাজার ঘুম ছুটে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কেমন সঙ্গিত? এমন জোড়ে জোড়ে কে চিৎকার করছে? তাকে ধরে নিয়ে আসো। সুতরাং তাকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দরবেশ সাহেব! আপনার পরিচয় কি?' তিনি বললেন, আমি জালালুদ্দীনের পুত্র রশীদুদ্দীন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি?' রশীদুদ্দীন বললেন, আপনি আমার পিতাকে বলেছিলেন, 'যখন আমি বাদশাহ্ হবো, তখন এসো'। আমি তার সেই দায়িত্ব পালন করতে এসেছি। তৈমুর তুঘলক বললেন, 'হ্যাঁ, এবার ইসলাম সম্পর্কে আমাকে বলো।' তিনি দাওয়াত দিলেন। ফলে তইমুর ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার এক উযীরকে ডাকলেন। তাকে বললেন, আমি তো ইসলাম গ্রহন করে নিয়েছি, তুমি কি বলো? উযীর বললো, আমি তো আরো আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। শুধু আপনার ভয়ে তা প্রকাশ করি নি। তৈমুরের উযীর ছিল চারজন। তাদের একজন মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। বাকি তিনজনকে ডেকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলো। ফলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। তারপর ডাকলেন, সেনাপতিকে। তাকে বললেন, 'আমি তো ইসলাম গ্রহন করে নিয়েছি, তোমার কি অভিমত?' সেনাপতি বললো, মুখের ভাষার চেয়ে তলোয়ারের ভাষাই আমার কাছে অধিক বোধগম্য। অস্ত্রের ভাষাই আমি বেশী বুঝি। আপনাকে যে ব্যক্তি ইসলামের দাওয়াত দিতে এসেছে, তাকে আমার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। সে যদি আমাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়, তবেই কেবল আমি ইসলাম গ্রহণ

করবো। অন্যথায় নয়। তৈমুর বললেন, এটা কীভাবে হয়। যে বিষয়কে জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, তা তুমি অস্ত্র দিয়ে বুঝতে চাইছো ?

সেনাপতি বললো, আপনি যাই বলুন, কোন কিছু উপলব্ধি করার জন্য আমার কাছে এই অস্ত্র ছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই। তখন রশীদুদ্দীন (রহ.) বললেন, ঠিক আছে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। তাঁকে বলা হলো, এটা ঠিক হবে না। কারণ, এই সেনাপতি তার গোটা জীবন যুদ্ধ আর অস্ত্র নিয়ে কাটিয়েছে। তার সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর। সবকিছু জেনে সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা অবশ্য আপনারই। তিনি বললেন, আমি লড়াই করবো।

সুতরাং পরদিন লড়াই হবে বলে শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেয়া হলো। রশীদুদ্দীন (রহ.) রাতে আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'হাত তুলে দু'আ করলেন—আয় আল্লাহ্! আপনার দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছি। এখন যদি আমাকে মারতে হয় মেরে ফেলুন। আর যদি দ্বীনের কাজ করাতে হয় তো আপনিই সে ব্যবস্থা করুন।'

পরদিন নির্দিষ্ট স্থানে গোটা নগর ভেঙ্গে পড়লো। সেনাপতি দু'টি লৌহ বর্ম পরিধান করে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। তার দু' হাতে দু'টি তরবারি। ওদিকে তার প্রতিপক্ষ রশীদুদ্দীন (রহ.)-এর হাতে একটি ক্ষুদ্র খঞ্জরও নেই। একেবারে শূন্য হাতে ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন সেনাপতি তাকে নিজের একটি তরবারি দিয়ে বললো, এই নাও অস্ত্র। রশীদুদ্দীন (রহ.) বাঁ হাতে সেই তরবারি তুলে নিয়ে ডান হাতে সেনাপতির বুকে এমন এক ঘুষি মারলেন যে সে তিন পল্টি খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে আসার পর সেনাপতি বলতে লাগলো, এক ঘুশিতেই আমি ইসলাম বুঝে গিয়েছি। লড়াইয়ের আর প্রয়োজন নেই।

অতঃপর বাদশাহ্ তৈমুরের হাতে সে দেশের দশলক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। মঙ্গোলিয়ায় তাঁর সমাধি এখনো বিদ্যমান আছে। যে সমাধির গায়ে লেখা আছে—'তাতার অধিপতির সমাধি—যার হাতে দশ লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহন করেছিলো।

তো দাওয়াত ও তবলীগের মেহনতকারী মুষ্টিমেয় কিছু লোক সেদিন উম্মতের উপর বিশাল ইহ্সান করে গিয়েছেন। তাতারীরা যদি তখন ইসলাম গ্রহন না করতো, তাহলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অগ্রযাত্রা রোখার মত কোন শক্তি সেদিন ছিল না। সে জাতি এমনই শক্তিশালী ছিল যে, ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে তারা ঘোড়ার পিঠে ছুটে বেড়াতে পারতো। খুব পিপাসা

কাতর হয়ে পড়লে ঘোড়ার পিঠে খঞ্জর বসিয়ে দিয়ে নির্গত রক্তের ধারা পান করে নিতো। এই ছিল তাদের পানীয়। এমন একটি জাতির মোকাবেলা বাহুবলে কেইবা করতে পারে। সেই দুর্জয় জাতিকে দাওয়াত ও তাবলীগের বরকতে আল্লাহ্ পাক মুসলমান বানিয়ে দিলেন। রাশিয়ার সে অঞ্চলের অধিবাসীরা আজো পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত আছে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! দাওয়াত ও তাবলীগের এই মহান কাজের গুরুত্ব ও আহমিয়াত আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। রাব্বুল আলামীন এই উম্মদের কাঁধে এক আজিমুশ্শান দায়িত্ব দিয়েছেন। এ জীবন একদিন শেষ হয়েই যাবে। চিরদিন দুনিয়াতে কেউ থাকবে না। তো এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা এমন কাজ কেন করে যাবো না, যা আমাদের উত্তরসুরীদের কামিয়াবীর পথ প্রশস্ত করে দিবে। আমাদের সন্তানদের পক্ষে দ্বীন ও ঈমানের পথে চলা সহজ হবে। আর আমাদের জন্য 'সওয়াব'-এর সিলসিলা চলতে থাকবে। সর্বোপরি নিজেদের ঈমানেরও হিফাযত হবে।

একটু বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আপনার আশপাশ আর প্রতিবেশের প্রতি একটু হামদরদীর নজর নিক্ষেপ করুন। আপনি আপনার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী মসজিদে আসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার কাছে হাতজোড়-অনুরোধ, যদি 'খতমে নবুওয়াত'-এর প্রতি আপনি সচেতন হোন, তাহলে আপনার ঘর, বাহির ও প্রতিবেশের লোকদেরকেও যে মসজিদে আনার দায়িত্ব আপনার রয়েছে, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করুন। আপনি যে গলি বা মহল্লায় বাস করেন, সেখান থেকে ক'জন লোক মসজিদে আসে, আর ক'জন আসে না সে বিষয়ে খোঁজখবর নিন। যারা আসে না তাদেরকে সালাম করুন, হাতজোড় করে মসজিদের দাওয়াত দিন। আপনার ঘরে ক'জন নামায পড়ে আর ক'জন পড়ে না, সে বিষয়েও একটু তত্ত্বতালাশ করুন। যারা পড়ে না তাদেরকে কিভাবে মসজিদে আনা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করুন। এটা জরুরী নয় যে, প্রথমে নিজের ঘর ঠিক করতে হবে, তারপর বাইরে দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। বরং ঘর বাহির উভয় ক্ষেত্রে একই সঙ্গে কাজ চলতে পারে। এটাই সুন্নত।

একটি ভুল চিন্তা

আমাদের মধ্যে একটি ভুল চিন্তা প্রচলিত আছে যে, 'প্রথমে নিজের ঘর সামলাও তারপর বাইরের কথা চিন্তা করো। আগে নিজের ঘরে দ্বীন কায়েম করো, তারপর অন্যদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিও'। এ চিন্তাটি সম্পূর্ণ ভুল। 'প্রথমে' শব্দটি ছাঁটাই করে দিতে হবে। দ্বীনের দাওয়াত ঘরে-বাইরে একই সঙ্গে

চলবে। না হলে 'বনু হাশেম'-এর লোকেরা মুসলমান হওয়ার পূর্বে অন্যদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতেন না। ইতিহাস বলে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী যিন্দিগীতে 'বনু হাশেম'-এর মাত্র গুটি কয়েক লোক ইসলাম গ্রহন করেছিলো—চাচা হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস (রাযি.), আর তাদের সন্তান হযরত আলী (রাযি.), হযরত জা'ফর (রাযি.) ও হযরত উকাইল (রাযি.)। এছাড়া তাঁর খান্দানের আর কেউ ইসলাম গ্রহন করে নি।

যদি নিয়ম এটাই হতো যে, তাবলীগ প্রথমে নিজের ঘরে করতে হবে, তারপর প্রতিবেশী, তারপর মহল্লাবাসী, এভাবে ক্রমান্বয়ে শহরবাসী, তারপর দেশবাসী ও বিশ্বব্যাপী—তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর গোটা জীবন মক্কাতেই অবস্থান করতে হতো। তিনি কখনো মদীনায় যাওয়ার সুযোগ পেতেন না। প্রথমে তিনি নিজ খান্দানের লোককে মুসলমান বানাতেন। তারপর কবীলার লোকজনকে, তারপর কোরায়েশীদেরকে। কোরায়েশীরা যখন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতো, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পেতেন না। অথচ গোটা মক্কায় মাত্র ২৫০ পঞ্চাশ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করার পর তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন।

হিদায়ত আল্লাহ্র হাতে

হিদায়ত একান্তই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্ পাক কাকে হিদায়ত দান করবেন আর কাকে বঞ্চিত করবেন একথা কারো জানা নেই। কাজেই মেহনত সকলের মধ্যেই করতে হবে। খোদানাখাস্তা নিজের সন্তানদের ভাগ্যে যদি হিদায়ত না থাকে, প্রতিবেশীদের সন্তানদের ভাগ্যে তো থাকতে পারে। কাজেই নিজের সন্তানরা ভাগ্যের ফেরে বঞ্চিত হলেও তো দ্বীনের আলো পেয়ে যাবে। যদি এমন হতো যে, নিজের সন্তানরা দ্বীন গ্রহণ না করলে অন্য কারো মাঝেই দ্বীনের মেহনত করা যাবে না, তাহলে তো হযরত নূহ (আ.)-এর পক্ষেও দাওয়াতী মেহনত করা সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁর পুত্র শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নি। তাহলে তিনি তো একথাই বলতেন যে, 'আমার সন্তানই যেখানে ইসলাম গ্রহণ করে নি, অন্যকে কীভাবে আমি দ্বীনের দাওয়াত দেবো ? আমার স্ত্রীই যখন মুসলমান নয়, তো আর কার স্ত্রীকে আমি ইসলামের প্রতি আহ্বান করবো ? প্রথমে তাকে মুসলমান করি তারপর অন্যদের কথা চিন্তা করা যাবে। কারণ কাউকে ঠিক করার দায়িত্ব আমার নয়।'

একথা সত্য যে, 'কাউকে ঠিক করার দায়িত্ব আমাদের নয়'। তবে ঠিক করার মেহনত করা যে আমাদের দায়িত্ব এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ডাক্তার কাউকে সুস্থ করে দিতে পারে না। কিন্তু রোগীকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সে কোনক্রমেই এড়িয়ে যেতে পারে না। কাজেই আমাদেরকে নিজের ঘরে, প্রতিবেশীর কাছে, মহল্লাবাসীদের মাঝে দ্বীনের মেহনত করে যেতে হবে। কারণ, কার ভাগ্যে হিদায়ত লিখা আছে, তা কে বলতে পারে?

হযরত বেলাল (রাযি.)-এর শোকর

হযরত বেলাল (রাযি.) বলতেন, আয় আল্লাহ্! আপনার শোকর যে, হিদায়তকে আপনি নিজ হাতে রেখেছেন। যদি তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে থাকতো, তাহলে তিনি তা প্রথমে বনু হাশেমকে দান করতেন। তারপর দিতেন কোরায়শের লোকজনকে। তারপর মক্কার আপামর জনসাধারণকে। জানি না তখন বেলালের নম্বর কখন আসত, কিংবা আদৌ তার ভাগ্যে হিদায়ত জুটতোই কি না! আমার মাওলা! আপনার শোকর যে, হিদায়ত আপনি নিজ হাতে রেখেছেন এবং তা যাকে ইচ্ছা দান করেছেন।

হযরত ওয়াহশী (রাযি.)-কে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তাকে যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করে দিবে'। সেই তিনি এক সময় কালিমা পড়ে মসজিদে নববীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে মাস্তক গোস্তাখী করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, মক্কার যেখানেই তাকে পাওয়া যাবে, গর্দান উড়িয়ে দিবে। তিনি এক সময় হযরত ওসমান (রাযি.)-এর খালাত ভাইয়ের নিকট এসে বললেন, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার বাই'আতের ব্যবস্থা করে দাও। আমি তওবা করছি। তো তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আরয করলেন, আয় আল্লাহ্র রাসূল! আব্দুল্লাহ্ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছে। আপনি তাকে বাই'আত করে নিন। এই প্রস্তাবের জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব রইলেন। তিনি পুনঃর্বার সেই অনুরোধ করলেন। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাই'আত করে নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে, তার গর্দান উড়িয়ে দেবার মত তোমাদের

মধ্যে কেউ কি ছিল না? হযরত ওসমান গণী (রাযি.)-এর খালাত ভাই বললেন, আয় আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো সেদিকে আমাদেরকে ইঙ্গিত করেন নি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, চক্ষু দিয়ে খেয়ানত করা নবীর জন্য বৈধ নয়। কিন্তু তোমরা যখন দেখতে পেলে যে, আমি তাকে বাই'আত করছি না, তখন তোমাদের কেউ কি এসে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে পারলে না! কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ যখন আন্তরিকভাবেই তওবা করে ফেলেছেন, তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে এমন সম্মান দান করলেন যে, তাকেই আফ্রিকা-বিজয়ী প্রথম মুসলিম সেনাপতি হিসাবে কবুল করলেন। এবং কোন সাহাবী হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় পদার্পণ করেন। অবশেষে তিনি মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন।

তার মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল অদ্ভুত। ফজর নামায পড়াচ্ছিলেন। ডান দিকে সালাম ফিরালেন। তারপর বা দিকে সালাম ফিরাতে ফিরাতে তিনি মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হলেন এবং সে অবস্থায়ই তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে পৌঁছে গেলেন।

মানুষের চরম মূর্খতা

মহান রাব্বুল আলামীন কার ভাগ্যে হিদায়ত রেখেছেন, কারো পক্ষেই তা জানা সম্ভব নয়। কাজেই দ্বীনের মেহনত সর্বত্রই করতে হবে। আমি যেমন আল্লাহ্ পাকের হুকুম মেনে চলবো, তেমনি আমার ভাই, আমার বোন, আমার পিতা-মাতা, আমার স্ত্রী-সন্তান সকলেই যেন আল্লাহ্ পাকের হুকুম মেনে চলতে পারে সে জন্য নিজের ঘরে মেহনত করতে হবে। তেমনি আমার প্রতিবেশী, আমার মহল্লাবাসী, নগরবাসী, দেশবাসী সকলেই যেন দ্বীনের অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ পাকের হুকুম মেনে চলতে পারে—একই সঙ্গে সে মেহনতও আমাকে করতে হবে। সে প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা করা হয়েছে নিজের ঘরে 'রোজানা মেহনত'--ঘরের তা'লীম। এটা হবে নিজের ঘরের জন্য দ্বীনের মেহনত। তারপর মহল্লাবাসী ও প্রতিবেশীদের জন্য মেহনত হিসাবে 'গাশ্‌ত' করুন। তিনদিনের জন্য সময় দিন। এটা আপনার শহরবাসীদের জন্য মেহনত। তারপর চিল্লা, তিন চিল্লার সফরে বেরিয়ে পড়ুন। এটা হবে আপনার দেশবাসীর জন্য মেহনত। এমনিভাবে বহির্মুলুকের জন্য 'সাল' বা 'সাত মাস'-এর সফরে বেরিয়ে পড়ুন। এটা হবে গোটা দুনিয়াকে সামনে রেখে দ্বীনের মেহনত। মেহনতের এই নেযামই হলো দাওয়াত ও তাবলীগের 'নকল' ও 'হরকত'। আর এই নকল ও হরকতের উদ্দেশ্য হলো—দুনিয়ার সমস্ত মানুষই যেন দ্বীনদার ও মেহনতওয়ালা

হয়ে যায়। ইনজেক্শন দিয়ে মানুষকে জুনায়েদ বুগদাদী বানিয়ে দেয়া যাবে, এমন কোন ইনজেক্শন দুনিয়াতে নেই। না হলে কোন ওলী-বুযুর্গের সন্তানই ফাসেক-গুনাহ্গার হতো না। কোন নবী-পুত্র নাফরমান হতো না। হযরত লূত (আ.)-এর ন্যায় একজন বড় মাপের নবীর স্ত্রীও কাফের থাকতো না। এই দ্বীন এমন একটা বিষয় যে, যে ব্যক্তি তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চাইবে না, আল্লাহ্ পাক তাকে সেধে তা দান করবেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিতে চাইবে, আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তাকে দান করবেন এবং তার কাছে হিদায়ত পৌছে দিবেন। হিদায়ত পাওয়ার জন্য 'তলব' (আগ্রহ ও চেষ্টা) থাকতে হবে। 'তলব' নেই তো আল্লাহ্ পাকের রহমতও মুখ ফিরিয়ে থাকবে।

কারো একবারের নেক নজরে 'দরিয়া পার' হবার ধারণাটি মানুষের মস্ত বড় ভুল। কোন বড় প্রফেসরের 'নেক নজর' নিক্ষেপের ফলে মেডিকেলের কোন ছাত্র ডাক্তার হয়ে গিয়েছে বলে তো শোনা যায় না। এমন কথা কেউ যদি বলেওবা মানুষ কি তা বিশ্বাস করবে? যেখানে 'এক নজর নিক্ষেপে' মানুষের পক্ষে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে তাকওয়া অর্জন বা মুত্তাকী হওয়া এমন কী সহজ কাজ ভেবেছেন যে, এক নজরে তা অর্জন করে ফেলা! আল্লাহ্র প্রিয় কি এভাবে হওয়া যায় যে, সুফি সাহেব এদিকে দৃষ্টি করলেন তো সকলে আলেম হয়ে গেলো। ওদিকে দৃষ্টি করলেন তো সকলে হাফেয হয়ে গেলো। দুনিয়ার বুকে এমনটি কি হয়েছে কখনো? ব্যাপার যদি এমন সহজই হতো, তাহলে আমাদের পক্ষে এখনো পর্যন্ত ইলম অর্জন করা সম্ভব হলো না কেন? এ হৃদয়ে ইল্ম ও কোরআনের 'আযমত কেন সৃষ্টি হলো না?

আমি যখন কলেজে পড়তাম, তখন ধারণা ছিল—ছয় মাসেই মানুষ মৌলবী হয়ে যায়। কিন্তু এখন দেখছি, ত্রিশ বছর পার হয়ে যাবার পরও কিছুই অর্জন হলো না। আসলে দ্বীনের আজমত দিল থেকে চলে যাওয়ার ফলেই দ্বীনের জন্য মেহনতের দস্তরও খতম হয়ে গিয়েছে। এখন 'এক নজর'-এর অপেক্ষায় সকলে বসে আছে। আল্লাহ্র বান্দারা! কিছু অর্জন করার জন্য নিজেকেও তো কিছু চেষ্টা করতে হবে। সন্তানকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানাবার জন্য তো তাকে ঠিকই স্কুলেই পাঠিয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে তো কোন বুজুর্গের নেক নজরের আশায় বসে থাকেন না। কারণ, আপনি জানেন যে, এটা অসম্ভব। তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে আপনার এই উদাসীনতা কেন?

আল্লাহ্ পাকের সুন্নত

মহান রাব্বুল আলামীনের সাধারণ সুন্নত বা নীতি হলো, তিনি মানুষের প্রাপ্তিকে তার মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যদিও আল্লাহ্ পাক মেহনত

ছাড়াই দিতে পারেন। যেমন নবীগণকে নবী হবার জন্য কোন মেহনত করতে হয় নি। নবী হবার জন্য কেউ মেহনত করেও না। নবুওয়াত মেহনতের সাথে সম্পৃক্তও নয়। নবীগণ সরাসরি আল্লাহ্ পাকের নির্বাচিত ব্যক্তি। হযরত মূসা (আ.) আগুনের সন্ধানে পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি আমার নবী। তো আল্লাহ্ পাক যদিও মেহনত ছাড়াই দিতে সক্ষম, কিন্তু এটা তাঁর নীতি নয়। তিনি কি আমাদেরকে ঘরে বসিয়ে রেখে রুটির ব্যবস্থা করতে সক্ষম নন? এটা কি তাঁর জন্য অসম্ভব? জান্নাতে একেকজন মানুষের মাথাই তো হবে গুম্বুজের মত বৃহদাকৃতির। তো তার মুখটা কত বড় হবে? একেকজনের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত (যিরা)। 'যিরা'-এর পরিমাণ হলো পঁচিশ ইঞ্চি। তাহলে একেকজন মানুষ প্রায় একশত ত্রিশ ফিট দীর্ঘ হবে। যে ব্যক্তির দৈর্ঘ হবে একশত ত্রিশ ফিট তার পেটটি কত বড় হবে? সে কী পরিমাণ আহার করবে? এত খাদ্য গ্রহণের পরও পায়খানা নেই, পেশাব নেই, হজমুলা নেই, কারমিনা নেই। তবুও সব হজম, সব হাওয়া। কোটি কোটি বছর খেতে থাকবে, তবুও কোন খাবারই বিস্বাদ মনে হবে না। খাবারের চাহিদাও হ্রাস পাবে না। মুখও ব্যথা করবে না, দাঁতও ভাঙবে না। তো আল্লাহ্ পাক সেখানে এমনই নেযাম করে রেখেছেন—মেহনত ছাড়াই সকলের জন্য এই বিপুল খাদ্যের ব্যবস্থা হতে থাকবে। সেই আল্লাহ্ এই দুনিয়াতেও এমন ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তা করা হয় নি। এখানে তিনি নিয়ম করেছেন, সামান্য একটা রুটি চাইলেও মেহনত করেই তা অর্জন করতে হবে। কেন এই নিয়ম ? জান্নাতের সেই সহজ নিয়ম কেন এখানে করা হলো না? কারণ—

لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض

যদি আল্লাহ্ পাক তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দান করতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। —*সূরা শূরা - ২৭*

আমি যদি তোমাদের জন্য বসিয়ে বসিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে দিতাম, তাহলে তোমরা সকলেই ফিরআউন হয়ে যেতে। এখন তো কিছু ভালো লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তখন গোটা দুনিয়া ফিরআউন দিয়ে ভরে যেত।

দিবেন তো আল্লাহ্ পাকই। কিন্তু পাওয়ার জন্য মানুষকে মেহনত করতে হবে। আমরা মাটির বুকে বীজ বপন করবো। আল্লাহ্ পাক সে বীজ অঙ্কুরিত করবেন। তা বৃক্ষে পরিণত হবে। ফুল আসবে। ফল ধরবে। তাঁর কুদরত কতই না অসীম! সরু এক লতার মধ্যে কী বড় বড় তরমুজ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন। তাতে লাল রঙ আর মিষ্টি রস ভরে দিচ্ছেন। লম্বা আখের বোতল মিষ্টি শরবত দিয়ে

পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এক বীজেই কয়েক বছর পর্যন্ত ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। বড় বড় শরবতের কোম্পানীরা তো বোতলের গায়ে Expire Date লিখে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র শরবত কখনো Expire হয় না। যখনই কাটবেন ঝরঝরিয়ে রস পড়বে।

আপনার বানানো হালুয়া ঘন্টা কয়েক যেতেই নষ্ট হয়ে যায়। আর দিন কয়েক থাকলে তো কথাই নেই, তাতে পোকা কিলবিল করতে আরম্ভ করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র হালুয়া কলার মধ্যে এমন সুরক্ষিত থাকে যে, যখন ইচ্ছা তখনই খেতে পারেন। দাঁতওয়ালা আর দাঁত ছাড়া সকলের পক্ষেই খাওয়া সম্ভব। মানুষের পক্ষে কলার মত এমন কোন ব্যবস্থা করা কি সম্ভব ? মোটেও না। তো যে আল্লাহ্ পাক এমন কুদরতের সাথে এই নেযাম পরিচালনা করছেন, তিনি আমাদেরকে বসিয়ে খাওয়াতেও সক্ষম। কিন্তু তাঁর নির্দেশ হলো, 'যাও, মেহনত করো। এতে তোমাদের জন্য পরীক্ষা রয়েছে—হারাম বর্জন করো, হালাল গ্রহণ করো। তো সে আল্লাহ্ পাক সকলকে এমনিতেও হেদায়ত দিতে পারেন। কিন্তু দ্বীনকে এত সস্তা মনে করবেন না যে, এক নজরেই তা অর্জন হয়ে যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত ইচ্ছা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বড় নজর আর কারো নিশ্চয় হতে পারে না। আবু তালেবের প্রতি তাঁর নজরের কি কোন অভাব ছিলো ? এমনকি তার জীবনের শেষ মুহূর্তে এসেও তিনি বলেছিলেন—আপনি শুধু একবার বলে দিন, তারপরের দায়িত্ব আমার। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত আকুতি সত্ত্বেও জবাবে তিনি কী বললেন ?

ভাতিজা! স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, তুমি পূর্বেও যেমন সত্যবাদী ছিলে আজও তেমনি আছো। আমি জানি, তোমার দ্বীনই সর্বোত্তম দ্বীন। এই দ্বীনের ন্যায় উত্তম দ্বীন দুনিয়াতে দ্বিতীয় আর নেই। কিন্তু আমি যদি তোমার কালিমা পড়ি, তাহলে কুরাইশের নারী সমাজ আমাকে এই বলে ধিক্কার দিবে যে, ভাতিজার কাছে নিজের দ্বীন-ধর্ম আর ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। কাজেই আমার পক্ষে তোমার কালিমা পড়া সম্ভব নয়।

আবু তালেবের মধ্যে দ্বীনের 'তলব' ছিল না। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'নজর'ও তার কোন উপকার পৌছাতে সক্ষম হয় নি। কাজেই আপনারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মেহনত করুন। নিজের উপর এই উদ্দেশ্যে মেহনত করুন, যাতে আপনার মন থেকে নাফরমানীর আগ্রহ দূর হয়ে সেখানে ফরমাবরদারীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নামাযের উপর মেহনত করুন। যাতে 'আল্লাহু

আকবার' বলে নামায আরম্ভ করার পর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কথা আপনার মানসপটে জাগ্রত না হয়। যেদিন তেমন নামায আপনার নসীব হবে, আল্লাহ্র কসম! দুনিয়ার সমস্ত নাজ-নেয়ামত আপনার নিকট অতি তুচ্ছ মনে হবে। দুনিয়ার এই আপাত চাকচিক্যের মধ্যে কী আর এমন মজা রয়েছে! নামাযে 'আল্লাহু আকবার' বলার পর যখন আপনার হৃদয়-তন্ত্রীতে শুধু আল্লাহ্র সুর বাজতে থাকবে, যখন আরশের দরজা খুলে যাবে, আর জান্নাতের হুরগণ সে দরজায় এসে দাঁড়াবে। অতঃপর আপনার 'আলহামদুলিল্লাহ্' আরশে পৌঁছে যাবে এবং উপর থেকে এই বলে জবাব আসবে যে, حمدنى عبدى (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে), বিনা তারের টেলিফোনে কথা শুরু হয়ে যাবে, যে ফোনের এক প্রান্তে রয়েছে বান্দা অন্য প্রান্তে তার মাওলা, এক প্রান্ত থেকে বলবে বান্দা, অন্য প্রান্ত থেকে বলবে মাওলা, তো এর চেয়ে মধুর আর কী হতে পারে?

সত্য বলতে কি, যদি এই অবস্থার এক কোটি ভাগের এক ভাগও আপনার নসীব হয়, আপনি তেমন সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত নাজ-নেয়ামত আপনার নিকট মাটির খেলনার মত তুচ্ছ মনে হবে। কিন্তু আফসুস! আমরা জীবনের পথের এমনই হতভাগা এক পথিক যে, পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবনে এমন একটি নামাযও নসীব হয় না। গোটা নামায তো দূরের কথা, একটি রাকাত, এমনকি একটি সজদাও তেমন নসীব হয় না।

আমলের উপর মেহনত করার প্রয়োজনীয়তা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদেরকে এজন্য মেহনত করতে হবে। যিকিরের উপর এমন মেহনত করুন, যাতে 'আল্লাহ্' বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মুখ মধুর মত মিষ্টি হয়ে যায়। জ্বলন্ত আগুনের উপর পানি ঢেলে দিলে তা যেমন নিভে যায়, তেমনি 'আল্লাহ্' নামের পানি দিয়ে যেন আপনার হৃদয়ের পাপের আগুনও নিভে যেতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের এমন যিকির অর্জন করতে পারবে, কাল কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্ পাকের আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। আল্লাহ্ পাকের সেই বান্দা, যে একাকী নির্জনে তাকে স্মরণ করবে, তার ভালবাসায় চোখের পানি বিসর্জন দিবে। গোটা দুনিয়া যখন ঘুমের ঘোরে অচেতন, মানুষ যখন স্ত্রী-আলিঙ্গনের আনন্দে বিভোর, তখন যে জায়নামাযে বসে রবের ভালবাসা সন্ধান করবে, মানুষ যখন গান-বাজনা নিয়ে মত্ত, তখন যে কুরআনের স্বাদ গ্রহণ করবে, কাল কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে।

বড়ই দুর্ভাগা জাতি আমরা। নিজেদের সব সম্বল হারিয়ে আজ আমরা নিঃস্ব-নিঃসম্বল। এ কারণেই দাওয়াত ও তাবলীগের এই মেহনত আমাদের উপর এক বড় ইহসান। আমাদের কত যুবক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভুলেও মসজিদের দিকে ফিরে তাকায় না। জুমার দিনে এই মসজিদে স্থান সঙ্কুলান হয় না। অথচ সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে এক-দেড় কাতার মুসল্লিও খুঁজে পাওয়া যায় না। যখনই আমার জুমা পড়াবার সুযোগ হয়, তখন অবশ্যই আমি এ বিষয়টি আলোচনা করি। উপস্থিত মুসল্লিদের লক্ষ্য করে বলি—আজ আপনারা কোথা থেকে উদয় হলেন ? আসমান থেকে নেমে এসেছেন না যমীন ফুড়ে বেরিয়ে এসেছেন ? আজ যে মসজিদের বাইরেও কাতার করতে হলো ? সপ্তার অন্য দিনগুলোতে কোথায় থাকেন আপনারা ? আপনাদের জন্য আল্লাহ্ পাক কি শুধু জুমাই ফরয করেছেন, আর অন্য সব নামায মাফ করে দিয়েছেন ? গোটা সপ্তায় আপনারা কি শুধু এই একদিনই আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত রিযিক গ্রহণ করে থাকেন ? আর বাকি দিনগুলোতে কি উপোস চলে যে, সপ্তায় মাত্র এক ওয়াক্ত নামায আদায় করছেন ?

আশ্চর্য আপনাদের কি জানা নেই যে, চব্বিশ ঘন্টাই আপনারা মহান রাব্বুল আলামীনের রিযিক ও ইহ্সান গ্রহণ করে চলেছেন—

বাতাস,

চন্দ্র-সূর্যের আলোক,

ফুলের সুবাস ও সৌন্দর্য,

এমনি আরো জানা-অজানা কত অসংখ্য নেয়ামত মানুষ প্রতিমুহূর্তেই ভোগ করে চলেছে। আল্লাহ্ কি এর বদলে আপনাদের নিকট হতে কিছু গ্রহণ করেছেন?

কাজেই সমস্ত অবহেলা ঝেড়ে ফেলে মসজিদের মেহনতের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। মসজিদের মেহনত হলো, আমাদের এই মহল্লায় যেন একজন লোকও বেনামাযী না থাকে। এজন্য প্রতিদিন মসজিদের পিছনে সময় দিন। এ কাজে প্রত্যেক নামাযীকেই সময় দিতে হবে এবং সকল যুবক-বৃদ্ধকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে।

বেলুচিস্তান সফর শেষে এক জামাত ফিরে এসে তাদের কারগুজারীতে বললো—প্রায় আড়াইশ' মাইল অঞ্চলে আমরা মেহনত করেছি। কিন্তু গোটা অঞ্চলে কালিমা জানে এমন এক ব্যক্তিরও দেখা পাই নি । এজন্যই আমার ভাই ও বন্ধুগণ! গোটা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতের রাস্তায় তুলে দেয়ার মেহনতে আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটা আমাদের

দায়িত্ব। এ কাজের জন্যই আমরা আপনাদের নিকট সময় চেয়ে থাকি।। আপনারা জান-মালের কুরবানী দিন। সে ব্যক্তিই সর্বাধিক মানব-দরদী বলে বিবেচিত হবে, যে ব্যক্তি মানুষের পিছনে পিছনে ছুটে তাদেরকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করে। আমাদের মৃত্যু যেন আজকের এই গাফলতির অবস্থায় এসে উপস্থিত না হয়—আল্লাহ্ পাকের নিকট এই আমাদের প্রার্থনা। এর জন্য সর্কলে মেহনত করুন। আল্লাহ্ পাক তওফীক দান করুন। আমীন।

—▣—

নামায ঃ এক অপরিহার্য ইবাদত

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم , اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم , فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم الا فعلموا انتم من الله علي حضر واعلموا انكم معرضون على اعمالكم , فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে আজ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মনচাহি জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মন যা চায়, তা যতই অসঙ্গত ও অবৈধ হোক না কেন, তা-ই তারা করে চলেছে। আর মন যা চায় না, তা যতই অবশ্য কর্তব্য হোক না কেন, সে দিকে ফিরেও তাকায় না। মানব সমাজের এই অধঃপতিত অবস্থা একদিনে হয় নি। বিগত কয়েক শতাব্দির ক্রমশঃ পতনের ধারাবাহিকতাই আজ আমাদেরকে এ অবস্থায় উপনিত করেছে। না আল্লাহ্, না রাসূল, না আখেরাত, কোন বিষয়ই আজ আর আমাদের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। কোরআনের ভাষায়— يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা আখেরাতের খবর রাখে না। (সূরা রূম-৭)। আজ দুনিয়ার দু'দিনের এই জীবনই আমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। মৃত্যুর পর আমাদেরকে যে অনন্তকালের এক জীবনের মুখোমুখী হতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের মোটেও আগ্রহ নেই। আর এই যমীন-আসমান, আরশ-ফরশ তথা গোটা সৃষ্টি জগতের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ পাক। তিনি যা চান, এ জগতে শুধু তা-ই হয়। আর যা চান না, তা কোনভাবেই হয় না। দুনিয়ার সমস্ত রাজা-বাদশারা তাদের অর্থবল আর অস্ত্রবলের যত বড়াই

করুক না কেন, তাদের ইচ্ছাতে গাছের একটা পাতাও নড়ে না। দুনিয়া-আখেরাত সর্বত্র প্রকৃত রাজত্ব একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের। তাঁর এই রাজত্ব আদিকাল থেকে আছে এবং অনন্তকাল তা স্বমহিমায় বহাল থাকবে। তাঁর এ রাজত্বের কোন বিনাশ নেই, লয় নেই, সমাপ্তিও নয়।

তাঁর এ রাজত্বের কোন অংশীদার নেই। না তাঁর কোন ছেলেমেয়ে আছে, না তিনি কারো থেকে জন্মলাভ করেছেন। সবকিছু তারই সৃষ্টি। কিন্তু তিনি নিজে সৃষ্টির মালিন্য থেকে পবিত্র। তার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। আর তিনি যা চান না, তা কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

ফিরআউন ও হযরত মূসা (আ.)

দুনিয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর আগমন প্রতিহত করার জন্য ফিরআউন বনী ইসরায়ীলের নবজাতকদেরকে হত্যা করার ফরমান জারি করেছিলো। সেই থেকে বনী ইসরায়ীলের সকল নব-ভূমিষ্ট পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলা হতে লাগলো। সে হত্যাযজ্ঞ ছিল এমনই ব্যাপক যে, শেষ পর্যন্ত তার কওমের লোকেরাই বলতে লাগলো—'এভাবে সব হত্যা করে ফেললে শাসন করবেন কাদের উপর ?' ফলে নতুন নিয়ম করা হলো—এক বছর জন্ম নেয়া সকল পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে এবং পরবর্তী বছর ছেড়ে দেয়া হবে। এই নিয়ম করার পর জীবিত রাখার বছর হযরত হারুণ (আ.) জন্মগ্রহণ করলেও হযরত মূসা জন্মগ্রহণ করলেন হত্যা করার বছর। আল্লাহ্‌র কী লীলা! যে বছর জন্ম গ্রহণ করা পুত্র সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হচ্ছিল, হযরত মূসা (আ.)-কে সে বছর সৃষ্টি করা হলে তাঁর জন্মপরবর্তী পরিস্থিতি এতটা জটিল হতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু আল্লাহ্‌র লীলা বুঝা মানুষের সাধ্য নয়। তিনি শিশু হযরত মূসা (আ.)-কে নদীতে ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে ফেরআউনের প্রাসাদের পাদদেশে। এক অকল্পনীয় ও অভাবনীয় পন্থায় আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। পুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর মা তাঁর প্রাণের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন। আল্লাহ্ পাক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না, আমি তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করবো يأخذه عدو لى و عدو له তাঁকে নদীবক্ষ থেকে এমন লোক উঠিয়ে নিবে যে, আমার এবং তাঁর শত্রু। একথা শোনে হযরত মূসা (আ.)-এর মা এই ভেবে আরো বিচলিত হলেন যে, যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এত আয়োজন, অবশেষে যদি তার হাতে গিয়েই পড়লো, তাহলে সে প্রাণে রক্ষা পাবে কীভাবে! উদ্বিগ্ন জননীকে শান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্ পাক

পুনরায় ইরশাদ করলেন— لاتخافى ولا تحزنى তার বিচ্ছেদ বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে বিচলিত হবার কিছু নেই। انا رادوه اليك দেখে নিও, অবশেষে তাকে আমি তোমার কাছেই ফিরিয়ে দিবো। وجاعلوه من المرسلين আর তোমার জীবদ্দশাতেই তাকে আমার রাসূল বানাবো। তোমার পুত্রের মুক্তি ও প্রাপ্তি দেখার আগে তোমার মৃত্যু হবে না। মূসা (আ.) চাই ফেরআউনের কোলেই যাক কিংবা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষিপ্ত হোক বা তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীবক্ষেই ভাসিয়ে দেয়া হোক, যখন আল্লাহ্ পাকের রক্ষা করার ইচ্ছা হবে, তখন আপাত ধ্বংসের সমস্ত উপকরণই তাঁকে রক্ষার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হতে থাকবে। সেই উপকরণ কখনোই তার মৃত্যুর কারণ হবে না। আর আল্লাহ্ পাক যদি কাউকে মৃত্যু দানের ইচ্ছা করেন, তাহলে হিফাজতের মজবুত উপকরণও মৃত্যুর আয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তিনি যদি সম্মান দিতে চান, তাহলে অসম্মানের উপকরণ দিয়েও সম্মানের মুকুট পড়িয়ে দেন। আর যদি কাউকে অসম্মানিত করতে চান, তাহলে সম্মানের সমস্ত আয়োজন ভেদ করে অসম্মান তাকে গ্রাস করে থাকে। কারো মাঝে প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি করতে চাইলে বিভেদ-বিরোধের সমস্ত উপকরণ থেকেই ভালবাসা উৎকীর্ণ হতে থাকে। আর শত্রুতা সৃষ্টি করতে চাইলে বন্ধুত্বের সমস্ত উপকরণ থেকেও শত্রুতা সৃষ্টি হতে থাকে।

নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.)

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! গোটা সৃষ্টিজগতের রাজত্ব একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের অধিকারে। তিনি যা চান, তাঁর সৃষ্টিজগতে শুধু তাই হবে। আর যা চান না, তা কোনভাবেই হবে না।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিদগ্ধ করার জন্য নমরূদ বিপুল আয়োজন করলো। রাজ্যের কাঠ-খড় এনে জড়ো করে এমন ভীষণ আগুন জ্বালিয়ে তুললো যে, সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়ে কোন পাখী উড়ে যাওয়ার সময় ঝলসে নীচে পড়ে গিয়ে ছাই হয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের দিনক্ষণ এসে গেল। কিন্তু আগুণের তাপ এমন প্রচণ্ড ছিল যে, তার ধারে-কাছেই যাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সেই অগ্নিকুণ্ডে কীভাবে নিক্ষেপ করা হবে নমরূদ তার কোন কুল-কিনারা করতে পারছিল না। কোন উপায়ান্তর না দেখে তারা নবী ইবরাহীম (আ.)-কে বললো, 'তুমি নিজেই হেটে চলে যাও'। ইবরাহীম (আ.) বললেন, 'আমি কেন যাবো ? তোমরা আমাকে জ্বালাতে চাচ্ছো, অতএব, অগ্নিকুণ্ডে আমাকে কীভাবে নিক্ষেপ করবে সেটা তোমাদের সমস্যা।' বিষয়টি নিয়ে নমরূদ খুব সমস্যায় পড়ে গেল।

তখন শয়তান তাদেরকে গুলতির মত একটি দূর নিক্ষেপক যন্ত্র তৈরী করে এনে দিল। ফলে তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বস্ত্রহীন অবস্থায় হাত-পা বেঁধে ওই যন্ত্রের সাহায্যে অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিক্ষেপ করে দিলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বাতাসে ভেসে অগ্নিকুণ্ডের দিকে উড়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিবরায়ীল (আ.) তাঁর ডান দিকে এবং পানির ফিরিস্তা বা দিকে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা এসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্যের আবেদনের ইন্তেজার করতে লাগলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) কারো দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। তিনি শুধু বলতে থাকলেন—

حسبی الله و نعم الوکیل

আল্লাহ্ পাকই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি কতই না চমৎকার কার্যনির্বাহক।

পানির ফিরিস্তা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকলেন যে, কখন তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করে আগুন নিভিয়ে দিতে বলবেন। এদিকে হযরত জিবরায়ীল (আ.)ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুমতির অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলছেন না দেখে তাঁর পরিণতির কথা ভেবে তিনিও বিচলিত হয়ে পড়লেন। এই ভীষণ আগুণে জ্বলে আল্লাহ্র নবী ছাই হয়ে যাবেন— এই চিন্তা তাঁকেও অস্থির করে তুললো। ফলে ব্যাকুল হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমি কি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি না ? এই বিপদ-মুহূর্তে আমাকে কি আপনার মোটেও প্রয়োজন নেই ? জবাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, সাহায্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু তোমার নয়। এমুহূর্তে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্রুত উড়ে যাচ্ছেন অগ্নিকুণ্ডের দিকে। এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি যখন দুই ফিরিস্তার কারো দিকেই ফিরে তাকালেন না, তখন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। অগ্নিকুণ্ডকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—

یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم

হে আগুন আমার ইবরাহীমের জন্য আরামদায়ক শীতল হয়ে যাও।

ফলে আগুন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য এক নিরাপদ ও আরামদায়ক আশ্রয়ে পরিণত হলো। আগুণের লেলিহান শিখাগুলো মাতৃস্নেহে তাঁকে নিজের বক্ষাশ্রয়ে তুলে নিল এবং মা যেমন নিজের বুকের শিশুটিকে পরম স্নেহের সঙ্গে দোলনায় শুইয়ে দেয়, তেমনি পরম যত্নে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে

জ্বলন্ত অঙ্গারগুলোর উপর বসিয়ে দিল। ফলে পরম সুখের সঙ্গেই তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান করতে লাগলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাণের দুশমন তাঁর পিতা আযর এ অবস্থা অবলোকন করে অজান্তেই বলে উঠলো— نعم الرب ربك يا ابراهيم হে ইবরাহীম! তোমার রবের কথা আর কী বলবো, তিনি তো ভারি যবরদস্ত দেখছি!

গোটা সৃষ্টি জগতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু মহান রাব্বুল আলামীনেরই সৃষ্টি এবং যাবতীয় বস্তু তাঁরই আজ্ঞাধীন। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতে এবং তাঁর নির্দেশেই চলে। সব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি যমীনকে যা বলেন সে তাই পালন করে। আকাশকে যা বলেন, সেও তাই তামিল করে। তদ্রূপ আগুন-পানি-বাতাসসহ গোটা সৃষ্টিজগত তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে চলতে বাধ্য।

মানুষের সুখ-দুঃখ আমলের উপর নির্ভরশীল

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দকে আল্লাহ্ পাক তার আমলের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছেন। তাঁর এ ফয়সালা গোটা দুনিয়ার সম্মিলিত শক্তির পক্ষেও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মানুষের আমল যখন মন্দ হয়ে যায়, আল্লাহ্ পাক তাঁর দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগৎই বিপর্যস্ত করে দেন। ধন-সম্পদ অতীতেও যেমন কাউকে আল্লাহ্ পাকের নিকট সম্মানিত করতে পারে নি, আজও তার সে ক্ষমতা নেই। অথচ সে ধোঁকায় পড়ে আজ আমরা 'মনচাহি' জীবন যাপন করছি। কোন্ কাজে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন আর কোন্ কাজে তিনি রুষ্ঠ হন, কী করলে তাঁর আযাবে গিরিফ্তার হতে হয়, আর কী করলে তাঁর মাগফিরাত লাভ করা যায়, এ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ফলে গোটা দুনিয়ার মানুষ আজ চরম বিপর্যয়কর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যে সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্ পাক অসন্তুষ্ট হন, গোটা দুনিয়া আজ সে সকল কর্মকাণ্ড দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। গোটা মানবসমাজ 'কবিরা' গুণাহ্য় আজ ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর আল্লাহ্ পাকও পবিত্র কোরআনের ভাষায় আমাদেরকে তাঁর নীতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন—

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم

بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।

—সূরা রূম - ৪১

তো অতীত পৃথিবীতেও কোন জাতি যখন আল্লাহ্ পাকের অবাধ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়তো, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের নেযামও তাদের বিপক্ষে চলতে আরম্ভ করতো।

হযরত নূহ (আ.)-এর যুগের মহা প্লাবনের ভয়াবহ ঘটনা

তো শোন! তোমাদের পূর্বে এ পৃথিবীতে এক জাতি ছিল, যাদেরকে 'কওমে নূহ' বা হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি বলা হত। গোটা যমীনকে তারা কুফরী আর নাফরমানী দিয়ে ভরে দিয়েছিলো। তাদের অবাধ্যতা এখানেই শেষ নয় ; বরং চরম ধৃষ্টতা দেখিয়ে আমার নবীকে তারা বলেছিলো—

فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين

'তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো, যদি সত্যবাদীই হয়ে থাকো, তো এনে দেখাও সে আযাব।' —*সূরা আ'রাফ - ৭১*

ফলে সত্যসত্যই একদিন সে ভয়াবহ দিনটি এসে উপস্থিত হলো—

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجرنا الأرض عيونا

فالتقى الماء على أمر قد قدر *

'তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবন। অতঃপর সব পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পিত কাজে।' —*সূরা নূহ - ১১-১২*

আকাশ থেকেও যেমন প্রবল ধারায় বর্ষণ হতে লাগলো, তেমনি যমীন ফুঁড়েও জলের ধারা বেড়িয়ে এসে ডুবিয়ে দিল গোটা চরাচর। আমি তফসীরের এক কিতাবে পড়েছি—আল্লাহ্ পাক সেদিন যদি কারো উপর দয়া করতেন, তাহলে ঐ মহিলাটির উপরই দয়া করতেন যে তার কোলের শিশুটিকে নিয়ে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে মহিলাটি সে দেশের সর্বোচ্চ পাহাড়ের শিখরে গিয়ে আরোহণ করলো। কিন্তু পানি ক্রমশ স্ফীত হয়ে সে পাহাড়টিও ডুবিয়ে দিল। তারপর তার পা এবং ক্রমশ বুক, গলা। মহিলাটি তার সন্তানকে দু'হাতে করে মাথার উপর উঁচিয়ে ধরলো। কিন্তু বানের প্রবল তোড় মা-সন্তান উভয়কেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এমনকি হযরত নূহ (আ.)-এর যে সন্তান পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলো, নবীর সামনেই তাকে ডুবিয়ে

দেয়া হলো। সে ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন—

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين

উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়ালো, ফলে সে নিমজ্জিত হলো।

—*সূরা হূদ - ৪১*

সে মহা দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিন ব্যক্তি একটি গুহার মুখ বন্ধ করে তাতে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাদের এমন প্রস্রাবের বেগ শুরু হলো যে, কিছুতেই তা দমন করা গেল না। ফলে সকলে প্রস্রাবে বসতে বাধ্য হলো। কিন্তু প্রস্রাব শুরু করার পর তা আর বন্ধ হলো না। অবশেষে নিজেদের প্রস্রাবেই তারা ডুবে মরলো।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! যে পাপাচারে 'কওমে নূহ্' লিপ্ত ছিলো, আজকের পৃথিবীর মানুষ ব্যাপকভাবে সে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি যেমন রুষ্ঠ হয়েছিলেন, আজ আমরাও তার যোগ্য হয়ে পড়েছি।

'আদ জাতির ধ্বংসযজ্ঞ

'আদ জাতি ছিল দেহ-কাঠামো ও শারিরীক শক্তির দিক থেকে বেশ প্রবল। তারা সেই শক্তি-মদে মত্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো। আর বড়াই করে তাদের নবীকে বলতে লাগলো—আমাদের মত প্রবল-প্রচণ্ড শক্তিশালী আর কে আছে যে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছো ? তুমি কী ছাই করতে পারবে করো। আমাদের তো মনে হচ্ছে আমাদের দেবতারা তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। সে ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ পাক বললেন—

اولم يروا ان الله الذى خلقهم هو اشد منهم قوة

'তারা কি লক্ষ্য করে নি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ?' —*সূরা হা-মীম-সজদা - ১৫*

আল্লাহ্ পাক তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক করার পরও যখন তারা সঠিক পথে ফিরে এলো না, বরং ঘাড় বাঁকা করে অহংকার আর নাফরমানীর পথেই চলতে থাকলো, তখন তিনি তাদের প্রতি নিজের আযাবের দরজা খুলে দিলেন। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হলো। তারা তো আমাদের মত ছোটখাটো মানুষ ছিল না। একেকজন ছিল ত্রিশ-চল্লিশ হাত দীর্ঘ সুস্থ-সবল দেহের অধিকারী। আট-নশ' বছরের দীর্ঘ জীবনে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন জড়া-ব্যাধি বা

বার্ধক্য ও দুর্বলতা তাদেরকে আক্রমণ করতো না। কারো দাত পড়তো না, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হতো না। তো তারা অনাহারে ভোগতে লাগলো। প্রবল-প্রচণ্ড ক্ষুধায় হালাল-হারাম যা ছিল সব খেয়ে শেষ করলো। কুকুর-বিড়াল, সাপ-বিচ্ছু যা হাতের কাছে পেয়েছে সবই খেয়ে সাবাড় করেছে। আকাশ থেকে এক ফোটা বৃষ্টিও ঝড়লো না। মাঠ-ঘাট সব ফেটে চৌচিড়। অবশেষে গাছের ডাল-পালা আর লতা-পাতা খেতে আরম্ভ করলো। কিন্তু সুদিন আর ফিরে এলো না। অবশেষে তারা একদল লোককে বাইতুল্লাহ্‌য় পাঠালো আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি চেয়ে আনার জন্য। তাদের স্বভাবই ছিল এমন—বিপদ আসলে আল্লাহ্-বিল্লাহ্ শুরু করতো। আর বিপদ কেটে গেলে আবার পাথর পুঁজায় লিপ্ত হতো।

যাহোক, আল্লাহ্ পাক তাদের মাথার উপর আকাশে তিন ধরনের মেঘমালা ফুটিয়ে তুললেন—সাদা, লাল এবং কালো। সেই মেঘমালা থেকে আওয়াজ আসলো—'তোমরা কোন্ মেঘ চাও।' তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো—সাদা মেঘে তো তেমন পানি থাকার কথা নয়, আর লাল মেঘের সঙ্গে থাকে প্রচণ্ড ঝর। শুধু কালো মেঘেই পানি পাওয়ার আসা করা যায়। অতএব, আমাদের কালো মেঘই চাই। উপর থেকে জবাব এলো—'পেয়ে যাবে।'

তারপর লোকগুলো দেশে ফিরে এসে সব ঘটনা খুলে বললো। সবাই একসঙ্গে হওয়ার পর আল্লাহ্ পাক সেই প্রতিশ্রুত বৃষ্টি পাঠালেন। পবিত্র কালামে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم * تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين *

'অতঃপর তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তার পালনকর্তার আদেশে সে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি।'

—সূরা আহ্‌ক্বাফ-২৪-২৫

এমন প্রবল-প্রচণ্ড ঝড় আরম্ভ হলো যে, পঞ্চাশ-ষাট ফিট লম্বা মানুষগুলো গাছের পাতার মত বাতাসে উড়তে লাগলো আর পরস্পরের মাথায় মাথায়

ঠোকাঠোকি খেয়ে তাদের মাথার খুলি ফোটে যেতে লাগলো। কিছু লোক দৌড়ে গিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো। বাতাস প্রচণ্ড বেগে সে গুহায় প্রবেশ করে তাদেরকে বের করে আনলো এবং গোটা 'আদ জাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে দিয়ে গেল। আল্লাহ্ পাক তখন বলেন— فهل ترى من باقيه দেখুন তাদের আর কাউকে দেখা যায় কি না? তাকেও পরিস্কার করে দিয়ে যাই। কিন্তু কাউকেই আর জীবিত পাওয়া গেল না। গোটা জাতিই ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

তো যে অপরাধের কারণে 'কওমে 'আদ' ধ্বংস হয়েছিলো, আজকের পৃথিবীর মানুষ ব্যাপকভাবে সে অপরাধ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি যেমন রুষ্ঠ হয়েছিলেন, আজ আমরাও তার যোগ্য হয়ে পড়েছি।

'কওমে সামূদ'-এর নাফরমানী ও আল্লাহ্র আযাব

তারপর পৃথিবীতে 'কওমে সামূদ' নামে এক জাতির উদ্ভব হলো। তারা শুনতে পেয়েছিলো যে, প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তাই পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে তারা নিজেদের আবাস গড়ে তুললো। এবং এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলো যে, বাতাস এখানে এসে তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তবুও নাফরমানী ত্যাগ করলো না। ফলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য বাতাস প্রেরণ না করে পাঠালেন এক ফিরিস্তা। তার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কালামে বলেন—

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين * فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون * وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون *

'তারা এক চক্রান্ত করেছিলো এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নেস্তনাবুদ করে দিয়েছি। এই তো তাদের বাড়ীঘর—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে

জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।' —*সূরা আন্-নাম্‌ল -৫১-৫৩*

ফিরিস্তা এসে এমন বিকট চিৎকার করলেন যে, সেই আওয়াজে গুহাগৃহের মধ্যে সকলে কলিজা ফেটে মৃত্যুবরণ করলো। গোটা কওমকে আল্লাহ্ পাক এভাবে ধ্বংস করে দিলেন।

কওমে শো'আইব (আ.)-এর ধৃষ্টতা

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কালামে আমাদেরকে কওমে শো'আইব (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তারা ছিল ব্যপারী জাত। আমাদের হাট-বাজারে যেভাবে আজকাল মাপে কম দেয়া এবং মিথ্যে বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সেকালে কওমে শো'আইব (আ.)-এর মধ্যে এ অপরাধকর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিলো। আর এভাবে গোটা দুনিয়ার ব্যবসা-বানিজ্যের নেতৃত্ব তারা নিজেদের হাতে নিয়েছিলো। তখন আল্লাহ্‌র নবী হযরত শো'আইব (আ.) তাদেরকে বললেন, 'তোমরা মাপে কম দিও না। সঠিক মাপে বেচাকেনা করো।' জবাবে তারা নবীকে বললো, আপনি মসজিদে গিয়ে বসে থাকুন, আমাদের ব্যবসাপত্রে নাক গলাতে আসবেন না। আপনার নামায কি একথা বলে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার তরীকা ছেড়ে আপনার তরীকায় ব্যবসা শুরু করি? আমাদের বাপ-দাদার দেবতাদের ত্যাগ করে আপনার রবের ইবাদত করতে আরম্ভ করি?

আজকেও যদি আপনি কাউকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবসা করতে বলেন, তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ প্রস্তাবের উত্তরে আপনাকে শুনতে হবে যে, 'তাহলে তো বিদ্যুৎ বিলের পয়সাই জোগাড় হবে না, ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হবে কোত্থেকে?' আমি একবার এক তেল বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি তেলে ভেজাল করেন কেন?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে ড্রাম প্রতি পাঁচশত টাকা থাকে। আর ভেজাল না করলে থাকে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে? এতে তো ডাল-ভাতের ব্যবস্থাই হবে না। পাঁচশ' টাকা না হলে আমার দৈনন্দিন প্রয়োজনাদি সচ্ছলতার সঙ্গে মেটানো দুরূহ।'

যাই হোক, হযরত শো'আইব (আ.)-এর কওম তাকে বললো—

أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في

أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد *

হে শোয়ায়েব (আ.), আপনার নামায কি আমাদেরকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করতো? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক।

—সূরা হূদ - ৮৭

দেখুন, আমাদেরকে আর ওয়াজ শুনাতে আসবেন না। আপনি আপনার তাবলীগ নিয়ে গিয়ে ঘরে বসে থাকুন। আমাদের তা প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে আমাদের মত চলতে দিন। তো আজকের মুসলমানরাও সেই একই মানসিকতা পোষণ করছে। তারাও বলে—'মিথ্যা না বললে ব্যবসা চলে না? সুদ এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা না থাকলে কারবার অচল হয়ে পড়বে।' আমার ভাই ও বন্ধুগণ! দুনিয়াতে আমাদেরকে তো ব্যবসা করার জন্য পাঠানো হয় নি। আমাদের জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মোটেও ব্যবসায়িক সাফল্য নয়। বরং আমরা দুনিয়াতে এসেছি মহান রাব্বুল আলামীনকে রাজি ও খুশী করার জন্য। এখন তাঁকে রাজি করতে গিয়ে যদি আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই হবো। আর যদি লাভবান হই, তবে তো আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ পাকের বরকত! জেনে রাখুন, নিজের এবং পরিবারের লোকদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেই হবে, তা হালাল-হারাম যে উপায়েই হোক না কেন—এমন নির্দেশ আমাদেরকে মোটেও করা হয় নি। বরং হালাল উপায়ে উপার্জন এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত তরীকায় খাদ্যগ্রহণের জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। তাতে যদি দু' পয়সা উপার্জিত হয় খাবো, আর না হলে না খেয়ে থাকবো। সন্তানদেরকে বলবো, তোমাদের জন্য দু' মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করার সাধ্য তোমাদের বাবার নেই। আর তোমাদের জন্য হারাম উপায়ে উপার্জন করে আমি জাহান্নামের আগুণ বরদাশ্‌ত করতে পারবো না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর মৃত্যুমুহূর্ত

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর ছিল বারো জন পুত্র সন্তান। তাঁর মৃত্যুমুহূর্তে শ্যালক মুসলিমা বিন আব্দুল মালিক বললো—'আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সন্তানদের প্রতি বড় অন্যায় করেছেন। আপনি তাদের জন্য যে সম্পদ রেখে যাচ্ছেন, তা জনপ্রতি দু' দিরহামের বেশী নয়। আফসোস্! তাদের জন্য আপনি কিছুই করে গেলেন না।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) তখন বিষক্রিয়ায় যথেষ্ট অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। তাকে বসিয়ে দেয়া

হল। তখন বলতে লাগলেন—শোন, আমি আমার সন্তানদের মুখে হারাম খাদ্য তুলে দেই নি। আর হালাল কিছুর ব্যবস্থা আমার কাছে ছিলও না। তাছাড়া তাদের জন্য কিছু রেখে যাওয়া আমার জন্য তো অপরিহার্যও নয়। মুসলিমা ইবনে আব্দুল মালিক তখন বললেন, ঠিক আছে আমি আপনাকে এক লাখ দিরহাম দিচ্ছি। সে দিরহাম আপনি সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এ প্রতিশ্রুতি কী যথার্থ। মুসলিমা বললেন, হা। খলীফা তখন তাকে বললেন, তুমি যাদের কাছ থেকে ঘুস হিসেবে বা অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করেছ, তাদেরকে হিসেব করে সব ফিরিয়ে দাও। আমার সন্তানদের তোমার টাকার মোটেও প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি তাঁর সন্তানদেরকে উপস্থিত করতে বললেন। সকলে এসে উপস্থিত হলে তিনি বললেন—'আমার সন্তানরা! আমার সামনে দু'টি পথ খোলা ছিল—হয় তোমাদের জন্য বিপুল ধন-সম্পদ রেখে যেতাম, সেটা হালাল হোক চাই হারাম। আর তার বদলে আমি জাহান্নামে যেতাম। আর দ্বিতীয় পথটি হলো—আমি তোমাদেরকে তাকওয়া শিখাবো এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চেয়ে নেয়া শিখাবো। আর তার বদলে আমি জান্নাতে যাবো। আমার সন্তানরা! তোমাদের এই পিতার পক্ষে জাহান্নামের আগুন বরদাশ্‌ত করা সম্ভব ছিল না। তাই আমি তোমাদের মুখে হারাম খাদ্য তুলে দেই নি এবং তোমাদের জন্য হারাম সম্পদও সঞ্চয় করি নি। আমি তোমাদেরকে দ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ, তাকওয়া শিখিয়েছি এবং প্রয়োজনে আমার রব আল্লাহ্‌ পাকের নিকট প্রার্থনা করতে শিখিয়েছি। আমার আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে— وهو يتولى الصالحين 'আমি পূণ্যবানদের বন্ধু'। তারপর শ্যালককে উদ্দেশ্য করে বললেন, মুসলিমা! আমার ছেলেরা যদি নেক থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ পাক নিশ্চয় তাদেরকে ধ্বংস করবেন না। আর তারা যদি নাফরমান হয়ে যায়, তাহলে তাদের ধ্বংস নিয়ে আমি চিন্তিত হবো না।

তারপরের ইতিহাস মানুষের সামনেই রয়েছে। শাহজাদা মুসলিমা আর সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের সন্তানরা, যাদের একেক জনের জন্য সে জমানায় তাদের পিতারা দশ লক্ষ দিরহাম করে রেখে গিয়েছিলেন, এক সময় মসজিদের শিড়িতে বসে ভিক্ষাবৃত্তি করতো। আর ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর সন্তানরা, যিনি তাদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, এক এক মজলিশেই শত শত ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিতেন।

তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের প্রথম পরিচয় হলো আমরা মুসলমান। আমাদের এই পরিচয় সবার উপরে ও সব পরিচয়ের শীর্ষদেশে। এ

পরিচয় ঠিক রেখে তারপরেই আমরা ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, অফিসার, সন্তানের পিতা, কেউ স্বামী, কেউ স্ত্রী এবং কেউ মা। আল্লাহ্ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আর সবকিছু কুরবান করার নির্দেশ রয়েছে আমাদের উপর। নিজের খাহেশ পুরণ করার জন্য আল্লাহ্ পাকের কোন হুকুম অমান্য করা যাবে না। আমাদের উপর নির্দেশ হলো যেন আমাদের বাজার 'কওমে শোয়ায়েব'-এর বাজারের ন্যায় না হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ শোনে আমাদের বাজারের লোকেরাও উপহাস করে বলে—'তাহলে আমাদের ব্যবসা কীভাবে চলবে? আমরা খাবো কী? বাচ্চাদের প্রয়োজনই বা মেটাবো কীভাবে? তাদের স্কুল ফী, বাড়ী ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল এসমস্ত খরচ আসবে কোথেকে ? তাহলে তো আমাদের মরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না।' শুধু হালাল কামাই নিয়ে বসে থাকলে তো আমাদের ডাল-ভাতেরই ব্যবস্থা হবে না। এ ছিল 'কওমে শোয়ায়েব'-এর জবাব—'আমরা কী খাবো?' আজ আমরাও তেমনি বলছি—আমরা মসজিদে যাবো, নামায পড়বো, জুমা পড়বো, কিন্তু তুমি আমাদের বাজারে এসো না। কারণ, তাহলে হয়তো তুমি আমাদেরকে মিথ্যা, সুদ, খেয়ানত থেকে বাধা দেবে। এগুলো বাদ দিলে আমাদের ব্যবসা চলবে কীভাবে?

আল্লাহ্ পাকের তিন আযাব

হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কওমের লোকজনের অপরাধ ছিল তিনটি—প্রথমতঃ তারা ছিল কাফির। তার উপর তাদের মধ্যে সততা ছিল না এবং তারা অন্যের হক মেরে খেত। এজন্য আল্লাহ্ পাক তাদের উপর তিনটি আযাব নাযিল করেন। ভূমিকম্প, চিৎকার এবং অগ্নিবৃষ্টি।

আমাদের জামাত একবার হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কওমের এলাকায় সফরে গিয়েছিলো। সে এলাকাটি এত ঠাণ্ডা যে, তখন গোটা এলাকা প্রায় তিন ফিট বরফের নীচে আচ্ছাদিত ছিল।

আল্লাহ্ পাক প্রথমে সে দেশে একটি গরম বাতাসের প্রবাহ সৃষ্টি করেন। এতে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তারপর আসে এক শীতল বাতাস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সকলে বেরিয়ে আসে। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায়। সকলেই খুশী হয়। কিন্তু পরপরই আরম্ভ হয় ভূমিকম্প, ফিরিস্তার বিকট চিৎকার এবং কালো মেঘ হঠাৎ লাল হয়ে শুরু হয় অগ্নিবর্ষণ। গোটা কওম এবং তাদের হাট-বাজার পুরে ছাই হয়ে যায়।

আজ আমার আশঙ্কা হয়, যদি আমাদের বাজারের লোকগুলো তওবা না করে, তাহলে আমাদের হাট-বাজারেও না আবার সেই রকম অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হয়। আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে তো আমাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই যে, তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় আমাদেরকে রক্ষা করবেন। তাহলে তার আযাব থেকে আমরা এত নিশ্চিত হয়ে থাকি কীভাবে ?

হালাল হারাম বিচার করে চলা উচিত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—এমন একটা সময় আসবে যখন আমার উম্মতরা বিলাশপ্রিয় হয়ে পড়বে এবং অহংকার ও অর্থহীন কাজে লিপ্ত হবে। নাচ-গাচ ও এ জাতীয় অসঙ্গত আচরণ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হবে। তখন এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তারা বানর ও শুকরে পরিণত হবে। আর এটা একারণে হবে যে, তারা হারামকে হালাল করে দিবে, সুদ খাবে এবং পুরুষরা রেশমের পোষাক ও স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধান করতে থাকবে।

সোনার অলংকার পরিধান করে যে কী লাভ জানি না, এবং এ অলংকার পড়ে যে কী পাওয়া যায় তাও বোধগম্য নয়। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তোষ যে উৎপাদন করা হয় তাতে সন্দেহ নেই। এই অকারণ অবহেলায় নিজেদের দ্বীন ও ঈমান ধ্বংস করে আল্লাহ্ পাকের অসন্তোষ উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের কত বড় ক্ষতি যে করা হচ্ছে, এসম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আক্ষেপ করে বললেন—আহা! আমার উম্মতের যুবকরা যদি রেশমের পোশাক ও স্বর্ণের অলংকার পরিধান না করতো! অথচ আজ কত যুবক শুধু সখের বশে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করছে, কেউবা স্বর্ণের চেইন গলায় পরিধান করছে। কিন্তু এযে কত বড় হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ একবারও তা ভেবে দেখছে না। এর শাস্তি যে কত ভয়ঙ্কর সে কথাও তাদের জানা নেই। কাজেই যেমন ইচ্ছা তেমনই চলছে তাদের জীবন-গাড়ি।

তো যখন হারামকে হালাল মনে করা হবে, মানুষ সুদ খাবে, রেশম পরিধান করবে, স্বর্ণ ব্যবহার করবে, শরাব পান করবে, গান-বাজনায় মত্ত হবে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি উদাসীন হয়ে যাবে, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ থাকবে না, ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাবে, বড়-ছোটর মাঝে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক থাকবে না, তখন তাদেরকে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হবে।

উম্মতের চিন্তা

কোরআন তো মানুষের এই পরিণতির কথা জানিয়ে দিলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই উম্মতের চিন্তায় জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কেঁদে ভাসিয়েছেন। যার বেচয়নী ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ্ পাক তাঁকে শান্ত্বনা দেবার জন্য হাজার বার হযরত জিবরায়ীল (আ.)-কে তাঁর নিকট প্রেরণ করেছেন। যাকে আশ্বস্ত করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনকে কোরআনের আয়াত পর্যন্ত নাযিল করতে হয়েছিলো--'আপনি এত কাঁদছেন কেন?'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শান্ত্বনাদান মূলক কোরআনে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, আমি একবার সে আয়াতগুলো একত্রিত করেছিলাম। তার সংখ্যা শতাধিক ছিল। যাই হোক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল কেয়ামতের দিন আমাদের নাফরমানীর স্তুপ দেখতে পেয়ে চরম আক্ষেপের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের নিকট অভিযোগ করে বলবেন—

يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

আয় আমার মাওলা! এই হলো আমার সেই কওম, যারা কোরআনকে ত্যাগ করেছিলো। কোরআন তাদেরকে মসজিদের দিকে আহ্বান করতো। কিন্তু তারা এমনই বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলো যে, মসজিদের পথটাই ভুলে গিয়েছিলো।

এই মজলিশে উপস্থিত লোকের সংখ্যা গোটা এলাকার কত শতাংশ হবে? মজলিশের বাইরে এই যে শত শত লোক রয়েছে, তারা কেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে আসে না? কোথায় যায় তারা তখন? সপ্তার বাকী ছয়দিন কি তারা এই দুনিয়ায় থাকে না? তারা কি শুধু জুমার দিনই আল্লাহ্র প্রদত্ত রিযিক গ্রহণ করে থাকে? শুধু সেদিনই কি তারা আল্লাহ্র পানি পান করে আর আল্লাহ্র দেওয়া এই আলো-বাতাস গ্রহণ করে? শুধু সেদিনই তারা আল্লাহ্র দেয়া চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সেবা গ্রহণ করে? এই সূর্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না আর আকাশ ভরা তারকার ঝলমল তাদের জীবনে শুধু কি ঐ একটি দিনেই আলোক বিকিরণ করে থাকে? হায়! এদের অন্তর যে পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে গেল!

শাহজী (রহ.) এবং কোরআন

সাইয়্যেদ শাহ্ 'আতাউল্লাহ্ বুখারী (রহ.) বলতেন, 'ওহে হিন্দুস্তানবাসীরা! তোমাদের কী হলো! তোমাদেরকে এত কোরআন শোনালাম, তারপরও কোন

পরিবর্তন নেই! এই কোরআন যদি শীতকে শোনাতাম তাহলে তা বসন্তে রূপ নিত। যদি পাথরকে শোনাতাম তা মোম হয়ে যেত। উত্তাল সমুদ্রকে শোনালে ঝঞ্ঝা থেমে যেত। কিন্তু তোমরা যে কোন্ মাটি দিয়ে সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তোমাদের বুকের খাঁচায় মন নেই, আছে একটা পাথর। আসলে তোমাদের ঐ মনটা পাথরের চেয়েও কঠিন। কারণ, আল্লাহ্ পাকের ভয়ে পাথরও কেঁপে ওঠে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না। তোমরা যে কেমন মানুষ, বুকের মধ্যে একটা পাথর নিয়ে ঘুরে বেড়াও।

নামাযই মুক্তির উপায়

গোটা জগতের বাদশা দিনে পাঁচবার আপনাদেরকে আহ্বান করছেন— حى على الصلوة (নামাযের জন্য আস), সে আহ্বান আপনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। অথচ থানার দারোগা সাহেব এসে যদি ডাকেন, তাহলে তো সকলেই লেজ উঁচিয়ে দৌড় লাগাবেন। ডিসি সাহেব যদি ডাকেন, তাহলে ব্যস্ত তা যতই গুরুতর হোক, সব ফেলে রেখে ছুটে যাবেন। কিন্তু এই আসমান-যমীনের মালিক মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ্ পাক যে প্রতিদিন পাঁচবার আপনাদেরকে ডাকছেন, সেই ডাক শোনার মত অবসর আপনাদের নেই। কেন এই অবজ্ঞা ও অবহেলা? আল্লাহ্র দেয়া রিযিক দিয়ে কি প্রতিদিন আপনাদের উদর পূর্ণ হয় না? বেঁচে থাকার জন্য কি আল্লাহ্র আলো-বাতাস গ্রহণ করেন না? তবে কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা? যে আল্লাহ্র খেয়ে-পড়ে বেঁচে আছেন, সেই আল্লাহ্র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, এ আপনাদের কেমন ইন্সাফ! যিনাকে গুনাহ্ হিসাবে স্বীকার করেন, হত্যা করাকে বড় গুনাহ্ মানতেও আপনাদের আপত্তি নেই। কিন্তু নামায ত্যাগ করা যে এসব গুনাহ্র চেয়েও বড় গুনাহ্ সেকথা কি আপনাদের জানা নেই? শয়তান এত বড় অপরাধী হয়েছে তো কেবল সিজদা করতে অস্বীকার করেই। সে তো কারো সঙ্গে যিনাও করে নি, কারো হকও মেরে খায় নি। শুধু একটি সিজদা করতে অস্বীকার করেছিলো। যার ফলে চিরদিনের জন্য তাকে 'মারদূদ' হতে হয়েছে। আর নির্বোধ মুসলমানের এইটুকু হুঁশও নেই যে, প্রতিদিন তারা পাঁচবার অন্ততঃ বিশটি সিজদা অস্বীকার করে চলেছে। তারপরও নিশ্চিন্তে রুটি-গোশ্ত খেয়ে যাচ্ছে। শীতের সকালে মিঠে রোদে বসে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে। বন্ধুদের আড্ডায় হাসির ফোয়ারা ছুটছে। আর প্রেয়সীকে নিয়ে আনন্দের ভেলায় ভেসে বেরাচ্ছে।

একটি মাত্র সিজদা ত্যাগ করে শয়তান চীরদিনের জন্য 'মারদূদ' হয়েছে।

আর যে ব্যক্তি ফজরের সিজদা করলো না। জোহরের সিজদাও হাসি-তামাশায় উড়িয়ে দিলো। আসরও হেলায়-খেলায় কেটে গেলো। মাগরিব, এশা কোন নামাযই তার পড়া হলো না, সে এমন নিশ্চিন্ত থাকে কেমন করে? মসজিদে না যাও, ঘরে তো অন্ততঃ পড়তে পারো—যদিও তাতেও নামাযের সঙ্গে উপহাসই করা হয়। শুধু জুমার দিনে গিলে করা পাঞ্জাবী আর ভাঁজ করা টুপিটা মাথায় দিয়ে মসজিদ মুখো হলেই বুজি নিজের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলো? গোটা সপ্তায় যে ব্যক্তি এতগুলো সিজদা অস্বীকার করেছে, তার মনে একবারের জন্যও কি এ আশঙ্কাটা জেগে ওঠে না যে, আল্লাহ্ পাক তাকে 'মারদূদ' বলে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারেন? যদি দেন, তাহলে কী অবস্থা হবে তার?

যে নফসের কারণে আজ আল্লাহ্র সঙ্গে 'বাগাওয়াত' করছো, যেই গরম আর ঠান্ডার ছুঁতোয় মসজিদে আসা ছেড়ে দিচ্ছো, অন্ধকারের উসিলা দিয়ে নামাযে আসছো না, তা কি কবরের গরম ও ঠান্ডার চেয়ে বেশী হয়ে গেলো? কবরের অন্ধকারের চেয়েও তোমার কাছে এই অন্ধকার বড় মনে হল? জাহান্নামের আগুন আর আযাবের কথা কি কখনো ভেবে দেখেছো? জান্নাতের নেয়ামত আর আল্লাহ্র কালাম ভুলে গেলে? আল্লাহ্ পাকের দীদার ও সাক্ষাতের কথা ভুলে গেলে? সেই মাহ্বুব আল্লাহ্র মাহ্ফিলের কথা ভুলে গেলে? এটা তোমাদের কেমন ইসলাম? তোমাদের হৃদয় এমন পাথর কেন হলো যে, দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হলে আর দ্বীনের খবর থাকে না। মসজিদ থেকে যখন আল্লাহ্ পাকের ডাক আসে, তখন কী যুবক, কী বৃদ্ধ, কী যুবতী, কী বৃদ্ধা, সকলেই গাফলতির নিদ্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সরকারের কাছ থেকে দাবী আদায়ের জন্য তো দিনের পর দিন হরতাল করে দোকান বন্ধ করে রাখা যায়। কিন্তু গোটা জীবনে নামাযের জন্যও কি কখনো দোকান বন্ধ রেখেছেন ? যদি রাখতেন, তবে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে সকল জুলুম থেকে হেফাযত করতেন। কারো জুলুমের হাত না আপনাদের মালের প্রতি অগ্রসর হতে পারতো, না আপনাদের ইজ্জতের প্রতি অগ্রসর হতে পারতো।

আল্লাহ্র খেয়ে আল্লাহ্র পড়ে, আল্লাহ্র তৈরী বীর্য থেকে জন্ম নিয়ে সেই আল্লাহ্র সঙ্গেই অবাধ্যতা! এ ধৃষ্টতাকে কি কোন স্তর-বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। আল্লাহ্র ঘর মসজিদ থেকে আপনাদেরকে কি শুধু জুমার দিনেই ডাকা হয়? সপ্তাহের আর কোন দিনই কি আপনাদের কানে সে আহ্বানের আওয়াজ পৌঁছে না? এমন বান্দাদের লক্ষ্য করেই তো যমীন আল্লাহ্ পাকের নিকট তাদেরকে ধ্বংস করে দেবার অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে। সমুদ্র তাদেরকে ডুবিয়ে দেবার এবং ফিরিস্তারাও আযাব নিয়ে তাদের উপর নেমে আসার

অনুমতি চেয়ে থাকে। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক জোশে এসে বলেন—আমার তৈরী এক ফোটা নাপাক পানি দিয়ে যাদের সৃষ্টি, আমার তৈরী খাদ্য খেয়ে, আমার তৈরী ভাত-মাছ খেয়ে যারা জীবন ধারণ করে, তারাই আমাকে অস্বীকার করছে ? আমার নাফরমানীতে ডুবে গেছে? সামান্য পনেরশ' টাকা মাইনের চাকর যদি ঠিক সময়ে তাদের সামনে চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে না দেয়, তবে তো সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হয়—রাস্তা দেখতে পারো। সেই মানুষ আমার অফুরন্ত ইহ্সান ভোগ করার পরও নিরন্তর নাফরমানি করে চলেছে।

আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত

যে আল্লাহ্ মানুষকে এত সুন্দর দেহ দান করলেন। দু'টি চোখে আলো জ্বালিয়ে জীবনকে আলোকময় করে দিলেন। কানে বসিলে দিলেন দু'টি শ্রবণ-যন্ত্র। হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে পাম্প করে গোটা দেহে রক্ত প্রবাহের ব্যবস্থা করলেন। ফুসফুসে রক্ত শোধনাগার বানালেন। হাড়ে হাড়ে মগজ তৈরী করলেন। জিহ্বায় কথা বলার শক্তি দিলেন। দাঁতে দিলেন কাঁটার শক্তি। একই নালিপথে খাদ্য ও শ্বাস। মাঝপথে এক কুদরতী ব্যবস্থাপনায় সেগুলোর পথ ভীন্ন করে দিলেন। যখন শ্বাস গ্রহণ করা হয় তখন খাদ্যনালী বন্ধ। আবার যখন খাদ্য গ্রহণ করা হয় তখন শ্বাসনালী বন্ধ। তারপর এক অকল্পনীয় উপায়ে সে খাদ্য থেকে নির্জাস গ্রহণ করে তা থেকে রক্ত তৈরী করেন। সে রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন সচল রাখেন। গোটা দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কর্মক্ষমতা দান করেন। নরম ত্বক থেকে বের হয়ে নখ কীভাবে শক্ত হয়ে ওঠছে। এই নখ পরিমাণ থেকে একটু বেশী কেটে ফেললে কত যন্ত্রণা হচ্ছে। এই একটি নখের দায়ই তো আমরা দিতে পারবো না। আর গোটা দেহে আল্লাহ্ পাকের এর চেয়ে সহস্র গুণ মূল্যবান কত দান যে ছড়িয়ে আছে, তার হিসাব কে রাখে। এত দান পেয়েও আমরা আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করছি। এটা কেমন বিবেচনা আর বুদ্ধিমত্তার কাজ। চায়ের পেয়ালাটি সঠিক সময়ে না দেয়ার কারণে তো পনেরশ' টাকার চাকরকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারি। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছি আমার অনুপম দেহটি কোথা থেকে কিনে এনেছি? কে দিয়েছেন আমাদের এ দেহে চলৎশক্তি ? আমি যে যমীনের উপর দম্ভ করে বেড়াচ্ছি, সে যমীন কার তৈরী ? والأرض فرشناها فنعم الماهدون আল্লাহ্ পাক বলেন—আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবে না তা বিছাতে সক্ষম। তোমাদের জন্য আরো সৃষ্টি করে দিয়েছি গাছে গাছে ফল। والحب ذو العصف والريحان আরো আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। فبای الاء ربکما تکذبان কাজেই

তোমরা আমার নেয়ামতকে কেন অস্বীকার করো ? কেন আমার নাফরমানী করো? তোমরা কি দেখ না যে আমি رب المشرقين ورب والمغربين পূর্ব-পশ্চিম তথা গোটা জগতের মালিক। فبای الاء ربکما تکذبان তারপরও তোমরা আমার নাফরমান হয়ে গেলে? তারপরও আমার নেয়ামতকে অস্বীকার করলে? তিনি আরো ইরশাদ করেন—

خلق الإنسان من صلصال كالفخار * وخلق الجان من

مارج من نار * فبأي آلاء ربكما تكذبان *

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? —*সূরা রহমান -১৪-১৬*

তারপরও কেন তোমরা আমার নেয়ামতকে ও আমাকে অস্বীকার করো? তোমরা কি জান না যে, আমি দু'টি দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত করেছি। কিন্তু উভয়ের মাঝে রয়েছে এক অদৃশ্য অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। ফলে মিঠা পানির সঙ্গে নোনা পানি মিশে যায় না। সে পর্দা যদি আমি হটিয়ে দেই, তাহলে তৃষ্ণা মিটাবার জন্য কোথাও এক ফোঁটা মিঠা পানি খুঁজে পাবে না। তোমরা কি দেখ না যে তোমাদের জলজানগুলো বিশাল এই সমুদ্রবক্ষে ভেসে ভেসে কী নিশ্চিন্তে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিয়ে চলে যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছাস সব আমি বেঁধে রাখি। ফলে বিশাল সমুদ্রবক্ষে একটি পিপিলিকার মত দেখতে ক্ষুদ্র জলজানটি ভেসে ভেসে এক পার থেকে অন্য পারে চলে যায় নিশ্চিন্তে। তোমাদের কি জানা নেই যে, তোমরা সকলেই একদিন মরে যাবে, চিরদিন বেঁচে থাকবেন শুধু তোমাদের রব। كل يوم فشان তোমরা কি জান না যে, প্রতিদিন তিনি ভিন্ন ভিন্ন মহিমায় উদ্ভাসিত হন। তোমরা কি শোনতে পাও নি? তবে শোন— سنفرغ لكم ايها الثقلن তোমাদের জন্য আমি অচিরেই কর্মমুক্ত হয়ে যাব এবং তোমাদের জন্য এক মহা হিসাব-কিতাবের আয়োজন করবো। فبای الاء ربکما تکذبان সুতরাং কেন অস্বীকার করো ? আর কেনইবা নাফরমানী করো? হে মানব ও জ্বিন! একটু সাবধান হও। তোমাদের রবের সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কি তোমাদের জানা নেই?

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران * فإذا انشقت

السماء فكانت وردة كالدهان *

ছুড়ে দেয়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুণ্ড, তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। —*সূরা আর-রহমান - ৩৫ ও ৩৭*

তো সেই আগুন, পানি ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে তোমাদেরকে কেউ কি রক্ষা করতে সক্ষম হবে ? তোমাদের কি জানা নেই যে, সেদিন অপরাধীদেরকে চিনতে মোটেও কষ্ট হবে না। তাদের চেহারা হবে কালো বর্ণের। হাত বাঁধা থাকবে। পায়ে থাকবে বেড়ি আর ঘাড়ে লা'নতের 'তওক'। فبای الاء ربکما تکذبان তোমাদের কি জানা নেই যে, জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। তীব্র দহনে সেখানে ভীষণ তোলপাড় হচ্ছে। ভীষণ তৃষ্ণায় জাহান্নাম ডেকে বলছে— هل من مزید , هل من مزید আয় আল্লাহ্! আরো চাই, আরো চাই। فبای الاء ربکما تکذبان তো তোমাদের কি হলো ? কেন তোমরা নাফরমান হলে ? কেন তোমরা অবিশ্বাসী হলে ?

একথাও শোনে রাখ যে— ولمن خاف مقام ربه جنتان তোমরা যদি আমাকে ভয় করো, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে আলীশান জান্নাত। আরো রয়েছে—

ذواتا أفنان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهما عينان تجريان *
فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيهما من كل فاكهة زوجان * .....
متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان * فيهن
قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * ..... كأنهن
الياقوت والمرجان * .....
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * فبأي آلاء ربكما تكذبان *

উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবন। .... উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। .... তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। .... তথায় থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করে নি। .... প্রবাল ও পদ্মরাগ

সদৃশ রমণীগণ। সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? — *সূরা আর-রাহ্‌মান*

তোমরা কোন্ রবের নাফরমানী করে চলেছো? যিনি তোমাদের জন্য এত কিছুর আয়োজন করে রেখেছেন, তার সঙ্গে তোমাদের এত শত্রুতা কেন? যে রব তোমাদের জন্য মনমুগ্ধকর বাগান সাজিয়ে রেখেছেন। যে বাগানে দীর্ঘ বৃক্ষের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চলে আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। যেখানে এঁকেবেঁকে বয়ে চলে নদীর ধারা। রয়েছে ফলের ভারে নুয়ে পড়া বৃক্ষশাখা। ডালে ডালে ঝুলন্ত পরিপক্ক ফল। পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখীর কলতান। সুসজ্জিতা হুরদের প্রেমের গভীর ইঙ্গিত। খেদমতের জন্য রয়েছে সারি সারি গিলমান। তোমাদের রব্ তোমাদের খেদমত ও ভোজনের জন্য তাঁর দ্বার খুলে রেখেছেন। দরবার সাজিয়ে রেখেছেন। ফরশ বিছানো রয়েছে। কালিন ও তাকিয়ার সুদৃশ্য আসন পাতা আছে। চারিদিক থেকে হতে থাকবে ফিরিস্তা ও গিলমানদের সালাম ও শুভ কামনা। অফুরন্ত জীবন ও যৌবন। অশেষ ভালবাসা। জীবনের শেষ নেই, যৌবনেরও শেষ নেই। অন্তকাল চলতে থাকবে এই উচ্ছাস-উপভোগ। পাশে থাকবে অসামান্যা রূপসী হুরের দল। নীচে বয়ে চলবে কুলকুল রবে জান্নাতের নহর। উপরে ঝুলে থাকবে পরিপক্ক ফল। فبای الاء ربکما تکذبان আমার অসংখ্য ও অকল্পনীয় নেয়ামত রাজির কোন্‌টা তোমরা অস্বীকার করবে? তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। কিছু আত্মসম্মানবোধও থাকা উচিত।

অসাধুতার সাজা

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! দোহাই আপনাদের, আল্লাহ্‌কে রাজি করুন। যে দোকানের পিছনে পড়ে নামায গেছে, যে দোকানের পিছনে পড়ে সততা গেছে, সত্যবাদিতা গেছে, আর খেয়ানত এসেছে, অসততা এসেছে, সে দোকানের পিছনে আর কতদিন নিজের অমূল্য জীবনকে বিসর্জন দিতে থাকবেন? কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক অসৎ ব্যক্তিকে বলবেন, দুনিয়াতে যে আমানত তুমি আত্মসাৎ করেছো তা নিয়ে আসো। লোকটি বলবে, কোথা থেকে আনবো? তা তো দুনিয়ায় ফেলে এসেছি। আল্লাহ্ পাক বলবেন, তা জাহান্নামে পড়ে আছে। তো সেই লোকটি আত্মসাৎ করা আমানতকে তুলে আনার জন্য জাহান্নামে কীভাবে যাবে? ফিরিশ্‌তারা তার পশ্চাৎদেশে আগুনের কোড়া মাড়তে মাড়তে জাহান্নামের একেবারে কঠিনতম স্থান 'হাবিয়া'য় নিয়ে উপস্থিত করবেন,

যা মূলতঃ মুনাফিকদের আবাসস্থল হবে। ঈমানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমানতে খেয়ানত করার কারণে তাকে জাহান্নামের একেবারে নিকৃষ্টতম স্থানে যেতে হবে। সেখানে সে মানুষের আত্মসাৎ করা মালদৌলতসমূহ দেখতে পাবে। নিজের অবর্ণনীয় কষ্ট আর মুসিবত সত্ত্বেও সেই মালদৌলতসমূহ কাঁধে তুলে নিয়ে উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করবে। উঠতে উঠতে যখন একেবারে জাহান্নামের কিনারায় এসে উপস্থিত হবে, হঠাৎ তার কাঁধ থেকে বোঝাটি পড়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে হাবিয়ায় গিয়ে স্থির হবে। ফিরিশ্‌তারা আবার তাকে কোড়া মেরে বলবেন, 'যা, নিয়ে আয়।' বাধ্য হয়ে লোকটি আবার জাহান্নামের তলদেশে ফিরে যাবে। তারপর বোঝাটি কাঁধে তুলে আবার উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করবে। কিন্তু কিনারায় আসার পর আবারও হাত ফসকে বোঝাটি পড়ে গড়াতে গড়াতে নীচে চলে যাবে। ফিরিস্তারা লোকটিকে প্রহার করতে করতে আবার নীচে নামিয়ে দিবেন—'যা নিয়ে আয়'। বাস্ এভাবেই চলতে থাকবে। জাহান্নাম থেকে বের হবার সুযোগ আর হবে না। তো আমার ভাই ও বন্ধুগণ! এমন কামাই থেকে তওবা করুন। এই অর্থ-সম্পদ আপনাদেরকে সোজা জাহান্নামে পৌছে দেবে।

সম্মানের অধিকারী কারা ?

কাল কেয়ামতের দিন আর একদল লোক থাকবে যারা হবে পরম সৌভাগ্যশালী। এক ফিরিস্তা ঘোষণা দিয়ে বলবেন, আজ প্রকৃত সৌভাগ্যশালীদের পরিচয় প্রকাশ হবে। তারা ঐ সকল লোক—

تتجافى جنوبهم عن المضاجع

যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা স্পর্শ করতো না। যারা নামাযে মশগুল থেকে নির্ঘুম রাত্রি কাটিয়ে দিতো, সে সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরা কোথায়?

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! নামাযের প্রতি অবহেলা খুবই মারাত্মক অপরাধ। শুধু মুখের ভাষা দিয়ে নামাযের সঠিক গুরুত্ব বুঝানো সম্ভব নয়। আমি যখনই জুমার নামায পড়ি বা পড়াই, তখন অবশ্যই এ বিষয়টি আলোচনা করে থাকি। কারণ, জুমায় উপস্থিত লোকজনকে দেখে এই ভেবে আমার দিল টুকরা টুকরা হয়ে যায় যে, এই লোকগুলো গোটা সপ্তায় কোথায় থাকে? কেন তারা বুঝে না যে, হেসে-খেলে তারা কত মারাত্মক অপরাধ করে চলেছে! তাদের কানে কি ছিপি এঁটে দেয়া হয়েছে, না তাদের দিলের উপর পর্দা ঢেলে দেয়া হয়েছে? আমি তো ভিনদেশী ভাষায় কথা বলছি না যে, তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। আমি তাদের

কাছে চাঁদাও চাই না বা নিজের জন্যও কিছু প্রার্থনা করি না। আর এমনও নয় যে, আমি তাদের সামনে নিজের গুণগান গেয়ে থাকি, যার ফলে তারা সেদিকে কর্ণপাত করার কোন গুরুত্ব অনুভব করেন না।

কাল কেয়ামতের দিনই প্রমাণ হবে, প্রকৃত সম্মানী ব্যক্তি কে? সেদিন নামাযীদের জন্য ইজ্জতের ঘোষণা হবে এবং ডেকে ডেকে বলা হবে, রাত্রি জাগরণ করে নামায আদায়কারী ব্যক্তিরা কোথায়? আল্লাহ্‌র নামে অর্থ-সম্পদ ব্যয়কারীরা কোথায়? আমার ভাই ও বন্ধুগণ! যাদের অর্থ-সম্পদ রয়েছে, আল্লাহ্ পাক যাদেরকে সচ্ছলতা দান করেছেন, তাদেরকে যাকাতও আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র নামে দান-সদকাও করতে হবে। আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করতে শিখুন। বিলাশীতায় অভ্যস্ত না হয়ে সরল-সহজ জীবন যাপন করুন, আর আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করে আল্লাহ্‌কে করজ দান করুন। বিশ্বাস করুন, এই করজ আল্লাহ্ পাক শুধু আপনাকেই নয়, বরং আপনার আওলাদদেরকেও ফিরিয়ে দিবেন।

মসজিদের কর্তৃপক্ষ আপনাদের নিকট চাঁদার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকে। মাদরাসার লোকজনও চাঁদার জন্য আপনাদের নিকট ধরনা দেয়। 'আল্লাহ্‌র ঘরের জন্য চাঁদা চাওয়া' এটা মুসলমানদের গায়রত ও আত্মসম্মানবোধের পরিপন্থি। অথচ সর্বত্র এঘটনাই ঘটে চলেছে— কোথাও মসজিদের দরজায় বিশালাকায় লৌহ সিন্দুক রাখা আছে। কোথাও বা মুসল্লিদের সামনে দিয়ে বাক্স চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়গুলো আমাকে যথেষ্ট লজ্জিত করে ও পীড়া দেয়। দুঃখের কথা কী বলবো! তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর কি পর্দা পড়ে গিয়েছে? আল্লাহ্‌র ঘরের জন্য মানুষের কাছে কেন ভিক্ষার হাত বাড়াতে হবে? আর যাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে, তাদের জ্ঞানচক্ষুও কি অন্ধ হয়ে গিয়েছে? তাদের ঘরে তো মাশাআল্লাহ্ খানাপিনা আর বিলাশ-সামগ্রির অভাব নেই। অথচ তাদের কাছে আল্লাহ্‌র ঘরের জন্য হাত পাততে হচ্ছে! কেন? যে আল্লাহ্ তোমাকে এত কিছু দান করলেন, সে আল্লাহ্‌র ঘরের জন্য তোমার কাছে চাইতে হবে কেন? তোমার হাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন সেদিকে অগ্রসর হয় না? তো এইভাবে মাদরাসা-মসজিদের জন্য ভিক্ষার হাত মানুষের সামনে বাড়িয়ে দেয়া এটা ঈমানী সম্মানবোধেরও পরিপন্থী এবং মুসলমানের দানশীলতারও সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের তো আল্লাহ্‌র রাস্তায় দু'হাত খুলে ব্যয় করতে থাকা উচিত। اقيموا الصلوة واتوا الزكوة (নামায কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো) নির্দেশটি কালামে পাকে ৬৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবার নামাযের সঙ্গে যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নামাযীর তুলনায় যাকাত

আদায়কারীর সংখ্যা অনেক কম। কারণ, পকেটের পয়সা বের করতে বড়ই কষ্ট হয়। আমাদেরকে না দিন, নিজের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করুন। আজকালকার সৎ চাকরিজিবীদের অধিকাংশই যাকাত পাওয়ার যোগ্য। ঘুস গ্রহণ না করলে একজন 'এসপি'ও যাকাত গ্রহণের যোগ্য থাকবে সন্দেহ নেই। আমার এক এসপি বন্ধু আছেন। তিনি বলেন, আমি তো যাকাত গ্রহণের যোগ্য, অথচ আমি মুলতানের এসপি। আমার ঘরে একদিন কোনরকমে একটু তরকারীর ব্যবস্থা হলো তো পরের দিন আর তা জোগাড়ের ব্যবস্থা থাকে না।

অথচ কত মানুষ আদর করে বাচ্চার হাতে হাজার টাকার খেলনা তুলে দিতেও দ্বিধা করে না। তাদের কি ধারণা যে, এর জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট তাদেরকে জবাদিহি করতে হবে না? তারা কি ভেবে দেখে না যে, এই হাজার টাকা দিয়ে বহু অনাহারী পরিবারের কয়েকদিনের আহার্যের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। তাদের কোন দরিদ্র আত্মীয়ের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে ওঠতে পারে।

আল্লাহ্ পাক তাদেরকে স্বচ্ছল রিযিক দান করেছেন সত্য, কিন্তু তাদের সে রিযিকের হক আদায় করার জ্ঞান নেই। আল্লাহ্ পাক জীবন দান করেছেন সত্য, কিন্তু তারা জানে না যে, সে জীবনের হক আদায় হবে কীভাবে? শুনে রাখুন— সিজদা হলো জানের সদ্‌কা আর মালের সদ্‌কা হলো যাকাত ও দানখয়রাত। আমি আমার নিজের জন্য আপনাদের নিকট কিছুই চাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে, খুঁজে খুঁজে আপনি নিজেরই দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করুন। নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে তার অলঙ্কারের যাকাত দিচ্ছে কি না? না হলে তাকেও কিয়ামতের দিন পাকড়াও হতে হবে। তোমার মাল সাঁপ হয়ে তোমাকেই দংশন করবে। সে হয়তো বলবে, এগুলো তো আমি মেয়েদের জন্য রেখেছি। ঠিক আছে, কিন্তু এর যাকাত তো দিতে হবে। মালের যাকাত দেয়া না হলে কাল কেয়ামতের দিন শুধু নামায মুক্তির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না। তদ্রূপ নামাযহীন যাকাতও তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। নামায না পড়ে শুধু পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে মসজিদ গড়ে দিলে কাজ হবে না। শুধু ওই মসজিদ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

হযরত ওসমান গণী (রাযি.)-এর দান

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ভিক্ষুক এসে কিছু প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে হযরত ওসমান গণী (রাযি.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ফলে লোকটি হযরত ওসমান গণী (রাযি.)-এর গৃহাঙ্গিনায় গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে গিয়ে লোকটি শোনতে পেল হযরত ওসমান গণী

(রাযি.) তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, আল্লাহ্‌র বান্দী! কাল রাতে তুমি চেরাগের সলিতা অনেক মোটা করে দিয়েছিলে। ফলে তেল বেশী খরচ হয়েছে। একথা শোনে ভিক্ষুক মনে মনে বললো, হায় আল্লাহ্! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন্ কাঞ্জুসের নিকট পাঠিয়ে দিলেন! যে ব্যক্তি চেরাগের সলিতা মোটা দেয়ায় তেল বেশী খরচ হয়েছে বলে স্ত্রীকে তিরস্কার করছে, সে করবে আমাকে দান! সেরেছে। তবু লোকটি হতাশ মন নিয়েই আল্লাহ্‌র নামে হাঁক দিল।

ভিক্ষুকের আওয়াজ শোনে হযরত ওসমান গণী (রাযি.) বের হয়ে আসলে লোকটি যখন বলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। কিছু সাহায্য করুন। তিনি গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং তিন হাজার দিরহাম পূর্ণ একটি থলে উঠিয়ে এনে গোটা থলেটাই তাকে দিয়ে দিলেন। লোকটির পরিচয়ও জানতে চাইলেন না এবং একথাও জিজ্ঞাসা করলেন না যে, কত চাই। থলে হাতে পেয়ে লোকটি তো অবাক। বললো, ভাই! আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন? আমি চাওয়া মাত্র আপনি তো আমাকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিলেন যে, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু একটু পূর্বেই তো ঘরে আপনি স্ত্রীকে চেরাগের সলতে মোটা করে দেবার কারণে তিরস্কার করছিলেন। এর রহস্য কি? হযরত ওসমান গণী (রাযি.) বললেন, ওটা ছিল আমার নিজের জন্য ব্যয়। সেক্ষেত্রে তো যথাসাধ্য সঙ্কোচনই করা উচিত। আর এটা তো দিচ্ছি আল্লাহ্‌কে। আমি খুব কমই দিলাম। এক্ষেত্রে তো উচিত দু'হাত খুলে সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে বিলিয়ে দেয়া।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! হালাল কামাই-রোজগারের চেষ্টা করুন। আর নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরকে বলুন যে, তোমাদের জন্য আমার পক্ষে জাহান্নামে যাওয়া সম্ভব নয়। নিজেদের অতীত জীবন থেকে তওবা করুন আর মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

জর্ডানে দাওয়াতী সফর

১৯৯১ সনে আমি তাবলীগী সফরে জর্ডান গিয়েছিলাম। জামাত নিয়ে আমরা একেবারে ইসরায়ীল সীমান্তে চলে গিয়েছিলাম। আরব বসতী এপার-ওপার উভয় দেশেই রয়েছে। তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। ফলে আসাযাওয়া হয় নিয়মিত। ওপারের আরবরা বললো, ইহুদীরা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'তোমাদের ফজর নামায ও জুমার নামাযে কী পরিমাণ মুসল্লি হয়?' তাদের এমন প্রশ্ন শোনে আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এই প্রশ্ন করছেন কেন? জবাবে তারা বললো, আমাদের কিতাবে একথা লেখা আছে যে,

যখন মুসলমানদের ফজর ও জুমার নামাযে মুসল্লীদের উপস্থিতির সংখ্যায় বিশেষ পার্থক্য থাকবে না, তখন দুনিয়ার বুক থেকে ইহুদীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আজ আমাদের মসজিদে ফজরে জামাতে টেনেটুনে দেড় কাতার মুসল্লি হয়। কিন্তু জুমার নামাজে মসজিদের বাইরেও কাতার করতে হয়। আমি যদি মেনেও নেই যে, জুমায় উপস্থিত মুসল্লিদের এক তৃতীয়াংশ বাইরে থেকে আগত। তবুও তো দুই তৃতীয়াংশকে এ মহল্লার বলেই স্বীকার করতে হবে। এরা ফজরে কোথায় থাকে? কেন তারা মসজিদে উপস্থিত হয় না?

নিজেদের উপর একটু দয়া করুন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার কথা শুনুন। আমি তো আপনাদের সামনে দর্শন শাস্ত্রের কোন জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি না, বা এমন কোন নতুন বিষয় নিয়েও আলোচনা করছি না, যা আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে। আমি শুধু বলছি—জুমায় যেমন আপনারা মসজিদে উপস্থিত হচ্ছেন, এই অভ্যাসটা অন্য নামাযের ক্ষেত্রেও গড়ে তুলুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই আপনাদের উপস্থিতি দিয়ে মসজিদ আবাদ হয়ে ওঠুক। আমি ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌র ফজলে আপনাদেরকে তিনশ' ষাট দিনের প্রতিদিনই নতুন বয়ান শোনাতে পারি। কিন্তু আমি তো এখানে বয়ান করার জন্য বসি না, শুধু এ হৃদয়ের কান্না শোনাতে আসি। গোটা মহল্লাবাসী জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে, আর তা দেখে আমার হৃদয় চিরে যদি একটু 'হায়' বের না হয়, তাহলে আমার ধ্বংস রুখবার ক্ষমতা কারো নেই। জ্বলন্ত কুকুর-বিড়াল দেখতে পেলে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠবে এবং মন বেদনায় ভরে ওঠবে সন্দেহ নেই। তাহলে এই যে এত মানুষ জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে, তা দেখে আমি সহ্য করবো কিভাবে? যারা আজ ফজর নামায পড়ে নি, তারা নিজেদের উপর জাহান্নামকে ওয়াজিব করে নিয়েছে। যারা আসর পড়বে না, তাদের উপরও জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে। তাহলে এবার বলুন, আমি আর কোন্ বিষয়ের ওয়াজ করতে পারি? কোন্ দর্শন নিয়ে এখানে আলোচনা চলতে পারে?

কাজেই মোহ্‌তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! নিজেদের উপর দয়া করুন। নিজের স্ত্রী-সন্তান এবং ঘরের লোকদের প্রতি দয়া করুন। মসজিদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলুন, এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান ও মালের পরিপূর্ণ কোরবানী দিতে থাকুন। যাতে উভয় জগতেই কামিয়াবী লাভ করা যায়। রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তওফীক দান করুন। আমীন।

— ▣ —